নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-৪

ইসলামী মু'আশারাত

পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ও অধিকার
সুন্দর ও সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের কালজয়ী আদর্শ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

আপনার সংগ্রহে রাখার মত
আরও কয়েকটি কিতাব

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-৪

ইসলামী মু'আশারাত

মূল : শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
চতুর্থ মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৯ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : মার্চ ২০১৪ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ❖ ৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-8950-41-8

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, ✆ 16297 or 01519521971
facebook.com/EhsanBookshop, ✆ 01832093039
khidmashop.com ✆ 01939773354

মূল্য : চারশত আশি টাকা মাত্র

ISLAMI MUASHARAT
By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by : Maulana Muhammad Jalaluddin
Price: Tk. 480.00 US$ 9.00

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় আমাদের এক সাথী আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, 'হযরত! আমাদের হাবীব ভাই তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারাদেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু'আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হয়। এ সফরেই অথবা অন্য কোন সফরে আমি হযরতকে বলেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচিত, হযরতের দৃষ্টিতে কোন্ কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে 'আসান নেকীয়াঁ' ও 'ইসলাহী খুতবাত'-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশী উপকারী হবে।

হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতুবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতুবাতসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত'-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের সকল উর্দূ রচনা হতে সাধারণ মুসলমানের জন্য উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলাহী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং আপাতত দশ খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস', দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদাত-বন্দেগী-এর স্বরূপ', তৃতীয় খণ্ড 'ইসলামী মু'আমালাত', চতুর্থ খণ্ড 'ইসলামী মু'আশরাত', পঞ্চম খণ্ড 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন', ষষ্ঠ খণ্ড 'ইসলাহ ও তাসাওউফ', সপ্তম খণ্ড 'ইসলামী

জীবনের সোনলী আদাব', অষ্টম খণ্ড 'অসৎ চরিত্র ও তার সংশোধন', নবম খণ্ড 'উত্তম চরিত্র ও তার ফযীলত' এবং দশম খণ্ড 'দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত ও আদাব' বিষয়ক।

গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব এমন কিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে। সেগুলো হলো,

ক. তিনি সকল আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি।

আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডই অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! চার খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট খণ্ডসমূহের কাজ অনুবাদ চলছে।

প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস', দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদত-বন্দেগী : হাকীকত, ফযীলত ও আদব' ও তৃতীয় খণ্ড 'ইসলামী মু'আমালাত' নামে পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে সম্মানিত পাঠকের ভূয়সী প্রসংশা কুড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান আয়োজন এ ধারারই চতুর্থ খণ্ড 'ইসলামী মু'আশারাত' প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহপাক অবশিষ্ট খণ্ডসমূহও দ্রুত প্রকাশ করার তাওফীক দান করুন।

আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুল-ত্রুটি (বিশেষত হরকতের ভুল) থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারণা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠকসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
২৮ রবিউস সানী ১৪৩৪ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালংঘন উভয়রূপ প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন-দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশকে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলণের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সঊদ উসমানী সেগুলোর একটি 'বিষয়ভিত্তিক সমগ্র' প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়স সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সংগ্রহটিকে তাঁর, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবূল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩

সূচীপত্র

আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক অর্থবোধক বাণী

উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু হোরায়রা রাযি.। এতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শেখা অনেকগুলো কথা বর্ণনা

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ৮, পৃঃ ২১২-২৪৪, বাদ আসর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৬৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৪৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭১১৮

করেছেন। সবগুলো বাক্যই অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

'আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক বাণী দেওয়া হয়েছে।'[২]

অর্থাৎ, যে বাক্যগুলোর শব্দ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থ, মর্ম এবং তাতে নির্দেশিত অত্যন্ত ব্যাপক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ জাতীয় বাণীগুলোকে جَوَامِعُ الْكَلِمِ (জাওয়ামিউল কালিম) বলা হয়। উক্ত হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকগুলো 'জাওয়ামিউল কালিম' তথা ব্যাপক অর্থবোধক বাণী বর্ণনা করেছেন।

কারো পেরেশানী দূর করার সওয়াব ও পুরস্কার

প্রথম বাক্যটির মর্ম হলো, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়াবী কোনো পেরেশানী দূর করবে, যেমন কেউ কোনো বিপদে বা দুশ্চিন্তায় পড়লো, আর কেউ যে কোনো উপায়ে সাহায্য করে তাকে তা থেকে উদ্ধার করলো, তাহলে এটা আল্লাহর কাছে এতো বড়ো নেক কাজ হিসেবে গণ্য হবে যে, তিনি কিয়ামত দিবসে তার একটি বিপদ দূর করে দিবেন।

অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়ার ফযীলত

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে সহজ করে দিলো, আল্লাহ তাকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে সহজ করে দিবেন। যেমন কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করার ওয়াদা করে কোনো প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করলো, কিন্তু যখন ঋণ পরিশোধের সময় হলো

---

২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮১৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭০৯৬, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৭৪, তিরমিযী শরীফে 'أعطيت جوامع الكلم' শব্দ এসেছে। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৫৫, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৩৭, বুখারী ও নাসায়ী শরীফে 'بعثت بجوامع الكلم' এসেছে।

তখন দেখা গেলো তার সামর্থ নেই। অভাবের কারণে এখন সে ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। এ অবস্থায় ঋণদাতার যদিও তার কাছে পাওনা তলব করার অধিকার আছে, কিন্তু সে যদি তলব না করে তাকে বলে যে, তোমার সুযোগ মতো ঋণ পরিশোধ করো; তাহলে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাত- উভয় জাহানে সহজ করে দিবেন। এ বিষয়ে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্থ হয়, তাহলে তার সচ্ছল হওয়া, অভাব দূর হওয়া এবং ঋণ পরিশোধের সামর্থ হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া একজন মুমিনের কর্তব্য।[৩]

আল্লাহ তা'আলা নম্রতা পছন্দ করেন

আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে নরম আচরণ করা আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় আমল। যে ব্যক্তি কাউকে ঋণ দিলো, যে কোনো সময় ঋণ তলব করার আইনগত অধিকার তার রয়েছে। এমনকি তাকে বন্দীও করতে পারে। কিন্তু একজন মুসলমানের কাছে ইসলামের দাবি হলো, তোমার কতো পয়সা এলো আর কতো পয়সা গেলো, শুধু এ হিসাবই করো না, বরং তোমার হিসাব করা উচিত যে, একজন বান্দার সঙ্গে সদয় আচরণ করা আল্লাহর এতোই প্রিয় আমল যে, এর বিনিময়ে তিনি কিয়ামতের দিন তোমার সঙ্গে দয়ার আচরণ করবেন।

কোনো মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করার ফযীলত

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ

কোনো ব্যক্তি যতোক্ষণ পর্যন্ত তার অপর ভাইয়ের কাজ করে দিবে বা তার কোনো প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার কাজ এবং তার প্রয়োজন পূরণ করতে থাকবেন।'[৪]

---

৩. বাকারাহঃ ২৮০

সুতরাং তুমি আমার বান্দার কাজে লেগে থাকো, আমি তোমার কাজে লেগে থাকবো।

کارساز ما بساز کار ما ۰ فکر ما در کار ما آزار ما

'আমাদের কর্মবিধায়ক আমাদের
কর্ম সাধনে লেগে আছেন।
আমাদের কর্মের বিষয়ে
আমরা চিন্তা করতে আরম্ভ করলেই
আমাদের যতো কষ্ট।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে একটি বাক্য এই ইরশাদ করেছেন,

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'যদি কেউ কোনো মুসলিমের একট বিপদ দূর করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তার কিয়ামত দিবসের বিপদগুলোর একটি দূর করে দিবেন।'[৫]

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করুন

বস্তুত অন্যের প্রয়োজন পূরণ করা বা অন্যের বিপদ দূর করা তখনই সম্ভব, যখন অন্তরে আল্লাহর মাখলুকের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা থাকবে। যদি কেউ লোক দেখানোর জন্যে এ কাজগুলো করে তাহলে তার কোনোই মূল্য নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি চিন্তা করে যে, সে তো আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর সৃষ্টি, আমি তার সঙ্গে সদাচরণ করলে আল্লাহ আমাকে এর উত্তম বিনিময় দান করবেন, তাহলে তা অনেক মূল্যবান হয়ে যায়। আল্লাহর ভালোবাসার দাবি হলো তাঁর বান্দাকে ভালোবাসা। তাঁর বান্দার প্রতি ভালোবাসা না থাকার অর্থ হলো তাঁর প্রতিও ভালোবাসা না থাকা। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ

---

৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৬২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৭৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৪৬

'যারা অন্যের উপর রহম করে, রহমান তাদের উপর রহম করেন। অতএব জমিনবাসীর উপর রহম করো, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের উপর রহম করবেন।'[৬]

সুতরাং যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর মাখলুকের প্রতি তোমাদের অন্তরে দয়া না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুসলমান বলার উপযুক্ত নও। যতোক্ষণ আল্লাহর মাখলুকের প্রতি দয়া না করবে, ততোক্ষণ কি করে তাঁর দয়া পাওয়ার আশা করতে পারো? কারণ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসাও ঈমানের অন্যতম দাবি।

লাইলির ঘর-বাড়ির সঙ্গে মজনুর ভালোবাসা

যখন কারো সঙ্গে ভালোবাসা হয়, তখন তার সবকিছুর সঙ্গে ভালোবাসা হয়। তাই লাইলির প্রেমে মজনু বলেছে,

أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى

أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَ ذَا الْجِدَارَا

'আমি যখন লাইলির বাড়ি অতিক্রম করি, তখন তার এই দেয়ালে ঐ দেয়ালে চুমু খাই।'

কারণ হলো, وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِيْ

وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

'ঐ দেয়ালগুলোর সঙ্গে তো আমার প্রেম-ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই, সেগুলোকে আমি কেন ভালোবাসবো! কিন্তু দেয়ালগুলো যেহেতু আমার প্রেমাস্পদের বাসস্থানের, তাই সেগুলোকেও আমি ভালোবাসি এবং ওখান দিয়ে অতিক্রমকালে সেগুলোকে চুমু খেতে থাকি।'[৭]

মজনু যদি লাইলির প্রেমের কারণে তার বাড়ির ইট-পাথরের দেয়ালের প্রেমে আসক্ত হতে পারে, তাহলে আল্লাহর প্রেমিকের অন্তরে তাঁর প্রেম থাকবে অথচ তাঁর মাখলুক ও বান্দার প্রতি ভালোবাসা থাকবে না, তাদের প্রতি দয়া হবে না- এটা কী করে সম্ভব!

---

৬. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৪৭, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৯০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬২০৬

৭. রওযাতুল মুহিব্বীন ও নুযহাতুল মুশতাকীন, পৃঃ ২৬৮

আল্লাহর মহব্বত কি তাহলে লাইলির মহব্বত অপেক্ষা কম?

মছনবী শরীফে আল্লামা রুমী রহ. লিখেছেন- মজনু তো লাইলির কারণে তার শহরের কুকুরকেও ভালোবাসতো। কারণ, তা প্রেমাস্পদের শহরের কুকুর। মাওলানা রুমী রহ. বলেন,

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود ○ گوئے گشتن بہر او اولیٰ بود

আরে! মাওলার প্রেম তো দেখি লাইলির প্রেম থেকেও কমে গিয়েছে। যখন এক নশ্বর বস্তুর সঙ্গে এমন মহব্বত হতে পারে, যার ফলে তার কুকুরের সঙ্গেও মহব্বত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা- যিনি 'মালিকুল মুলক' সকল প্রিয়ের প্রিয়- তাঁর মহব্বতের দাবি তো হলো, তাঁর সকল মাখলুকের সঙ্গেও মহব্বত হবে, তা পশুই হোক না কেন। কারণ, তা আল্লাহর মাখলুক। এ জন্যেই শরীয়ত পশুরও অধিকার নিশ্চিত করেছে। তোমরা তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করবে। তাদের সঙ্গে যেন কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন করবে না।

কুকুরকে পানি পান করানোর সওয়াব

বুখারী শরীফে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক ব্যভিচারিণী মহিলা সারাজীবন ব্যভিচার করে বেড়িয়েছে। একবার কোথাও যাচ্ছিলো। পথে দেখলো একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চেটে পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করছে। কাছেই একটি কূপ ছিলো। ঐ মহিলা পায়ের চামড়ার মোজা খুলে তা দিয়ে কূপ থেকে পানি তুললো এবং ঐ কুকুরকে পান করালো। তার এ আমল আল্লাহর এতোই পছন্দ হলো যে, তিনি তার সব গোনাহ ক্ষমা করে দিলেন। কারণ, বান্দা যখন আল্লাহর এক মাখলুকের সঙ্গে মহব্বত ও দয়ার আচরণ করলো, তখন আল্লাহও বান্দার সঙ্গে মহব্বত ও দয়ার আচরণ করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।[৮]

তাই আল্লাহর মাখলুকের সঙ্গে দয়ার আচরণ করা উচিৎ, তা কোনো পশুই হোক না কেন।

দয়ার সুউচ্চ স্তর

আল্লাহ তা'আলা হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ রহ.-কে মাখলুকের প্রতি দয়া করার অত্যাশ্চর্য ও সুউচ্চ মাকাম দান করেছিলেন। কোনো পশুকে প্রহার

---

৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৭৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪১৬৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১০১৭৮

করা তো দূরের কথা, তার জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যেও কখনো তাঁর হাত উঠতো না। চিন্তা করতেন- এটা তা আল্লাহর মাখলুক। এমনকি একবার তাঁর পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, সেখানে মাছি বসে। স্বভাবতই ক্ষত স্থানে মাছি বসলে বেশি কষ্ট হয়। কিন্তু তথাপিও তিনি মাছিগুলো তাড়াতেন না। নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন। একজন এসে এ অবস্থা দেখে বললো, হযরত অনুমতি হলে আমি মাছিগুলো তাড়িয়ে দেই। উত্তরে হযরত বললেন, আরে ভাই! মাছিগুলো নিজের কাজ করছে। আমাকে আমার কাজ করতে দাও।

তাঁর অন্তরে এই চিন্তা ছিলো যে, এ মাছিগুলো তো আল্লাহর মাখলুক। এগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে কেন পেরেশান করবো? মোটকথা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মহব্বতের দাবি তখনই সত্য বিবেচিত হবে, যখন তাঁর মাখলুকের প্রতিও অন্তরে মহব্বত থাকবে এবং তাদের প্রতি দয়া থাকবে।

একটি মাছির প্রতি দয়া করা

আমি আমার শাইখ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর কাছে অনেক বার এ ঘটনা শুনেছি যে, এক বুযুর্গ অনেক বড়ো আলেম, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন। আজীবন দরস-তাদরীস ও রচনা-গ্রন্থনার কাজে ইলমের দরিয়া বইয়ে দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো- হযরত আপনার সঙ্গে আল্লাহ কি আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর মেহেরবানী তিনি আমাকে দয়া করেছেন। তবে আমার সঙ্গে বড়ো আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। তাহলো, আমার চিন্তায় ছিলো যে, জীবনে আলহামদুলিল্লাহ দ্বীনের অনেক বড়ো বড়ো খেদমত করেছি। দরস-তাদরীস, ওয়ায-নসীহত, রচনা-গ্রন্থনা ও তাবলীগসহ অনেক খেদমত করেছি। হিসাবের সময় হয়তো সে সব খেদমতের উসিলায় আল্লাহ আমার উপর মেহেরবানী করবেন। কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, যখন আল্লাহর সম্মুখীন হলাম তখন আল্লাহ বললেন, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। তবে কি কারণে ক্ষমা করছি জানো? চিন্তায় আসলো, আমি দ্বীনের যেসব খেদমত আঞ্জাম দিয়েছি হয়তো সেগুলোর বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে অন্য এক কারণে ক্ষমা করছি, তা হলো- একদিন তুমি কিছু লিখছিলে। তখন কাঠের কলম কালিতে চুবিয়ে চুবিয়ে লেখা হতো। তুমি লেখার জন্যে যখন কালিতে কলম চুবিয়ে উঠালে, তখন

একটি মাছি এসে কলমের মাথায় বসে কালি চুষতে লাগলো। তুমি তখন থেমে গিয়েছিলে এবং চিন্তা করেছিলে যে, মাছিটা পিপাসার্ত। সে কালি পান করে যাক, তারপর আমি লিখবো। তখন এভাবে তোমার কলম বন্ধ করে রাখাটা আমার মহব্বতে এবং আমার মাখলুকের মহব্বতে ইখলাসের সঙ্গে হয়েছিলো। তোমার অন্তরে তখন অন্য কোনো প্রেরণা ছিলো না। যাও, আজ আমি সেই আমলের বদৌলতে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

তাসাওউফ ও খেদমতে খালক

আসলে এটা বড়ো স্পর্শকাতর বিষয় যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মাখলুকের সঙ্গে মহব্বত হবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সঙ্গে মহব্বতের দাবি সত্য হতে পারে না। তাই মাওলানা রূমী রহ. তাসাওউফ সম্পর্কে বলছেন,

زتسبیح وسجادہ ودلق نیست ۰ طریقت بجز خدمت خلق نیست

'তাসবীহ, জায়নামায আর তালি দেওয়া পোষাকের নাম তরীকত নয়। তরীকত খেদমতে খালক ছাড়া অন্য কিছু নয়।'

অর্থাৎ, হাতে তাসবীহ, জায়নামায বিছানো, আর তালি দেওয়া দরবেশী পোষাক পরাকে মানুষ তাসাওউফ নামে অবিহিত করেছে। আসলে এগুলোর নাম তাসাওউফ বা তরীকত নয়। তাসাওউফ বা তরীকত মাখলুকের খেদমত বৈ অন্য কিছু নয়। আল্লাহর নির্দেশ হলো, যদি আমার সঙ্গে তোমরা মহব্বতের দাবি করতে চাও তাহলে আমার মাখলুকের সঙ্গে মহব্বত তৈরী করো এবং তাদের খেদমত করো।

আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুককে মহব্বত করেন

মাখলুকের সঙ্গে আল্লাহর অনেক গভীর মহব্বতের সম্পর্ক রয়েছে। আপনি মানুষের মধ্যে একটি বিষয় পরখ করে দেখুন, কেউ যদি কোনো বস্তু তৈরী করে, তা একটি পাথরও যদি হয়; তার সঙ্গে তার মহব্বত হয়ে যায়। কারণ সে তাতে অনেক সময় দিয়েছে, অনেক শ্রম দিয়েছে এবং সে মনে করে যে, এটা আমার সম্পদ। এমনিভাবে আল্লাহ পাকও অনেক আদর করে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তাই তাদেরকে তিনি অনেক মহব্বত করেন। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে মহব্বতের দাবি করতে হলে তার মাখলুককেও মহব্বত করতে হবে।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর আশ্চর্য ঘটনা

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের উপর তুফান এসে সব ধ্বংস হয়ে গেলো। তারপর ওহীর মাধ্যমে নূহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ হুকুম দিলেন যে, এখন তোমার কাজ হলো মাটির পাত্র বানাতে থাকো। এই হুকুম পেয়ে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দিন-রাত মাটির পাত্র তৈরীতে লেগে গেলেন। কয়েক দিনে যখন পাত্রের স্তুপ হয়ে গেলো, তখন দ্বিতীয় নির্দেশ দিলেন যে, এখন একটা একটা করে সবগুলো পাত্র ভেঙ্গে ফেলো। এই হুকুমের পর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনারই নির্দেশে অনেক মেহনত করে এগুলো তৈরী করেছি। অথচ আপনি এখন এগুলো ভাঙ্গার নির্দেশ দিচ্ছেন! আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, এখন এটাই আমার নির্দেশ যে, এগুলো ভেঙ্গে ফেলো। এ পর্যায়ে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সবগুলো পাত্র ভাঙ্গলেন। কিন্তু মনে অনেক ব্যাথা পেলেন যে, এতো কষ্ট করে বানালাম, আর এখন তা ভেঙ্গে ফেলতে হলো। আল্লাহ বললেন, হে নূহ! যদিও তুমি এ পাত্রগুলো নিজের হাতে বানিয়েছো, কিন্তু তা আমার হুকুমে বানিয়েছো। তথাপিও এগুলোর সঙ্গে তোমার এমন মহব্বতের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে যে, তোমাকে যখন এগুলো ভাঙ্গার হুকুম দিলাম, তখন তুমি তা ভাঙ্গতে পারছিলে না। তোমার মন চাচ্ছিলো যে, পরিশ্রমের মাধ্যমে আমার হাতে যে পাত্রগুলো তৈরী হয়েছে কোনোভাবে যদি সেগুলো বেঁচে যেতো, কতোই না ভালো হতো। কারণ, পাত্রগুলোর সঙ্গে তোমার মহব্বত হয়ে গিয়েছিলো। নিজের বিষয়টি বুঝলে ঠিকই, কিন্তু আমার বিষয়টা বুঝলে না। আমি নিজের হাতে যে মাখলুকগুলো সৃষ্টি করেছি, সেগুলোর ব্যাপারে একদম বলে দিলে,

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

'হে আল্লাহ জমিনের সকল কাফের বাসিন্দাকে ধ্বংস করে দাও। একজন কাফেরও অবশিষ্ট রেখো না।'[৯]

তোমার এ কথায় আমি আমার মাখলুককে ধ্বংস করে দিয়েছি। তুমি যে মাটি দিয়ে পাত্র তৈরী করেছিলে, সে মাটিগুলো তোমার তৈরী করা ছিলো না। নিজে শখ করেও পাত্রগুলো বানাওনি, বরং আমার হুকুম পালনার্থে

---

৯. নূহ ঃ ২৬

বানিয়েছিলে। তারপরও সেগুলোর সঙ্গে তোমার এমন মহব্বত হয়ে গিয়েছিলো। তাহলে কি আমার মাখলুকের প্রতি আমার মহব্বত থাকবে না? যদি আমার মাখলুকের প্রতি আমার মহব্বত থাকে তাহলে তোমাদেরকেও আমার মাখলুকের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক গড়তে হবে, যদি আমার সাথে মহব্বতের দাবিদার হও।

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর একটি কথা

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, যখন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করি এবং তাঁর নিকট তাঁর মহব্বত প্রার্থনা করি- হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার মহব্বত দান করুন- তখন আমার কেমন যেন মনে হয় যে, আল্লাহ বলছেন, তোমরা আমাকে মহব্বত করতে চাও? আমাকে তো তোমরা দেখোনি, কীভাবে আমার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক করবে? তাই দুনিয়াতে আমার মহব্বত প্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে আমার বান্দাদেরকে তৈরী করেছি। তাদের মহব্বত করো এবং তাদের প্রতি দয়া করো। আমার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক করার এটাই পথ।

সুতরাং এমন মনে করা যে, আমি তো আল্লাহকে মহব্বত করি, বান্দা বা মাখলুক আবার কি জিনিস? এ তো তুচ্ছ বস্তু। এই ভেবে তাদের প্রতি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকানো এবং তাদেরকে হীন মনে করা এ কথার পরিচায়ক যে, আল্লাহর সঙ্গে তোমার মহব্বতের যে দাবি আছে- তা মিথ্যা। কারণ আল্লাহর সঙ্গে যার মহব্বত থাকবে, আল্লাহর মাখলুকের সঙ্গে তার অবশ্যই মহব্বত থাকবে। এ জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকবে, স্বয়ং আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের পেরেশানী দূর করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামত দিবসে তার পেরেশানী দূর করে দিবেন।

আউলিয়ায়ে কেরামের অবস্থা

যতো আউলিয়ায়ে কেরাম অতিবাহিত হয়েছেন, তাদের সকলের অবস্থাই এমন ছিলো যে, তারা যদি কোনো মাখলুকের দুরাবস্থা দেখতেন, অথবা কোনো অন্যায়-অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত দেখতেন, তাহলে অন্যায় ও পাপকে যেহেতু ঘৃণা করা ওয়াজিব, তাই তারা তার অন্যায় ও পাপ কাজকে তো ঘৃণা করতেন, কিন্তু ঐ মানুষটিকে ঘৃণা করতেন না বা তাকে তুচ্ছ ভাবতেন না।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর ঘটনা

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. দজলা নদীর তীরে পায়চারি করছিলেন। তাঁর কাছ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিলো। ঐ নৌকায় বখাটে ধরনের কিছু যুবক গান-বাজনা করছিলো। আর এ জাতীয় আড্ডার পাশ দিয়ে যখন কোনো মোল্লা মানুষ অতিক্রম করে তখন তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করাও তাদের আড্ডা-আনন্দের একটা যুগসই অংশ হিসাবে গণ্য হয়। তাই তারাও হযরতকে দেখে কিছু বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা বললো। হযরতের সঙ্গে আরেকজন লোক ছিলেন। তিনি এ অবস্থা দেখে বললেন, হযরত আপনি ওদের উপর বদ দু'আ করুন। কারণ, এরা এতোই বেয়াদব যে, একে তো নিজেরা পাপাচারে লিপ্ত, অপরদিকে আল্লাহওয়ালাদেরকে বিদ্রূপ করে। হযরত সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে দু'আ করলেন- 'হে আল্লাহ আপনি যেভাবে এই যুবকদেরকে এ দুনিয়ায় আনন্দ দান করেছেন, তাদের আমলকে এমন করে দিন, যেন আখেরাতেও তাদের এমন আনন্দ নসীব হয়।' দেখুন! তিনি ঐ যুবকদেরকে ঘৃণা করেননি। তিনি ভেবেছেন, তারা তো আমার আল্লাহরই মাখলুক।

উম্মতের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মমতা

যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' তথা বিশ্ববাসির জন্যে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিলো, পা মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিলো, ঠিক তখনো তাঁর যবানে উচ্চারিত হচ্ছিলো,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

হে আল্লাহ! আমার এ জাতিকে ক্ষমা করুন, কারণ তারা জানে না, আমাকে তারা চিনে না, তারা অজ্ঞ। অজ্ঞতার বসে তারা এমন করছে। আল্লাহ তাদের তুমি হেদায়েত দান করো।[১০]

---

১০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৪৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪০১৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৪২৯

একথা তাঁর যবানে এজন্যেই উচ্চারিত হচ্ছিলো যে, কাফেরদের পাপ কাজের প্রতি তো তাঁর ঘৃণা ছিলো, কিন্তু তাদের সত্তার প্রতি কোনো ঘৃণা ছিলো না। কারণ, তারা আল্লাহর মাখলুক। আর যারা আমার আল্লাহর মাখলুক, তাদের তো আমি ভালোবাসি।

গোনাহগারকে ঘৃণা কোরো না

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, পাপ ও অন্যায়কে ঘৃণা না করাও গোনাহ। এজন্যে গোনাহকে অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে এবং খারাপ মনে করতে হবে। তবে যে লোক গোনাহে লিপ্ত, তার সত্তাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা যাবে না। বরং তার প্রতি দয়া পরবশ হতে হবে। যেমন কেউ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তারের কাজ তার উপর রেগে যাওয়া নয় যে, তুমি কেন অসুস্থ হলে? বরং তখন ডাক্তার তার প্রতি মমতাশীল হয় যে, আহা! বেচারা এমন অসুস্থ হয়ে গেলো! তার চিকিৎসা করে এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করে যে, হে আল্লাহ! তাকে সুস্থ করে দাও। এমনিভাবে গোনাহগার ফাসেক ফাজেরদের সঙ্গেও একই আচরণ করতে হবে যে, তাদের পাপ কাজের প্রতি তো ঘৃণা থাকবে, কিন্তু তাদের সত্তার সঙ্গে কোনো রকম ঘৃণা বা অবজ্ঞা থাকবে না। বরং এই হিসেবে তাদের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক থাকতে হবে যে, এরা তো আমার আল্লাহর মাখলুক এবং তাদের জন্যে দু'আ করতে হবে, আল্লাহ যেন তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

এক ব্যবসায়ীর ক্ষমার ঘটনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হয়। 'উপস্থিত করা হয়' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। তবে ভবিষ্যতের অনেক বিষয় নমুনা হিসেবে আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাকে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন,তার আমলনামা দেখো, সে কী কী আমল করেছে? ফেরেশতারা দেখলো, তার আমলনামা প্রায় নেকীশূন্য। না নামায আছে, না রোযা আছে, না আছে অন্য কোনো ইবাদত। দিনরাত তার কাজ ছিলো শুধু

ব্যবসা। আল্লাহ সকল বান্দার সব কিছু জানেন, কিন্তু অন্যদের সামনে বিষয়টি প্রকাশ করার জন্যে ফেরেশতাদের বললেন, দেখো তো! তার আমলনামায় অন্য কোনো আমল আছে কি না? তখন ফেরেশতারা বললো, হ্যাঁ, তার একটি নেক আমল আছে। তা হলো, গোলামদেরকে যখন সামানাপত্র দিয়ে ব্যবসার জন্যে পাঠাতো, তখন তাগিদ দিতো যে, কোনো ক্রেতাকে অভাবগ্রস্থ দেখলে তার সঙ্গে সদয় আচরণ করবে। বাকী বিক্রি করে থাকলে পাওনা আদায়ে তার সঙ্গে কঠোরতা করবে না। প্রয়োজনে ক্ষমা করে দিবে। আজীবন সে অভাবীদের সঙ্গে এমন করেছে। হয় সুযোগ দিয়েছে, না হয় ক্ষমা করে দিয়েছে। তখন আল্লাহ বললেন, যাও! সে যখন আমার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিতো, তাই আমি তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার আরো বেশি হকদার। তোমরা তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দাও।[১১]

মোটকথা, বান্দার সাথে ক্ষমার আচরণ করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়।

এটা আইন নয়, রহমত

তবে মনে রাখতে হবে যে, এটা রহমত ও দয়ার আচরণ ছিলো, আইনের নয়। তাই এরূপ চিন্তা করা যাবে না যে, ভালো একটা ব্যবস্থাপত্র পেয়ে গেলাম। এখন নামায-রোযা আদায় করা, যাকাত দেওয়া, অন্য কোনো ফরয কাজ করা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমিও আজ থেকে মানুষকে এভাবে ক্ষমা করতে থাকবো, তাহলেই কিয়ামতের দিন আমার নাজাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এটা ঠিক নয়। কারণ, এটা হলো আল্লাহর রহমতের আচরণ। আল্লাহর রহমত আইনের অধীন নয়, তিনি যাকে চান দয়া করে ক্ষমা করে দেন। আইন হলো, সমস্ত ফরয অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। যদি কেউ ফরযসমূহ আদায় না করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে না চলে, বরং কোনো এক আমলের উপর ভরসা করে বসে থাকে, তাহলে তা ঠিক হবে না। কারণ, এটা আল্লাহর আইন নয়। তাছাড়া একটি আমলের কারণে যাকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন, জানা নেই যে, তা সে কেমন আবেগ-উদ্দীপনা

---

১১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২১৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯২১, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১২২৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৪৬৪

নিয়ে করেছিলো। যার ফলে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় ঢেউ উঠেছে, আর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটা আমার-আপনার জন্যে কোনো আইনগত বিধান নয়।

নবাবকে গালি দেওয়ার পুরস্কার

হযরত থানভী রহ. এ জাতীয় ঘটনাসমূহের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্যে একটা ঘটনা বলেন যে, হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যের নেজামের একজন নবাব ছিলেন। একসময় মন্ত্রী তাকে দাওয়াত করে। নবাব সাহেব যখন মন্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করেন তখন মন্ত্রীর শিশু সন্তান সেখানে খেলা করছিলো। নবাব সাহেব শিশুদের সঙ্গে রসিকতা করে তাদেরকে উত্তেজিত করতেন। তিনি শিশুটির কান ধরলেন। শিশুটি ছিলো খুবই দুরন্ত। কে নবাব, কে রাজা- এ খবর তার ছিলো না। সে নবাবকে গালি দিয়ে বসলো। মন্ত্রী এ ঘটনা দেখে অত্যন্ত পেরেশান হলেন এবং আশঙ্কা করলেন যে, এখন না জানি বাচ্চার কী পরিণতি হয়। কারণ, বাদশাহ নামদারের মুখ দিয়ে যা বের হয় তাই এখানকার আইন। তখন মন্ত্রী নবাবের আনুগত্য প্রকাশের জন্যে তরবারী বের করে বললেন, আমি এখনি তার কল্লা উড়িয়ে দেবো। কারণ, সে আপনার সঙ্গে বেয়াদবী করেছে। নবাব সাহেব মন্ত্রীকে বাধা দিয়ে বললেন, বাদ দাও, শিশু তো এমন করবেই। একে তো আমার কাছে মেধাবী মনে হচ্ছে। তার মধ্যে এ পরিমাণ আত্মমর্যাদা বোধ আছে যে, কেউ যদি তাকে কানমলা দেয় তাহলে সে তার সামনে আত্মসমর্পণ করবে না। নিজেই প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। কারণ, সে নিজের উপর আস্থাশীল। তার জন্যে এখন থেকে একটা মাসিক ভাতা চালু করে দাও। তখন থেকে তার ভাতা চালু হয়ে গেলো। যে ভাতার নাম ছিলো 'ওযিফায়ে দোশনাম' বা 'গালি-ভাতা'।

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, এখন কি তুমি এ কথা চিন্তা করে বাদশাহকে গালি দিবে যে, গালি দিলে ভাতা পাওয়া যায়? এ কাজ কেউ করবে না। কারণ, এটা হলো বিশেষ একটা কারণে শিশুর প্রতি নবাবের মহানুভবতা যে, গালি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে শাস্তি না দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। এটা কোনো আইন নয় যে, কেউ বাদশাকে গালি দিলে ভাতা পাবে। বরং কেউ গালি দিলে তাকে প্রহার করা হবে বা বন্দী করা হবে। এমনকি তাকে হত্যাও করা হতে পারে।

আল্লাহর কোনো বান্দাকে পুরস্কৃত করার রহস্যটাও এখানেই। কাউকে কোনো এক উসিলায় পুরস্কৃত করেন, তো অন্য কাউকে অন্য কোনো উসিলায় পুরস্কৃত করেন। কারো এক আমল কবুল করেন, তো আরেকজনের কবুল করেন অন্য আমল। তাঁর রহমত কোনো আইন-কানুনের অধীন নয়। وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 'আমার রহমত তো সব কিছুতে বিস্তৃত।' তাই কখনো কারো প্রতি কোনো জুলুম আমার পক্ষ থেকে হয় না। বরং কোনো আমলের উপর বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়, যখন তা তাঁর নিকট বিশেষভাবে পছন্দ হয়।

কোনো নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করো না

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, কোনো নেক কাজই ছোট বা তুচ্ছ নয়। কারণ, কে জানে আল্লাহ কোন নেক কাজটা কবুল করবেন, আর তা আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে? তাই কোনো নেক কাজকেই তুচ্ছ মনে করতে নেই। কিন্তু এখান থেকে এ কথা চিন্তা করার কোনো অবকাশ নেই যে, এ সব ঘটনাতে যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ অমুককে অমুক কাজের উসিলায় ক্ষমা করে দিয়েছেন, সুতরাং নামায, রোযা ও অন্যান্য ফরযসমূহ আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে বসে থাকলেই চলবে। আপনারা শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অক্ষম তো ঐ ব্যক্তি যে নফসকে খাহেশাতের পিছনে ছেড়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির চাহিদা অনুপাতে কাজ করতে থাকে।[১২] হালাল-হারাম ও জায়েয-না জায়েয দেখে না। শুধু আল্লাহর উপর আকাঙ্খা করে বসে থাকে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি সব ক্ষমা করে দিবেন। এমনটি ভাবা কিছুতেই ঠিক নয়।

মানুষের প্রতি বিনম্র আচরণের ফলে ক্ষমাপ্রাপ্তি

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এক লোক ছিলো, সে কোনো পণ্য বিক্রি করলে ক্রেতার সঙ্গে সদয় আচরণ করতো। দু'-চার টাকার জন্যে বাড়াবাড়ি করতো

---

১২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৮৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৫০১

না। দাম চাওয়ার পর ক্রেতা কোনো দাম বললে চিন্তা করতো দু'-চার টাকার জন্যে বাড়াবাড়ি করে কি লাভ? ঠিক আছে, আমার লাভ একটু কম হলেও দিয়ে দেই। এমনিভাবে যখন কিছু ক্রয় করতো, তখনও বিক্রেতার সঙ্গে সদয় আচরণ করতো। বিক্রেতা দাম বলার পর সহজে দুই-এক কথায় দাম কমিয়ে দিলে তো ঠিক আছে, অন্যথায় দাম কমানোর জন্যে পীড়াপীড়ি বা জোর-জবরদস্তি না করে পণ্য কিনে নিতো।

এমনিভাবে কারো কাছে কোনো পাওনা থাকলে তা আদায় ক্ষেত্রেও সদয় আচরণ করতো। সময় মতো তা পরিশোধ করতে না পারলে বলতো- ঠিক আছে, পরে যখন সুযোগ হয় তখন আদায় করে দিও। এ ব্যক্তি পরকালে যখন আল্লাহর সম্মুখীন হলো, তখন আল্লাহ পাক বললেন, যেহেতু সে আমার বান্দাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করতো, তাই আমিও আজ তার সঙ্গে সদয় আচরণ করবো। এরপর তাকে ক্ষমা করে দিলেন। খোলাসা কথা হলো, বান্দাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করা এবং অভাবীকে সহজ করে দেওয়া আল্লাহর খুব পছন্দনীয় আমল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজীবনের অভ্যাস ছিলো, কারো সঙ্গে বেচাকেনা করলেই তিনি চুক্তির চেয়ে কিছু বাড়িয়ে দিতেন। ঐ যুগে সোনা-চাঁদির মুদ্রা চালু ছিলো। তা বিভিন্ন মূল্যমানের হতো। তাই সেগুলোর সংখ্যা না ধরে ওজন হিসাব করে মূল্য পরিশোধ করা হতো। এক বর্ণনায় এসেছে- একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পণ্য বাজার থেকে দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেন। মূল্য পরিশোধ করার সময় ওজনদাতাকে বললেন,

زِنْ وَأَرْجِحْ

'পাল্লাটা একটু ঝুঁকিয়ে ওজন করো।'[১৩]

অর্থাৎ, যে মূল্য পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার উপর এসেছে তার চেয়ে কিছু বেশি দিয়ে দাও।

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

১৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১২২৬, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৫১৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮৯৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২১১

'তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের হক সুন্দরভাবে আদায় করে।'[১৪]

অর্থাৎ, কম না করে বরং একটু বাড়িয়ে আদায় করে। যেমন ধরুন আপনার দায়িত্বে একশ টাকা ঋণ আছে। আপনি তা আদায় করার সময় একশ দশ টাকা পরিশোধ করলেন এবং পাওনাদারকে দিবো দিচ্ছি করে কষ্ট দিলেন না, বরং যথাসময়ে যেভাবে আদায় করলে সে খুশি হয় সেভাবে আদায় করলেন। এ সব বিষয়ই উত্তমভাবে আদায় করার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ওসিয়ত

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.- আমরা যাঁর ফিকহের অনুসারী- তিনি তাঁর শাগরিদগণের নামে লেখা এক ওসিয়তনামায় লিখেছেন- যখন কারো সঙ্গে বেচাকেনা করবে তখন তার হক থেকে একটু বাড়িয়ে দিবে। কখনো কম দিবে না।

এটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আমরা তো এগুলো ছেড়ে সামান্য কিছু সুন্নাত মুখস্থ করে নিয়েছি। শুধু সেগুলোর উপর আমল করি। অথচ এগুলোও তাঁর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর উপরও আমল করা জরুরী। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুন্নাতের এ অংশের উপরও আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন। মূল আলোচ্য হাদীসে এই সুন্নাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

'যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্থকে সহজ করে দিবে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করে দিবেন।'

প্রকৃত সহজতা তো হলো আখেরাতের সহজতা। কিন্তু অভিজ্ঞতা হলো, এমন ব্যক্তি দুনিয়াতেও পেরেশানির সম্মুখীন হয় না।

গণনা করে করে পয়সা আটকে রাখার উপর বদদু'আ

এক হাদীসে এসেছে, একজন ফেরেশতা প্রতিদিন এ দু'আ করতে থাকে,

اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْآخَرُ اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

---

১৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৪০, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৫৩৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৭৪৩

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সবসময় শুধু পয়সা গণনা করতে থাকে আজ কতো হলো, আজ কতো হলো; খরচ করতে যেন জান বের হয়ে যায় তুমি তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও।[১৫]

এই বদদু'আর ফলে তার সম্পদ এমনভাবে ধ্বংস হয় যে, কখনো তা চুরি হয়ে যায়, কখনো ডাকাতি হয়ে যায়, বা অন্য কোনো ক্ষতি হয়ে যায়। আর কিছু না হলেও বে-বরকতী অবশ্যই হয়। দেখতে হয়তো অনেক দেখা যায়, কিন্তু তাতে যে উপকার ও বরকত হওয়ার কথা তা হয় না। পয়সা বেশি হলেও ঘরে এমন অসুস্থতা লেগে থাকে যে, সব পয়সা চলে যায় ডাক্তারের পকেটে। এটাকে কীভাবে বরকত বলা যায়? কিংবা অনেক পয়সা জমা হলো ঠিক, কিন্তু ঘরে পারিবারিক অমিল-অশান্তি দেখা দিলো। যার ফলে জীবনে সুখ বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকলো না।

পয়সা খরচকারীদের জন্যে দু'আ

আর যারা পয়সা খরচ করে তাদের জন্যে ফেরেশতা এই বলে দু'আ করতে থাকে,

أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا

হে আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, দান খয়রাত করে, টাকা পয়সার ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করে, কাউকে দান করছে, কাউকে ক্ষমা করে দিচ্ছে- এমন ব্যক্তিকে দুনিয়াতে এর প্রতিদান দিন।

যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে এমন সদাচরণ করে, বাহ্যত যদিও মনে হয় যে, অন্যের তুলনায় তার টাকা-পয়সা বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বস্তুত তা খরচ হচ্ছে না, বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আরো বরকত নিয়ে আসছে। আল্লাহ তার প্রতিদান দিয়ে দেন। আজ পর্যন্ত এমন কাউকে দেখা যায়নি, যে দান-সদকা বেশি করার কারণে গরীব হয়ে গিয়েছে। এমন কখনো হয়নি। এ জন্যেই হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই সহজ করে দিবেন।

অন্যের দোষ গোপন করুন

আলোচ্য হাদীসের তৃতীয় বাক্যটি হলো,

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

১৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৫১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৮

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।'

যেমন কোনো মুসলমানের কোনো দোষ-ত্রুটি সামনে এলো যে, সে তো অমুক কাজটা ভুল ও নাজায়েয করছে। এখন যেখানে সেখানে কথায় কথায় তার এই দোষ চর্চা না করে তা গোপন রাখো। কারো সামনে প্রকাশ করো না। আর এ পন্থা ততোক্ষণ পর্যন্ত অবলম্বন করতে হবে, যতোক্ষণ তার এ আমলের কারণে অন্যের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা না থাকবে। পক্ষান্তরে কারো থেকে যদি এমন কোনো অন্যায় কাজ প্রকাশ পায়, যার কারণে অন্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন কাউকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, তখন তার এ দোষের কথা গোপন রাখা জায়েয নেই। বরং তখন তা প্রকাশ করে দেওয়া জরুরী। কিন্তু অন্যের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে নিয়ম হলো তার এ দোষ গোপন রাখো এবং তার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করো, হে আল্লাহ এই লোক অমুক গোনাহে লিপ্ত, আপনি দয়া করে তাকে এ গোনাহ থেকে মুক্ত করে দিন।

সারকথা হলো, অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না এবং প্রচারও করো না। আজকাল এ বিষয়ে খুবই অবহেলা দেখা যায়। একজন যখন জেনে যায় যে, অমুক ব্যক্তি এই কাজ করছে, তখন আর তার পেটে এ কথা ধরে না। অন্যকে তা না বলা পর্যন্ত শান্তি পায় না। অথচ এভাবে অন্যের দোষ অন্বেষণ করা এবং তা প্রচার করা- উভয়টিই গোনাহ।

কাউকে গোনাহের কারণে লজ্জা দিও না

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ

'যদি কেউ তার ভাইকে এমন গোনাহের উপর লজ্জা দেয়, যে গোনাহ থেকে সে তওবা করেছে, তাহলে ঐ ব্যক্তি ততোক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে ঐ গোনাহে লিপ্ত না হবে।'[১৬]

---

১৬. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪২৯, সুনানে তিরমিযী বর্ণনায় قَدْ تَابَ مِنْهُ শব্দ নেই। তবে হাদীসের ব্যাখ্যায় এ শব্দটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর বরাতে উলে-খ করা হয়েছে।

যদি কারো থেকে কোনো গোনাহ হয়ে যায় এবং সে তা থেকে তওবা করে নেয়, আর তুমি তাকে বার বার ঐ গোনাহের কারণে লজ্জা দিলে যে, তুমি তো সেই লোক, যে অমুক কাজ করেছিলে। আল্লাহর কাছে এমন কাজ খুবই অপছন্দনীয়। আল্লাহ বলেন, আমি তার ঐ গোনাহের উপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি। তা ক্ষমা করে দিয়েছি। তার আমলনামা থেকে তা মুছে দিয়েছি। এখন তুমি কে যে, এই গোনাহের উপর প্রশ্ন তুলছো এবং তাকে এ বিষয়ে লজ্জা দিচ্ছো। তুমি যদি তাকে এ বিষয়ে লজ্জা দাও, মনে রেখো তোমাকেও আমি এই গোনাহে লিপ্ত করবো। এ জন্যে কোনো মুসলমানের দোষ অন্বেষণ করা, তা বর্ণনা করা বা প্রচার করা অনেক বড়ো কঠিন গোনাহ। আল্লাহ তোমাকে এই দুনিয়াতে দারোগা বানিয়ে পাঠাননি যে, তুমি অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে। তোমাকে তো তিনি বান্দা বানিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর বন্দেগী করার জন্যে।

নিজের চিন্তা করো

সুতরাং তুমি নিজের চিন্তা করো। নিজের দোষ-ত্রুটি দেখো। নিজের ছিদ্রান্বেষণ করো। আল্লাহ যাকে নিজের দোষ-ত্রুটি দেখার ফিকির দান করেন, অন্যের দোষ-ত্রুটি তার নজরে পড়েই না। অন্যের দোষ তার নজরেই পড়ে, যে নিজের দোষ-ত্রুটির বিষয়ে বেপরোয়া। আত্মসংশোধনের বিষয়ে গাফেল। যে ব্যক্তি নিজেই রোগী, তার অন্যের সর্দি-কাশির ব্যাপারে চিন্তা করার সুযোগ কোথায়? যদি কেউ এমন করে, তবে তো সে বোকা। অন্যের পিছনে পড়া, অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজা, সেগুলো প্রচার করা কঠিন গোনাহ। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে বলেছেন। সুতরাং এসব কাজ করা কখনো কোনো মুসলমানের অভ্যাস হতে পারে না। একজন মুসলমানের জন্যে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। অন্যথায় কেউ প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না।

ইলমে দ্বীন শেখার ফযীলত ও সুসংবাদ

আলোচ্য হাদীসের চতুর্থ বাক্য হলো,

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

উক্ত বাক্যে আমাদের সকলের জন্যে অনেক বড়ো সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই সুসংবাদের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। এতে বলা হয়েছে, কেউ যদি দ্বীনের কোনো বিষয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয় তাহলে এই বের হওয়ার উসিলায় আল্লাহ তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। যেমন কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেলো। এখন আপনার এ বিষয়ের মাসআলা জানা নেই। তাই মুফতী ছাহেবের কাছে যাচ্ছেন এ কথা জানার জন্যে যে, এখন আমার করণীয় কি? এই পথ চলার দ্বারা আপনি উক্ত ফযীলতের ভাগী হয়ে যাবেন।

আমাদের পূর্বসূরীগণ অনেক পরিশ্রম করে ইলম সংকলন করেছেন

ইলম অর্জনের জন্যে আমাদের পূর্বসূরীগণ যে মেহনত করেছেন, সে রকম মেহনত করার সামর্থ আমাদের কোথায়? আজ আমরা বসে শুধু কিতাব খুলে হাদীস পড়ছি এবং ওয়াজ করছি। আর আমাদের পূর্বসূরীগণ অনাহার-অর্ধাহারে থেকে, ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের জন্যে এভাবে কিতাব সংকলন করে দিয়ে গিয়েছেন। তারা যদি এভাবে পরিশ্রম করে সংকলন করে দিয়ে না যেতেন, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ আমাদের কাছে এভাবে সংরক্ষিত হয়ে পৌছতো না। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেকটি আচরণ-উচ্চারণ হেফাজত করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের জন্যে কর্মধারা ও আলোর মিনার তৈরী করে গিয়েছেন।

একটি হাদীসের জন্যে দেড় হাজার কিলোমিটার সফর

বুখারী শরীফে একটি বর্ণনা এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব নিকটতম আনসারী সাহাবী হযরত জাবের রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর একদিন বসা ছিলেন। এমন সময় তিনি জানতে পারলেন যে, তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে এমন একটি হাদীস আছে, যা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শুনিনি। অন্য এক সাহাবী তা সরাসরি শুনেছেন। যিনি এখন শামের দামেস্ক শহরে অবস্থান করছেন। তিনি ভাবলেন, এ হাদীসটি আমি ঐ সাহাবী থেকে সরাসরি না শুনে কেন বসে থাকবো? হাদীসটি তো সরাসরি ঐ সাহাবী থেকে

শোনা দরকার, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নি... শুনেছেন। মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই অমুক সাহাবী এখন কো... আছেন? তারা বললেন, শামের দামেস্ক শহরে আছেন। জাবের রাযি. ত... মদীনার বাসিন্দা। সেখান থেকে দামেস্কের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজ... কিলোমিটার। আমি নিজেও সে রাস্তা সফর করেছি। যা সম্পূর্ণ তরু-লতা... মরু প্রান্তর। টিলা, গাছপালা বা পানির কোনো চিহ্ন সেখানে নেই। হযর... জাবের রাযি. তৎক্ষণাৎ উট তলব করে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং দে... হাজার কিলো মিটার পথ অতিক্রম করে দামেস্কে পৌছলেন। সেই সাহাবী... বাড়ি খুঁজে বের করলেন এবং দরজায় পৌছে করাঘাত করলেন। দরজা খু... তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- কী উদ্দেশ্যে আগমন হয়েছে?

হযরত জাবের রাযি. বললেন, আমি শুনেছি, তাহাজ্জুদের ফযীলত সম্প... আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি একটি হাদী... শুনেছেন। সেই হাদীসটি আমি আপনার জবানে শোনার জন্যে এখা... এসেছি।

তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শুধু এর জন্যে এসেছেন?

তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, শুধু এ উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি।

সাহাবী বললেন, ঐ হাদীস আমি পরে শোনাবো। প্রথমে অন্য একটি হাদীস শুনুন, যা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তারপর তিনি এই আলোচ্য হাদীসটি শোনালেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের ইল... শেখার জন্যে কোনো পথ অতিক্রম করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের প... সহজ করে দেন। এই হাদীস শোনানোর পর তাহাজ্জুদের ফযীলত বিষয়ে হাদীসটি শোনালেন। হাদীস শোনানোর পর তিনি বললেন, আপনি এক... সময় ভিতরে বসুন এবং খাবার খেয়ে নিন।

জাবের রাযি. বললেন, না আমি খাবার খাবো না। কারণ, আমি চাই আমার এ সফরটি কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদী... সংগ্রহের জন্যেই হোক। তাতে অণু পরিমাণও যেন অন্য কিছুর অনুপ্রবেশ ন... ঘটে। তাই আমি আর কোনো কাজই করতে চাচ্ছি না। হাদীস পেয়ে গেছি আমার সফরের লক্ষ্য অর্জন হয়ে গিয়েছে। আমি মদীনা মনুওয়ারায় ফির... যাচ্ছি। আসসালামু 'আলাইকুম।[১৭]

---

১৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৪৬৪, ইমাম বুখারী রহ. উক্ত ঘটনাটি অধ্যায়-শিরোনা... উল্লেখ করেছেন।

দ্বীনি মজলিসে যেতে ইলম শেখার নিয়ত করবে

দেখুন! একটি হাদীসের জন্যে কতো দীর্ঘ সফর করেছেন। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈনের জীবনী খুলে দেখুন তাঁদের একেক জন দ্বীনি ইলম শেখার জন্যে এবং হাদীস সংগ্রহ করার জন্যে কতো দীর্ঘ পথ সফর করেছেন। আজ হাদীসের এই সংগ্রহ আমাদের সামনে ভাজা রুটির মতো প্রস্তুত হয়ে পরিবেশিত আছে। অথচ এর পিছনে আল্লাহর ঐ সকল বান্দা কতো জান-মাল কোরবানী করে, কতো শ্রম দিয়ে আমাদের পর্যন্ত তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। এ কাজ যদি আমাদের মতো লোকদের দায়িত্বে পড়তো, তাহলে দ্বীনের ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেতো। আল্লাহর বড়ো মেহেরবানী যে, এ কাজের জন্যে তিনি তাঁদের মতো এক জামাআত তৈরী করেছেন, যারা ভবিষ্যত-প্রজন্মের জন্যে দ্বীনকে হেফাজত করেছেন। তাঁর বড়ো মেহেরবানী যে, এই দ্বীন সংরক্ষিত আছে। কিতাবাকারে মুদ্রিত হয়েছে। সবযুগে দ্বীনের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবজায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এখন আপনাদের কাজ হলো, শুধু তাদের কাছে গিয়ে প্রস্তুত বিষয়গুলো শিখে নেওয়া এবং মাসালাসমূহ জেনে নেওয়া। শেষ কথা হলো, উক্ত হাদীসে ইলম অন্বেষণকারীর জন্যে অনেক বড়ো সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা যারা এখানে একত্রিত হই, আমাদের উদ্দেশ্যও এই দ্বীন শেখা এবং দ্বীনের ইলম অন্বেষণ করা। সুতরাং ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ই আমরা যেন এ হাদীসটি স্মরণ করি এবং ইলম অন্বেষণ করার নিয়ত করে বের হই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ হাদীসের সুসংবাদ লাভের সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

যারা আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয় তাদের জন্যে মহা সুসংবাদ

আলোচ্য হাদীসের পরবর্তী বাক্যে আরেকটি সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কোনো জামাআত যখন আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করার জন্যে বা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আল্লাহর কোনো ঘর তথা মসজিদে একত্রিত হয়ে বসে যায়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর 'সাকীনা' বর্ষিত হতে থাকে এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নেয়। রহমতের ফেরেশতাগণ তাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে। অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত তাদের অভিমুখী হয়। আর রহমতের ফেরেশতা ঐ বান্দাদের জন্যে দু'আ

করতে থাকে। তাদের জন্যে মাগফিরাত ও আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। হে আল্লাহ! এরা আপনার দ্বীনের জন্যে একত্রিত হয়েছে, দয়া করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দিন। তাদেরকে দ্বীনদার হওয়ার তাওফীক দান করুন।

তোমরা আল্লাহর যিকির করো, আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করবেন

আলোচ্য হাদীসের পরবর্তী বাক্যটি হলো-

وَذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মজলিসে ঐ যিকিরকারীদের আলোচনা করেন যে, আমার বান্দারা নিজেদের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু আমার জন্যে, আমার যিকির করার জন্যে, আমার দ্বীনের কথা শোনার জন্যে একত্রিত হয়েছে। ফেরেশতাদের সঙ্গে বান্দাদেরকে নিয়ে আল্লাহর এভাবে আলোচনা করা কোনো সাধারণ কথা নয়! অনেক বড়ো ব্যাপার! কবি বলেন,

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

'আমার স্মরণ তো আমার চেয়েও উত্তম।
কারণ, আমাকে তো সেই মাহফিলে
(আল্লাহর মজলিসে)
স্মরণ করা হচ্ছে।'

এটা যেমন তেমন কোনো বিষয় নয় যে, প্রকৃত প্রেমাস্পদ আমাকে স্মরণ করবেন! এটা তো আমাদের কাজ ছিলো যে, আমরা তাঁকে স্মরণ করবো। আমাদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে,

فَاذْكُرُونِي

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো।'

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হলো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিদানের কথাও বলে দিয়েছেন,

أَذْكُرْكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আমরা তাঁকে স্মরণ করলে বা না করলে তাঁর কি আসে যায়!

আমাদের যিকিরের কী-ই বা মূল্য আছে? আমাদের যিকিরে তো তাঁর বড়োত্ব ও মহত্ত্ব এক কণা পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না। আর যদি আমরা তাঁর যিকির ছেড়ে দেই- বরং পুরো দুনিয়াও তাঁর যিকির ছেড়ে দেয়- তাতেও তো তাঁর বড়োত্বে ও মহত্ত্বে যাররা পরিমাণও ঘাটতি হবে না। আমাদের দৃষ্টান্ত তো হলো, সামান্য একটা খড়কুটার মতো। একটা খড়কুটা আল্লাহর যিকির করলে তাতে এমন কি হয়ে গেলো! কিন্তু আল্লাহ বান্দার স্মরণ বা আলোচনা করবেন এটা নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ কথা নয়। পরম সৌভাগ্যের কথাই বটে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি.-কে কুরআন শোনানোর নির্দেশ

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। প্রত্যেক সাহাবীকে আল্লাহ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিলো- তিনি খুব সুন্দর করে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করতেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَقْرَؤُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

'সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কুরআন তিলাওয়াতকারী হলেন উবাই ইবনে কা'ব রাযি.।'[১৮]

একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসা ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, তুমি উবাই ইবনে কা'বকে বলো সে যেন তোমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনায়। উবাই ইবনে কা'ব রাযি. যখন এ কথা শুনলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন যে, উবাই ইবনে কা'বকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে বলো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তোমার নাম নিয়ে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি.-এর মধ্যে এমন ভাব ও আবেগের সৃষ্টি হলো যে, তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আর

---

১৮. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭২৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৫১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২৪৩৭

বললেন, আল্লাহ আমাকে স্মরণ করবেন এবং আমার নাম নিবেন, আমি মোটেই এ সৌভাগ্যের যোগ্য নই।[১৯]

আল্লাহর যিকিরের মহাসুসংবাদ

আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে স্মরণ করবেন, এটা এতো ব দৌলত এবং এতো বড়ো নেয়ামত, যার সামনে দুনিয়ার সকল দৌলা নেয়ামত খুবই নগণ্য। উক্ত হাদীসে এই মহান দৌলতের ব্যাপারেই ব হয়েছে যে, কেউ যখন আল্লাহর দ্বীন শেখার জন্যে বা শিক্ষা দেওয়ার জ কোথাও একত্রিত হয়, আল্লাহ ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের সম্ আলোচনা করেন। এক হাদীসে কুদসীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলা ওয়াসাল্লাম বলেন (হাদীসে কুদসী ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে রা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কথা বর্ণনা করেন) আল্লাহ তা'য় বলেন,

فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

'যে ব্যক্তি একাকী আমার স্মরণ করে আমিও তাকে একাকী স্মরণ ক আর যে ব্যক্তি আমাকে কোনো মজলিসে স্মরণ করে আমি তাকে তার চে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।'[২০]

অর্থাৎ, সে যদি মানুষের মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আ ফেরেশতাদের মজলিসে তাকে স্মরণ করি।

এখানে আল্লাহর যিকিরের কতো বড়ো ফযীলতের কথা বলা হয়েছে! য পঠন-পাঠনের কাজ করে এবং দ্বীন বোঝা ও বোঝানোর জন্যে কো একত্রিত হয়, তারা সবাই এ ফযীলতের অধিকারী। আল্লাহ আমা সকলকে এ সৌভাগ্য অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন। আমরা য সপ্তাহে একদিন এখানে একত্রিত হই এবং দ্বীনের আলোচনা করি, এ কোনো সাধারণ কথা নয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে এটা বড়ো সওয়াব ফযীলতের বিষয়। তবে শর্ত হলো, অন্তরে ইখলাস থাকতে হবে এ আল্লাহর দ্বীনের তলব থাকতে হবে।

---

১৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫২৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫০৯, সুনানে তিরমি হাদীস নং ৩৭২৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১১৮

২০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৫৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৩২, সুনানে তিরমি হাদীস নং ২৩১০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮১২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭১১৫

বংশধর হওয়া নাজাতের জন্যে যথেষ্ট নয়

আলোচ্য হাদীসের শেষ বাক্য হলো,

وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

এ বাক্যটিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক অর্থবোধক বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অর্থ হলো, যার আমল তাকে পিছিয়ে দিলো বা আমলের কারণে যে পিছিয়ে পড়লো, তার বংশ কখনো তাকে অগ্রসর করে দিতে পারবে না। অর্থাৎ, যখন অন্যান্য লোকেরা তাদের নেক আমলের উসিলায় আগে আগে জান্নাতে চলে যাবে, তখন কেউ যদি তার আমল খারাপ হওয়ার কারণে জান্নাত পর্যন্ত পৌছতে না পারে, পিছনে থেকে যায়, তাহলে সে শুধু অমুক বংশের লোক হওয়ার কারণে, অমুক বুযুর্গ বা আলেমের সন্তান হওয়ার কারণে জান্নাতে পৌছতে পারবে না। বলতে চান যে, শুধু এ ভরসা করে বসে থেকো না যে, আমি তো অমুক বংশের ছেলে বা অমুক আল্লাহওয়ালার ছেলে। বরং নিজের আমল ঠিক করার ফিকির করো। যদি বংশীয় মর্যাদা কাজে আসতো, তাহলে নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে জাহান্নামে যেতো না। যেখানে নূহ আলাইহিস সালামের মতো বড়ো নবী ছেলের মুক্তির জন্যে দু'আ করছেন, আর তার উত্তরে আল্লাহ বলছেন,

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

সে তো নেক আমল করেনি।[২১] সুতরাং তার ব্যাপারে আপনার দু'আ কবুল করা হবে না। তো আসল বিষয় হলো নিজের আমল। তবে আমল ঠিক হওয়ার পাশাপাশি কোনো বুযুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে তখন সেটাকেও আল্লাহ তা'আলা উপকারী করেন। কিন্তু নিজের আমল, চেষ্টা এবং নিজের সংশোধনের চিন্তা অবশ্যই থাকতে হবে। কারো যদি নিজের সংশোধন, আমল, ও চিন্তা-চেষ্টা না থাকে, বরং গাফলতের মধ্যে ডুবে থাকে, তাহলে শুধু বড়ো বংশ বা বুযুর্গের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে সে কখনো জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হতে পারবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল ঠিক করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

২১. হূদ ঃ ৪৬

সারকথা

আজকের আলোচনার সারকথা হলো, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মহব্বতের দাবির অত্যাবশ্যকীয় শর্ত তাঁর মাখলুকের সঙ্গে মহব্বত ও দয়া-মায়ার সম্পর্ক থাকা। যতোক্ষণ পর্যন্ত এটা অর্জন না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সঙ্গে মহব্বতের দাবি মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের অন্তরে তাঁর এবং তাঁর মাখলুকের মহব্বত দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অন্যকে খুশি করুন*

হামদ ও সালাতের পর

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ سُرُوْرٌ يُدْخِلُهُ عَلٰى مُسْلِمٍ

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মুমিনকে খুশি করা আল্লাহর নিকট প্রিয়তম আমলসমূহের অন্যতম।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন হাদীসে এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোনো মুমিনকে একটু খুশি করা আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দনীয় আমল।

আল্লাহর বান্দাদেরকে খুশি রাখো

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, যখন কোনো বান্দা আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর প্রতি মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ করে, তখন যেন আল্লাহ তাকে বলেন, হে বান্দা! আমাকে যদি মহব্বত করতে চাও, তাহলে দুনিয়ায় তো কখনো তুমি আমার সাক্ষাত পাবে না যে, তোমার মহব্বতের প্রকাশ করতে পারবে, তবে দুনিয়ায় আমি আমার বান্দাদেরকে রেখেছি আমাকে মহব্বত করলে তাদেরকে মহব্বত করো এবং তাদের মহব্বতের মাধ্যমে আমার মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাও। আর আমার বান্দাদেরকে যদি মহব্বত করো তাহলে তাদেরকে খুশি করার এবং খুশি রাখার চেষ্টা করো।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ৯, পৃঃ ২৮০-২৮৮, ৩০ শে মার্চ ১৯৯৭ইং, রোজ রবিবার, বাদ আসর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং ১৩৬৪৬

কোনো অন্তরকে খুশি করা হজ্বে আকবর সমতুল্য

এ বিষয়ে আমাদের সমাজের মানুষ প্রান্তিকতার শিকার। মধ্য অবলম্বনকারী লোকের বড়ো অভাব। কিছু লোক আছে, যারা অন্যকে করার বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। এটা যে কতো বড়ো নেক ক এটা যেন তাদের জানাই নেই। কোনো মুসলমানকে বা কোনো মানুষকে করার জন্যে আল্লাহ যে কতো বড়ো প্রতিদান দিবেন, এ বিষয়ে আমাদের কোনো অনুভূতিই নেই। বুযুর্গগণ বলেছেন,

دل بدست آور کہ حج اکبر است

'কারো অন্তরকে খুশি করা হজ্বে আকবর বা বড়ো হজ্বতুল্য।'

তারা এমনিতেই এ কাজকে হজ্বে আকবরতুল্য বলেননি, বরং বাস্তবেই আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় আমল।

অন্যকে খুশি করার সওয়াব

একটু চিন্তা করে দেখুন যে, আমরা সকলে যদি উক্ত হাদীসের উ আমল শুরু করে দেই, সবাই এ চিন্তা করি যে, আমি অপরকে খুশি কর তাহলে এই দুনিয়াই জান্নাতের নমুনা হয়ে যাবে। ঝগড়া-ফাসাদ ও হিং বিদ্বেষ বলে দুনিয়ায় কিছুই থাকবে না। কোনো মানুষই অন্য কারো কার কোনো কষ্ট পাবে না। সুতরাং বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিন। নিজে একটু ক করে এবং একটু ত্যাগ স্বীকার করে অন্যকে খুশি করার চেষ্টা করুন।

আপনার একটু কষ্ট করার ফলে অন্য ব্যক্তি যদি একটু আরাম বোধ ক বা একটু খুশি হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আখেরাতে সওয়াব ও প্রতিদান দিবেন, তা কল্পনাতীত ব্যাপার।

হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাত করাও সদকাতুল্য

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন প্রকারে সদকার বিবরণ দিয়েছেন। বলেছেন, এই আমল সদকা, ঐ আমল সদক ইত্যাদি। অর্থাৎ, সদকা করলে যেই সওয়াব হয় এ আমলগুলোতেও সেই

সওয়াব পাওয়া যায়। ঐ হাদীসের শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَأَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

অর্থাৎ, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাত করাও একটি সদকা।[১] তুমি যখন কারো সঙ্গে সাক্ষাত করবে, তখন যেন তার অন্তরে খুশির অনুভূতি জাগে এবং তোমার সাক্ষাতে তার মন জুড়ায়। তাহলে তোমার এ সাক্ষাতটা সদকা বলে গণ্য হবে।

সুতরাং যারা অন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুখ ভার করে রাখে এবং গাম্ভীর্যের নামে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে, তারা সুন্নাতের উপর আমল করে না। সাক্ষাতের সুন্নাত তরীকা হলো, হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করো এবং সাক্ষাতকারীকে খুশি করার চেষ্টা করো।

গোনাহ করে কাউকে খুশি করবে না

অপর দিকে কিছু মানুষ এমন সীমালঙ্ঘন করে যে, তারা বলে যেহেতু একজনকে খুশি করা অনেক বড়ো ইবাদত, তাই আমরা এই ইবাদতের মাধ্যমে অন্যকে খুশি করি। যদিও তা কোনো নাজায়েয বা গোনাহের কাজ হোক না কেন। অথচ আল্লাহ এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অন্যকে খুশি করার উদ্দেশ্য হলো, জায়েয কাজের মাধ্যমে তাকে খুশি করতে হবে। কোনো নাজায়েয কাজ করে কাউকে খুশি করার অর্থ হলো, গোনাহ করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে বান্দাকে সন্তুষ্ট করা। যা ইবাদত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, বরং তা নিশ্চিত গোমরাহী।

কবি ফয়জির ঘটনা

বাদশাহ আকবরের যুগে ফয়জি ছিলেন অনেক বড়ো কবি ও সাহিত্যিক। একবার তিনি নাপিত দিয়ে দাড়ি মুণ্ডাচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এ অবস্থা দেখে বললো, জনাব আপনি দাড়ি মুণ্ডাচ্ছেন? কবি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, দাড়ি মণ্ডাচ্ছি ঠিক, কিন্তু কারো মনে ব্যথা দিচ্ছি না।

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৬০, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৯৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৪১৮২

অর্থাৎ, আমার এ অন্যায় কর্ম তো আমার মধ্যেই সীমিত। আমি ক
কষ্টের কারণ হচ্ছি না। কিন্তু তুমি আমার এ কাজের জন্যে যেভাবে ক
তাতে তো তুমি আমার অন্তরে ব্যথা দিলে। প্রতি উত্তরে ঐ ব্যক্তি ব
আরে তুমি বলছো কারো মনে তুমি ব্যথা দাওনি, তুমি তো এ কাজ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে ব্যথা দিচ্ছো।

অন্যকে খুশি করার সীমারেখা

অনেকের চিন্তায় ও কথায় দেখা যায় যে, তারা বলে থাকেন- আমি
অন্যের অন্তরকে খুশি করছি। যদি অন্যকে খুশি করার জন্যে কোনো গে
করতে হয় তাও তারা করতে দ্বিধা করে না।

কিন্তু ভাই! আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে তার নাফরমানী এবং তাঁর হুকু
পদদলিত করে অন্যকে খুশি করলেন, তাহলে গোনাহ করলেন। এটা ক
ইবাদত হবে না। হাদীসের উদ্দেশ্য তো হলো, জায়েয এবং শরীয়ত
কাজ করে অন্যকে খুশি করো।

হযরত থানভী রহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতেন, 'সূফিয়ায়ে কে
জন্যে এ কাজ তো স্বভাবজাত বিষয়ের মতো।'

অর্থাৎ, সূফিয়ায়ে কেরাম- যারা আল্লাহর প্রিয়তম ওলী- অন্যকে
করার বিষয়টি তো তাদের কাছে জন্মগত স্বভাবের মতো হয়ে যায়। ত
কাছে এসে সবাই খুশি হয়ে যায়। কেউ বিরক্ত হয় না। কারণ, আ
মেহেরবানীতে এই হাদীসের উপর তাদের আমল করার তাওফীক লাভ হ

নিজে গোনাহে নিপতিত হয়ো না

এরপর হযরত বলেন,

তবে এর জন্যে শর্ত হলো, অন্যকে খুশি করতে গিয়ে নিজে গোনাহে
হওয়া যাবে না।

অর্থাৎ, অন্যকে তো খুশি করবে, কিন্তু অন্যকে খুশি করার চিন্তায় নি
কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে গোনাহে নিপতিত হবে না।

এরপর হযরত বলেন,

যেমন কিছু লোক বলে, আমরা হলাম 'সুলহে কুল্' তথা সব বি
আপোষকামী। সুতরাং আমাদের নীতি হলো, যে যাই করুক না কেন, অ

কারোই কোনো ভুলের সংশোধনীতে যাবো না। কোনো মন্দকে মন্দ বলবো না। কোনো মন্দের প্রতিবাদ করবো না। কারণ, আমরা তো সব বিষয়ে আপোষকামী। এটা কোনো বিশুদ্ধ নীতি নয়।

ভালো কাজের আদেশ করা থেকে বিরত থেকো না

হযরত বলেন,

'কিছু লোক উপরোক্ত নীতির কারণেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে না।'

তারা চিন্তা করে- অমুককে যদি নামাযের কথা বলি, তাহলে সে মনে কষ্ট পাবে। অমুককে যদি তার গোনাহের কাজে বাধা দেই, তাহলে সে মনে ব্যথা পাবে। আমি কারো মনে কষ্ট দিতে চাই না। হযরত বলেন, এসব লোক কি কুরআনের এ নির্দেশ দেখেনি-

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

'আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে যেন তাদের প্রতি তোমাদের দয়া না হয়।'[৩]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দ্বীনবিরোধী কাজ করছে, গোনাহের কাজ করছে, তার ব্যাপারে তোমাদের মনে যেন এই দয়া না হয় যে, আমি যদি তাকে এ কাজে বাধা দেই, তাহলে সে মনে কষ্ট পাবে।

মন্দ কাজ থেকে নম্রভাবে বিরত রাখবে

তবে এটা অবশ্যই জরুরী যে, তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে যথা সম্ভব এমন পন্থা অবলম্বন করবে, যাতে সে কম ব্যথিত হয়। নম্রভাবে বলবে। বলার মধ্যে যেন সমবেদনা, সহমর্মিতা ও স্নেহ-ভালোবাসা থাকে। কল্যাণকামনা ও ইখলাস থাকে। তার প্রতিবাদ করে রাগ মিটানো যেন উদ্দেশ্য না হয়। কিন্তু এ চিন্তা কিছুতেই ঠিক নয় যে, আমি যতো নম্রভাবেই তাকে বলি না কেন, সে মনে কষ্ট পাবে, সুতরাং আমি তাকে কিছু বলবো না। কারণ, সকল মাখলুকের সন্তুষ্টির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়টি অগ্রগণ্য। সুতরাং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির এই প্রান্তিক দুই চিন্তাই ভুল। তাই সকল

---

৩. নূর ঃ ২

মুসলমানকেই খুশি রাখার চিন্তা করতে হবে। কিন্তু যখন আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা এসে যাবে, তখন কেউ খুশি হলো কি কষ্ট পেলো, তা দেখার বিষয় নয়। সেখানে তো আল্লাহর হুকুমই মানতে হবে। আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই করতে হবে। অন্য কারো পরোয়া করা যাবে না। অবশ্য যথাসম্ভব বিনয় ও নম্রপন্থা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অন্যের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ.... أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'হযরত আবু যর গিফারী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মানুষের সঙ্গে তার মেজাজ, স্বভাব ও অবস্থা বুঝে আচরণ কর।'[১]

একজন মানুষকে যাদের মুখোমুখি হতে হয়, তাদের স্বভাব, রুচি ও অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করাও দ্বীনের অংশ। এমন কাজ করা ঠিক নয়, যা কারো স্বভাব ও রুচির পরিপন্থী, বা কারো কষ্টের কারণ হয়। বাস্তবে যদিও সে কাজটি হালাল ও জায়েয। তথাপিও শুধু এ জন্যে তা পরিহার করা উচিৎ যে, এর দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে।

অন্যের স্বভাব ও রুচির প্রতি লক্ষ রাখা ইসলামী মুআশারাতের অনেক বড়ো অধ্যায়। আল্লাহ তা'আলা হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তিনি এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কারণ,

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ৯, পৃঃ ২৯১-৩০৭, ৩০ শে মার্চ ১৯৯৭ইং রোজ রবিবার, বাদ আসর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন খণ্ডঃ ৬, পৃঃ ৩৫৪

বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনেক ? অধ্যায়।

হযরত উসমান রাযি.-এর রুচির প্রতি লক্ষ করা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস ঘরে অবস্থান করছিলেন, তাঁর পরিধানের লুঙ্গি কিছুটা উপরে উঠানো ছি কোনো বর্ণনা মতে হাঁটু পর্যন্ত খোলা ছিলো। সম্ভবত এটা তখনকার ঘ যখন হাঁটু সতর হিসেবে বিধিত হয়নি। অবশ্য কোনো বর্ণনায় এসেছে আবৃত ছিলো। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি দরজায় করাঘাত করলো। জানা গে তিনি হযরত আবু বকর রাযি.। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস অনুমতি দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করে পাশে বসলেন। রাসূল সাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পা খোলা অবস্থায় ছিলো সেভাবেই থাকলে কিছুক্ষণ পর আবার অন্য কেউ দরজায় আওয়াজ দিলো, জানা গেলো, তি হযরত ওমর ফারুক রাযি.। তাঁকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং তিনিও এসে পাশে বসলেন। রা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববৎ পা খোলা অবস্থায় বসে থাকলে অবস্থার কোনো পরিবর্তন করলেন না। একটু পর আবার কেউ দর করাঘাত করলো। জিজ্ঞাসা করলেন কে? উত্তরে জানা গেলো, তিনি হয উসমান গণী রাযি.। সঙ্গে সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লু টেনে পাগুলো সুন্দরভাবে ঢেকে নিলেন। এরপর বললেন, তাকে আস বলো। অতএব তিনিও এসে বসলেন।

এ দৃশ্য দেখে একজন জিজ্ঞাসা করলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন হয সিদ্দীকে আকবর রাযি. তাশরীফ আনলেন, তখন আপনি লুঙ্গি ঠিক করে না, যখন হযরত ওমর ফারুক রাযি. আসলেন, তখনও একই অব থাকলেন, কিন্তু যখন উসমান গণী রাযি. তাশরীফ আনলেন, তখন আপ অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন এবং লুঙ্গি টেনে পা ঢেকে নিলেন, এর কারণ কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন,

আমি এমন ব্যক্তিকে কেন লজ্জা করবো না, যাকে ফেরেশতারাও লজ্জা করে?[২]

---

২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪১৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৪৮৪

লজ্জা হযরত উসমান রাযি.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

লজ্জা হযরত উসমান রাযি.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। আল্লাহ তাঁকে এ বিষয়ে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন। তাঁর উপাধি ছিলো كَامِلُ الْحَيَاءِ وَالْإِيْمَانِ অর্থাৎ, ঈমান ও লজ্জায় পরিপূর্ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবীর স্বভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। হযরত উসমান রাযি.-এর ব্যাপারে তিনি জানতেন যে, তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীল। তাই যদিও হাঁটু পর্যন্ত খোলা রাখা নাজায়েয নয়, যার কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত ওমর ফারুকের আগমনের পরও পা খোলা রেখেই বসে ছিলেন, কিন্তু যখন উসমান রাযি. আসলেন, তখন ভাবলেন তাঁর স্বভাবে যেহেতু লজ্জাবোধ বেশি, সুতরাং তাঁর সামনে এভাবে বসে থাকলে স্বভাবজাত লজ্জাবোধের কারণে তাঁর কষ্ট হতে পারে। এ জন্যে তিনি ভিতরে প্রবেশ করার আগেই লুঙ্গি টেনে পুরা পা ঢেকে নিলেন।

যে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য ইশারায় জান কুরবান করার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, তাদের স্বভাব ও রুচির প্রতিও তিনি এ পরিমাণ খেয়াল রাখতেন। মনে করুন, উসমান রাযি.-এর আগমনেও যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ অবস্থায়ই থাকতেন, তাতে এমন কি হয়ে যেতো? কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে এই শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে, তোমাদের সঙ্গীদের স্বভাব ও রুচি অনুপাতে তাদের সঙ্গে আচরণ করবে।

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর স্বভাবের প্রতি লক্ষ রাখা

একবার হযরত ওমর ফারুক রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর! আমি একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে জান্নাত দেখলাম এবং সেখানে দেখলাম একটি দৃষ্টি নন্দন অট্টালিকা। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার? আমাকে বলা হলো, এটা ওমরের জন্যে তৈরী করা হয়েছে। অট্টালিকাটি আমার এতোই ভালো লাগলো যে, আমার মন চাইলো ভিতরে গিয়ে দেখি ওমরের মহলটি কেমন? কিন্তু পরক্ষণেই তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা মনে পড়লো যে, আল্লাহ তোমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ খুব বেশি দান করেছেন। সুতরাং তোমার পূর্বে এ মহলে

প্রবেশ করা এবং তা দেখা তোমার আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী হবে, জন্যে আমি আর সেই মহলে প্রবেশ করিনি। এ কথা শুনে হযরত ওমর কেঁদে ফেললেন এবং বলে উঠলেন,

أَوَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাবো?'

আত্মমর্যাদাবোধ তো রয়েছে অন্যের সাথে। আপনি আমার মহলে আগে প্রবেশ করবেন, এটা তো গর্বের বিষয়।

এখান থেকে আপনি অনুমান করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা কতো সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের স্বভাব ও রুচির প্রতি লক্ষ রাখতে বিষয়টি এমন নয় যে, আমি ইমাম আর সে আমার মুক্তাদী, বা আমি কিংবা উস্তাদ আর সে আমার মুরীদ বা ছাত্র। সুতরাং সব অধিকারই আ তার কোনো অধিকার নেই। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা একেক সাহাবীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতিও খেয়াল রেখে আমাদের সা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদেরও অধিকার রয়েছে।

উম্মাহাতুল মুমিনীনের স্বভাবের প্রতি লক্ষ রাখা

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করার করলেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বললেন, ইয়া রাসূল আমারও আপনার সঙ্গে ইতিকাফে বসতে ইচ্ছা হচ্ছে। এমনিতে নারীদের জন্যে মসজিদে ইতিকাফ করা ঠিক নয়। নারীরা ইতিকাফ ক চাইলে ঘরেই করবে। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি.-এর অবস্থান এ দিক থে ভিন্ন ছিলো যে, তাঁর ঘরের দরজা মসজিদের ভিতরের দিকেই খোলা হ সুতরাং ঘরের দরজার সামনেই যদি মসজিদে তাঁর ইতিকাফের জায়গা হয়, আর তার সাথেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিকা জায়গা করা হয় তাহলে এতে পর্দার কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নে প্রয়োজনে ঘরে চলে যাবেন, আবার প্রয়োজন সেরে ইতিকাফের জায় ফিরে আসবেন। এ জন্যে তাঁর মসজিদে ইতিকাফ করাতে কোনো সম ছিলো না। বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি করেন।

৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪০৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪০৮, সুনানে ইবনে মা হাদীস নং ১০৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮১১৫

কিন্তু রমাযানের ২০ তারিখে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের বাইরে গেলেন, তখন ফিরে এসে দেখেন, মসজিদের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো তাঁবু টানিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন- এসব তাঁবু কাদের। লোকেরা বললো, এগুলো উম্মুল মুমিনীনদের তাঁবু। আয়েশা রাযি. যখন মসজিদে ইতিকাফ করার অনুমতি পেয়ে গেলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য বিবিগণও চিন্তা করলেন যে, আমরাও এ সৌভাগ্য অর্জন করি। তাই তাঁরাও মসজিদে নিজ নিজ তাঁবু টানিয়ে নিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, আয়েশার বিষয়টি তো ছিলো ভিন্ন। তার ঘর মসজিদের সঙ্গে। তার জন্যে তো পর্দা রক্ষা করেও মসজিদে ইতিকাফ করা সম্ভব। কিন্তু অন্যদের ঘর দূরে। তারা মসজিদে ইতিকাফ করলে বার বার ঘরে যাতায়াতে পর্দার লঙ্ঘন হবে। এভাবে তো নারীদের ইতিকাফ করা ঠিক নয়। তাই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

آلْبِرَّ يُرِدْنَ؟

'তারা কি বস্তুত কোনো নেক কাজের ইচ্ছা করছে?'

উদ্দেশ্য ছিলো নারীদের এভাবে মসজিদে ইতিকাফ করা কোনো নেক কাজ নয়।

এ বছর আমিও ইতিকাফ করবো না

কিন্তু সমস্যা ছিলো এই যে, তিনি যেহেতু আয়েশা রাযি.-কে ইতিকাফের অনুমতি দিয়েছিলেন- যদিও তাকে অনুমতি দেওয়াটা সঙ্গত কারণেই ছিলো, যা অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না- তথাপিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন, যদি আমি আয়েশার তাঁবু রেখে অন্যদেরকে নিষেধ করি, তাহলে এটা তাদের জন্যে কষ্টকর হতে পারে। এ জন্যে অন্যদের তাঁবু উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে হযরত আয়েশা রাযি.-কেও বললেন, তোমার তাঁবুও উঠিয়ে নাও। কিন্তু যখন ভাবলেন আয়েশাকে তো সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়েছিলাম, এখন তাঁবু উঠিয়ে দেওয়া তাঁর জন্যে কষ্টের কারণ হতে পারে, এ জন্যে তাঁর প্রতি খেয়াল করে ঘোষণা দিলেন যে, আমিও এ বছর ইতিকাফ করবো না। এ কারণে তিনি ঐ বছর আর ইতিকাফই করলেন না।[৪]

---

৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০০৭, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৭০২, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১০৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৭৬১

ইতিকাফের ক্ষতিপূরণ

অবশেষে যখন অন্য উম্মুল মুমিনীনদের প্রতি খেয়াল করে হযরত আয়েশা রাযি.-এর তাঁবু উঠিয়ে দিলেন এবং আয়েশা রাযি.-এর প্রতি খেয়াল করে নিজেও ইতিকাফ করলেন না। যে ইতেকাফের আমল তিনি আজীবন করেছেন, অন্যের মনে কষ্টের আশঙ্কায় সে ইতিকাফ এবার ছেড়ে দিলেন ফলে এর ক্ষতিপূরণের জন্যে পরবর্তী বছরের রমাযানে দশ দিনের পরিবর্তে তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

এটাও সুন্নাত

উপরের ঘটনা থেকে অনুমান করুন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে ছোটদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তিনি শরীয়তের একটি বিধানকে সুস্পষ্ট করার জন্যে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যাতে তা অন্যের কষ্টের কারণ না হয়। শরীয়তের বিধানও জানিয়ে দিলেন, সেটার উপর আমলও করলেন, আবার অন্যের মনে ব্যথা দেওয়া থেকেও বেঁচে থাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে এ শিক্ষাও দিলেন যে, যে আমল ফরয বা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব, এমন আমলকে যদি কেউ কারো মন রক্ষার জন্যে বিলম্বিত করে, বা ছেড়ে দেয় তাহলে এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর অভ্যাস

হযরত ডা. আব্দুল হাই রহ. প্রতি রমাযানে আসর পড়তে এসে মাগরিব পর্যন্ত ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করতেন। তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকতেন এবং সবশেষে ইফতারের আগ পর্যন্ত লম্বা সময় নিয়ে দু'আ করতেন। হযরত তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকেও পরামর্শ দিতেন যে, তারাও যেন এই আমলের অভ্যাস গড়ে তোলে। কারণ, এতে সময়টা মসজিদে অতিবাহিত হওয়ার পাশাপাশি ইতিকাফের ফযীলতও অর্জিত হয় এবং ব্যক্তিগত আমলগুলো আদায় করার এবং দু'আ করারও বিশেষ সুযোগ লাভ হয়। আর দু'আই তো হলো রমাযান মাসের বিশেষ অর্জন। কারণ, সারা দিনের রোজা শেষে ইফতারের একেবারে কাছাকাছি সময়ে মানুষের অবস্থা অনেকটা বিনম্র ও বিনয়ী হয়। এ অবস্থায়

দু'আ করলে আল্লাহর কাছে খুব বেশি কবুল হয়। হযরত অনেক সময়ই এটাকে অভ্যাসে পরিণত করার পরামর্শ এবং তাগিদ দিতেন। ফলে এখনও হযরতের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকদের অনেকের মধ্যে এ আমল অবশিষ্ট আছে।

একবার তাদের একজন হযরতকে বললেন, হযরত! আপনার কথা অনুযায়ী আমি অভ্যাস করে নিয়েছিলাম যে, আসরের পরের সময়টা মসজিদে বসে ই'তিকাফ, যিকির-আযকার ও দু'আয় অতিবাহিত করতাম। কিন্তু আমার স্ত্রী একদিন বললেন, আপনি সারা দিন বাইরে থাকেন, আসরের পরে যদি একসঙ্গে বসে কিছু কথাবার্তা বলতাম, একসঙ্গে ইফতার করতাম, তাহলে একটু ভালো লাগতো। কিন্তু এখন আপনি এ সময়টাও মসজিদে বসে থাকেন। এখন আমি বড়ো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি যে, আমার এই আমল বহাল রাখবো, না স্ত্রীর কথা অনুযায়ী আসরের পরের সময় বাসায় অতিবাহিত করবো? হযরত এ কথা শোনামাত্র বললেন, আপনার স্ত্রী ঠিক বলেছেন। এখন থেকে আপনি আসরের পরের সময় ঘরেই থাকবেন। সেখানে স্ত্রীকে সঙ্গ দিয়ে যতোটুকু পারেন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার করবেন। তারপর একসঙ্গে ইফতার করবেন।

এতে আপনি পূর্ণ সওয়াব পাবেন

এরপর হযরত বললেন, আমি যে অভ্যাস বানিয়েছি, এটা বেশির চেয়ে বেশি একটা মুস্তাহাব আমল। আর আপনার স্ত্রী যে আমলের কথা বলেছেন, তা তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, শরীয়তের সীমানায় থেকে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা স্ত্রীর অধিকার। অনেক সময় তার এই মনোরঞ্জন ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং আপনি স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে এ আমল ছেড়ে দিলেও আশা করি আল্লাহ আপনাকে এর বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন না। স্ত্রীর হক আদায়ের জন্যে এ আমল ছেড়ে দিলেও এর পূর্ণ সওয়াব আপনি পেয়ে যাবেন।

রোগীর সেবা-শুশ্রূষাও নেক কাজ

একবার হযরত বললেন, জনৈক ব্যক্তি তার প্রতিদিনের নিয়মিত আমলের জন্যে একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছে। তখন সে একাকী বসে আল্লাহর যিকির-আযকার, দু'আ, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকে। এ অবস্থায়

হঠাৎ ঘরে পিতা-মাতা বা স্ত্রী-সন্তানের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লো। ফলে এ সে তাদের সেবা-যত্নে ব্যস্ত। এখন তার যিকির-আযকার ও দু তিলাওয়াতের সুযোগ হচ্ছে না। এ জন্যে তার মনে কষ্ট হচ্ছে যে, এখন আমি ঐ ইবাদতগুলো করতে পারছি না।

হযরত বলেন, বস্তুত এখানে আফসোস বা কষ্ট পাওয়ার কোনো ক নেই। কেননা এখানে রোগীর সেবাই তার জন্যে ইবাদত হবে। এতোদিন যে যিকির-আযকার করতো, তার চেয়েও উত্তম হবে।

সময়ের দাবি পূরণ করা

হযরত বলেন, দ্বীন মূলত সময়ের দাবি অনুযায়ী আমল করার না দেখতে হবে এ মুহূর্তে তোমার কাছে দ্বীনের দাবি কি? এ মুহূর্তের দাবি হ যিকির-আযকার আপাতত বন্ধ রেখে রোগীর সেবা করা। এমন মনে ক না যে, এ সময় আমি যে যিকির-আযকার করতাম, এখন তো তা থে বঞ্চিত হচ্ছি। আল্লাহ তোমাকে বঞ্চিত করবেন না। কারণ, তুমি দ্বীনে অন্য একটি দাবি পূরণের জন্যেই মূলত এ কাজ ছেড়ে দিয়েছো।

রমাযানের সমূহ বরকত অর্জনের উপায়

একবার হযরত বলেন, কেউ যদি রমাযান মাসে অসুস্থ হয় কিংবা সফ বের হয় এবং এ কারণে রোযা রাখতে না পারে। তাহলে তার ব্যাপা শরীয়তের বিধান হলো, সে এ রোযাগুলো পরে কাযা করে নিবে এবং যেহেতু শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে রোযা ভেঙ্গেছে, এ জন্যে পরবর্তীতে দিনগুলোতে সে ঐ রোযা কাযা করবে, তাতেই তার রমাযান মাস ফি আসবে। অর্থাৎ, রমাযান মাসে যেমন বরকত-রহমত ছিলো, এখন দিনগুলোই তার জন্যে সে রকম রহমত ও বরকতপূর্ণ হয়ে যাবে। কার শরীয়তসম্মত ওযরবশত রমাযানের রোযা ভাঙ্গার কারণে সে রমাযানে বরকত থেকে মাহরূম থাকবে, এটা আল্লাহর রহমতের সঙ্গে কিছুতে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সুতরাং কেউ শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে তার কোনো নফল আম ছেড়ে দিলে বা বিলম্বিত করলে সেখানেও ইনশাআল্লাহ ঐ আমলের সব পূ ও বরকতের অধিকারী হবে। কারণ, সময়ের দাবি পূরণ করাই দ্বীন। আপ

এরূপ বলবেন না যে, এখন আমার যিকিরের সময় বা তিলাওয়াতের সময়, অতএব কেউ অসুস্থ হোক বা মারা যাক তাতে আমার কি? এমন মনোভাব পোষণ করা কখনো দ্বীন হতে পারে না।

যেখানে সেখানে পীড়াপীড়ি করবেন না

সুতরাং কারো সঙ্গে তার স্বভাব, রুচি ও তার সার্বিক অবস্থার প্রতি বিবেচনা করে আচরণ করবেন। কারো সঙ্গে কোনো কাজ করতে আগে দেখবেন, আমার এ কাজ তার জন্যে কষ্টের কারণ হবে না তো। এ দিকে লক্ষ করে তার সঙ্গে আচরণ করবেন। এটা ইসলাহে মু'আশারা তথা সমাজ-সংস্কারের অনেক বড়ো একটা মৌলিক শিক্ষা। আজকাল মানুষ এর প্রতি লক্ষ করে না। একজনের জন্যে যে কাজটা অনেক বড়ো কষ্টের, এখন যদি আপনি সে কাজের জন্যে বার বার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, তাহলে হয়তো দেখা যাবে, সে পীড়াপীড়ির কারণে বাধ্য হয়ে আপনার কথা মেনে নিলো। কিন্তু এতে আপনি তার উপর যে বোঝাটা চাপিয়ে দিলেন এবং তাকে যে কষ্ট দিলেন, এ কারণে (আল্লাহ মাফ করুন) হয়তো বা আপনি গোনাহগার হয়ে যেতে পারেন।

সুপারিশের একটি নীতি

আজকাল সুপারিশ করানোর রেওয়াজ খুব প্রচলিত। যেন কারো সঙ্গে সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো, সে অবশ্যই আমার জন্যে সুপারিশ করবে। এ জন্যে সবাই সুপারিশ বিষয়ক কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটিও খুব মনে রাখে-

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا

'যে ব্যক্তি কোনো নেক সুপারিশ করবে, আল্লাহ ঐ কাজের সওয়াবের একটি অংশ তাকেও দান করবেন।'[৫]

এ কথা ঠিক যে, ভালো কাজে সুপারিশ করার অনেক ফযীলত আছে। কিন্তু মানুষ এ কথা ভুলে যায় যে, সুপারিশ তখনই ফযীলতের কাজ হিসেবে

---

৫. নিসা ঃ ৮৫

গণ্য হয়, যখন তা যার কাছে সুপারিশ করা হয় তার কষ্টের কারণ না হ
আপনি যদি একজনকে খুশি করার জন্যে যার কাছে সুপারিশ করা হচ্ছে
অবস্থার প্রতি লক্ষ না রেখে এমনভাবে সুপারিশ করেন যে, সে আপ
সুপারিশের কারণে বিপদে পড়ে যায়। একদিকে আপনার সুপারিশ র
করতে গেলে তার নীতি বিসর্জন দিতে হয়, অপরদিকে আপনার সুপা
উপেক্ষাও করতে পারছে না এই চিন্তায় যে, এতো বড়ো মানুষ সুপা
করেছেন এখন সুপারিশ না রাখলেও তো তিনি কষ্ট পাবেন। তাহলে
তো আর সুপারিশ থাকলো না, বরং চাপ প্রয়োগ করা হলো। এ ধর
সুপারিশে কখনো ঐ ফযীলত পাওয়া যাবে না।

হযরত থানভী রহ.-এর সব সময়ের অভ্যাস ছিলো, তিনি যখনই কা
কাছে সুপারিশ করতেন, সঙ্গে অবশ্যই এ কথা লিখে দিতেন যে, 'য
আপনার নীতি ও সঙ্গতি পরিপন্থী না হয়, তাহলে তার এ কাজটি করে দি
কখনো এ কথাও বৃদ্ধি করতেন 'যদি আপনার জন্যে এ কাজ অসঙ্গত ম
করে না করেন, তাহলে আমি সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করবো না।' এ কথাগু
এজন্যে লিখতেন, যাতে সুপারিশ তার জন্যে বোঝা বা চাপের কারণ না হয়
এটাই হলো সুপারিশের নীতি।

একবার এক লোক আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বলে
তাই আমি আপনাকে একটা কাজের কথা বলতে চাচ্ছি। আমি বললাম, ক
কি কাজের কথা বলতে চান? সে বললো, না এভাবে বলবো না। আ
ওয়াদা করুন যে, আপনি এ কাজ করে দিবেন। আমি বললাম, কি কাজ
যদি না জানি, তাহলে আমি কীভাবে ওয়াদা করি যে, একাজ করে দিব
আবার বললো, না আগে ওয়াদা করুন কাজটি করে দিবেন। আমি বললা
যদি কাজটি আমার সামর্থের বাইরে হয় তাহলে আমি কীভাবে করে দিব
বলতে লাগলো- আপনার সে কাজের সামর্থ আছে, আপনি ওয়াদা করু
আমি বললাম, আগে বলুন না কাজটা কি? তার একই কথা যতোক্ষণ কাজ
করে দেওয়ার ওয়াদা না করবেন, ততোক্ষণ আমি বলবো না কি কাজ।

আমি তাকে হাজারো বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, আগে ঐ কাজে
বিবরণ দিন, তারপর ওয়াদা করবো। না জেনে কীভাবে ওয়াদা করি
অবশেষে সে বলতে লাগলো- যদি ওয়াদা না করেন, তাহলে আপ
আমাদের সম্পর্ক ঠিক রাখলেন না। এখন আপনিই বলুন, এটা কোন ধরনে
সুপারিশ হলো? এটা তো একজনের উপর চাপ সৃষ্টি করা হলো যে, যতোক্ষ

কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা না করবেন, ততোক্ষণ কি কাজ করে দিতে হবে তাও বলবো না। আজকাল সুপারিশ করা কারো সঙ্গে সম্পর্কের এমনই অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হয়ে গিয়েছে। অথচ এটা ইসলামী মুআশারাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ, অন্যায়ভাবে একজনকে মানসিক চাপ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলা গোনাহের কাজ।

পারস্পরিক সম্পর্ক রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছে

আজকাল পারস্পরিক সম্পর্ক ও মহব্বতটা রেওয়াজ সর্বস্ব হয়ে গিয়েছে। সে রেওয়াজ পালন করা হলে তবেই যেন মহব্বতের হক আদায় করা হলো, অন্যথায় নয়। ধরুন, কারো সঙ্গে একজনের সম্পর্ক হলো, সে তাকে দাওয়াত করলো। সে তার মাথায় চড়াও হয়ে দাওয়াতে যাওয়ার জন্যে বলবে। দাওয়াতে তাকে যেতেই হবে। এ জন্যে তাকে কতো কষ্ট ও কতো প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হবে, তা বুঝতেই চাইবে না। তার একমাত্র চিন্তা হলো, আমার দাওয়াতে যদি না আসে তাহলে সে আমার মহব্বতের হক আদায় করলো না।

হযরত মুফতী ছাহেব রহ.-এর দাওয়াত

আমাদের নিকট অতীতের এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত ইদরীস কান্ধলভী রহ. (আল্লাহ তাঁর মর্যাদা আরো সুউচ্চ করুন)। এই বুযুর্গ আমার আব্বাজান হযরত মুফতী শফী রহ.-এর একান্ত বাল্যবন্ধু ছিলেন। একবার তিনি লাহোর থেকে করাচী তাশরীফ আনলেন এবং আব্বাজানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে দারুল উলূমে আসলেন। এমন সময় আসলেন, যখন খাবারের সময় না। তাঁর আগমনে আব্বাজান অনেক খুশি হলেন এবং সম্মানের সঙ্গে সংবর্ধনা জানালেন। যখন তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন আব্বাজান বললেন, ভাই ইদরীস ছাহেব! আমার দিলের তামান্না ছিলো আপনি আমাদের সঙ্গে এক বেলা খাবার খাবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আপনার অবস্থান এখান থেকে অনেক দূরে। আপনার হাতে সময় একেবারেই কম। এখন যদি আমি আপনাকে পীড়াপীড়ি করি যে, আপনি আমাদের সঙ্গে এক বেলা খাবার খেয়ে যান, তাহলে আমি মনে করি এটা 'দাওয়াত' হবে না, বরং 'আদাওয়াত' (দুশমনি) হবে। কারণ, আপনার হাতে সময় অনেক কম। আর আরেকবার

আসতে চাইলে তাতেও আপনার চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় ব্যয় হবে। এ
আপনার অনেক কষ্ট হবে। এ জন্যে আমার মন চাইলেও আপনাকে দাওয়া
করছি না। কিন্তু দাওয়াত ছাড়াও মন মানছে না। তাই আপনাকে দাওয়া
করলে আমার যে পয়সা খরচ হতো সেই সামান্য পরিমাণ পয়সা আপ
আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে কবুল করুন। হযরত মাওলানা ইদরী
রহ. পয়সাগুলো আব্বাজানের কাছ থেকে গ্রহণ করে মাথার উপর রে
বললেন, এটা আমার জন্যে অনেক বড়ো নেয়ামত। বস্তুত আমারও দিলে
তামান্না ছিলো আপনার সঙ্গে এক বেলা খাবার খাবো। কিন্তু সময় সঙ্কট
কারণে কোনো অবকাশ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন আপনি আমার জন্যে প
খুলে দিলেন।

এখানে দেখুন আব্বাজান যদি তাঁকে বলতেন, আপনাকে এক বে
খাবার আমার সঙ্গে অবশ্যই খেতে হবে। এরপর তিনি বলতেন, ভাই আম
তো সময় নেই। প্রতি উত্তরে আব্বাজান বলতেন, না ভাই বন্ধুত্বের দাবি হ
অবশ্যই আপনাকে আমার দাওয়াত রাখতে হবে। তাহলে তিনি যে জর
কাজে এতো দীর্ঘ সফর করে এসেছেন সে কাজ বাদ দিয়ে হয়তো পাঁচ-সা
ঘণ্টা সময় কুরবানী করতেন। কিন্তু এটা আর তখন 'দাওয়াত' থাকতো ন
'আদাওয়াত' হয়ে যেতো।

মহব্বতের লোককে আরাম পৌছানোই বস্তুত মহব্বতে দাবি

বর্তমান যুগের এই রসম-রেওয়াজ শুধু যে আমাদের সমাজের ক্ষতি কর
তাই নয়, বরং তা দ্বীনি আদব-আখলাক থেকেও আমাদেরকে দূরে সরি
দিয়েছে। হযরত থানভী রহ. কতোই না সুন্দর বলেছেন, 'মাহবুবকে আর
পৌছানোর নাম হলো মহব্বত।'

যদি তাঁর কথাটি আল্লাহ আমাদের অন্তরে বসিয়ে দেন, তাহলে আমাদে
সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে।

যাকে তুমি মহব্বত করো তাকে আরাম পৌছাবার চিন্তা করো। নিজে
মন মতো করার নাম মহব্বত নয়। মহব্বতকারী যদি অজ্ঞ ও বেউকুফ হ
তাহলে তার মহব্বতের কারণে মাহবুব কষ্ট পায়। কিন্তু আমার হযরতে
নিয়ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর নীতি হলো, মহব্বতের কারণে কষ্ট পাওয়া
কোনোই অর্থ নেই। যদি তুমি কাউকে সত্যিকার অর্থেই মহব্বত করে

তাহলে তুমি তার আরামের চিন্তা করো। কোনোভাবেই তাকে কষ্ট দিও না। প্রয়োজনে নিজের যে কোনো চাহিদা ও প্রেরণাকে বিসর্জন দিয়ে হলেও মাহবুবের আরামের ব্যবস্থা করো।

এ সব ঐ হাদীসের ব্যাখ্যা, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ

অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে তার স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী আচরণ করো। যার সঙ্গে তুমি আচরণ করবে, প্রথমে চিন্তা করবে যে, এ আচরণ তার কষ্টের কারণ হবে কি না? এটা তার স্বভাব ও রুচির পরিপন্থী হবে কি না? তবে আমার অভিজ্ঞতা হলো, এ বিষয়গুলো বুযুর্গদের সান্নিধ্য ছাড়া অর্জিত হয় না। হযরত থানভী রহ.-এর খানকায় তো এমনভাবে মানুষের তারবিয়াত করা হতো যে, প্রত্যেকের একেকটি আমলের প্রতি খেয়াল করে করে তাকে শিক্ষা দেওয়া হতো যে, মানুষের সঙ্গে কোনো আচরণ করতে গিয়ে কীভাবে তার স্বভাব, রুচি ও অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতে হয়?

এটা ছিলো আদাবুল মুআশারাত সম্পর্কিত শেষ হাদীস। এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো নীতি বলে দিয়েছেন যে, আমার কারণে অন্য কেউ যেন সামান্যতম কষ্টও না পায়, এ বিষয়ের প্রতি খুব লক্ষ রাখতে হবে।

জিগার মুরাদাবাদী নামে একজন কবি ছিলেন। তিনি হযরত থানভী রহ.-এর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তার একটি কবিতা আছে, যা সমস্ত আদাবুল মুআশারাতের খোলাসা। এটাকে লক্ষ্য বানিয়ে যদি আমল করতে পারি, তাহলে সব এসে যাবে। কবিতাটি হলো-

اس نفع و ضرر کے دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں

اپنا تو زیاں منظور سہی' اوروں کا زیاں منظور نہیں

'সুখ-দুঃখের এ দুনিয়ায় প্রেমের
এ শিক্ষা আমি লাভ করেছি যে,
নিজের ক্ষতি তো মেনে নিতে পারি,
কিন্তু অন্যের কষ্ট সইতে পারি না।'

অর্থাৎ, দুনিয়া কখনো মন মতো হয় না। সুতরাং আমার মন ও চাহিদার বিরুদ্ধে কিছু হলে বা আমার কষ্টের ও ত্যাগের কোনো বিষয় সামনে এলে তা আমি মেনে নিতে পারি, কিন্তু আমার কারণে অন্যের কষ্ট হবে, বা অন্যের জান-মালের কোনো ক্ষতি হবে, তা আমি হতে দিতে পারি না। পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের এটাই শিক্ষা এবং আদাবুল মুআশারাতের এটাই সারকথা। আল্লাহ আমাকে, আপনাকে ও সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হাসিমুখে সাক্ষাত করা সুন্নাত*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ: لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قُلْتُ أَخْبِرْنِيْ عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ فَقَالَ "أَجَلْ وَاللّٰهِ إِنَّهٗ لَمَوْصُوْفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهٖ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّيْنَ أَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَّقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا[1]

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১২, পৃঃ ১৩০-১৫৬, বাদ আসর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী। উক্ত বয়ানটি ইমাম বুখারী রহ.-এর কিতাব 'আল আদাবুল মুফরাদ' এর অংশ বিশেষের দরস

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৮১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৩৩৩, আল আদাবুল মুফরাদ পৃঃ ৮৪-৮৫

হাসিমুখে সাক্ষাত করা মানবিক অধিকার

এটি দীর্ঘ একটি হাদীস। ইমাম বুখারী রহ. এর শিরোনাম দিয়েছেন بَابُ الْإِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ। অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে হাস্যোজ্জল মুখে সাক্ষাত করা এবং তাদের মধ্যে মিলে-মিশে থাকা।

যে কিতাবে তিনি এ অধ্যায় লিখেছেন, সে কিতাবের নাম দিয়েছেন اَلْأَدَبُ الْمُفْرَدُ। এ কিতাবে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ সকল হাদীস সংকলন করেছেন, যেগুলো জীবনের বিভিন্ন শাখার ইসলামী আদব ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা ও কাজের মাধ্যমে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই আদবগুলোর একটি হলো মানুষের সঙ্গে খোলা-মেলা ও হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাত করো। এটা আল্লাহর মাখলুকের প্রাপ্য অধিকার। নিজেকে রুক্ষমূর্তিতে অন্যের সামনে প্রকাশ করো না। যাতে তোমাকে দেখে সবাই প্রীত হয়, কেউ ভীত না হয়। আল্লাহ তোমাকে দ্বীন ও দুনিয়ার যতো বড়ো পদেই অধিষ্ঠিত করুন না কেন, এটা তোমার নিকট সর্বদাই কাম্য। বড়ো পদবীর কারণে তুমি নিজেকে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন করে ভীতিকর ভাবমূর্তি নিয়ে বসে থেকো না। বরং তাদের সঙ্গে সাধারণভাবে সাধারণের মতোই মিশে থাকো। এটা নবীগণের সুন্নাত।

নববী এই সুন্নাতের উপর কাফেরদের আপত্তি

এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন একটি সুন্নাত, যার উপর কাফেররা প্রশ্ন তুলেছিলো। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

'কাফেররা বলে, এ কেমন রাসূল যে খাবারও খায়, আবার বাজারেও যায়।'[২]

কাফেররা মনে করতো বাজারে যাওয়া পয়গাম্বরী পদমর্যাদার পরিপন্থী। এরকম মনে করার কারণ ছিলো, তারা তাদের রাজা-বাদশা ও নেতাদেরকে

২. আল ফুরকান ঃ ৭

এমনই দেখেছে। তারা যখন নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তারা সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের মতো তারা বাজারে যায় না। যদি কখনো যেতো তাহলে সম্পূর্ণ শাহী শান-শওকত ও রাজকীয় ভাবমূর্তি নিয়ে যেতো। তাই তারা মনে করতো নবুওয়াতের পদমর্যাদা তো শাহী মর্যাদার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ। সুতরাং তিনি তো সাধারণের মতো বাজারে যেতে পারেন না।

কিন্তু কুরআনে কারীম এই ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, পয়গাম্বর তো আসেন তোমাদেরকে শিখানোর জন্যে এবং তোমাদের সংশোধনের জন্যে। সুতরাং দুনিয়ার কাজকর্মেও তারা মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে হাতে-কলমে শিখিয়ে দেন যে, কোন কাজের আদব কি? শর্ত কি? কোন কাজ কীভাবে করতে হয়? সাধারণ মানুষ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন না। অতএব পয়গাম্বরদের জন্যে সবার সঙ্গে মিলে বাজারে যাতায়াত করা কোনো দোষের বিষয় নয়, বরং এটা তাদের দায়িত্ব।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলতেন, যে ব্যক্তি অনুসরণীয় হওয়ার পর সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকে এবং এটাকে নিজের শান মনে করে, সে মূলত এ বিষয়ের কিছুই বোঝে না।

হযরত আরো বলতেন, এ অবস্থায়ও একজন সাধারণ মানুষের মতোই থাকো। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপূর্ব বন্ধুভাবাপন্নতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মদীনার বাজার 'মানাকা'য় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। (মদীনার এ বাজারটি এখন মসজিদে হারামের সম্প্রসারিত অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। একসময় আমিও এ বাজার দেখেছি) বেদুঈন সাহাবী হযরত যাহের রাযি. গ্রাম থেকে পণ্য এনে এই বাজারে বিক্রি করতেন। তিনি ছিলেন গরীব। দেখতে কালো। একজন সাধারণ সাহাবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পিছন থেকে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন,

مَنْ يَشْتَرِي هٰذَا الْعَبْدَ مِنِّي

'কে আছে, যে আমার নিকট থেকে এই গোলামটি ক্রয় করবে?'

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে রসিকতা করলেন। হযরত যাহের রাযি. যখন কণ্ঠ চিনে ফেললেন, তখন তার খুশির অন্ত রইলো না। তিনি বলেন, তখন আমি আমার পিঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই গোলাম বিক্রি করলে তো আপনি মূল্য একেবারেই কম পাবেন। কারণ, আমি খুব সাধারণ একজন কালো মানুষ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যাহের তুমি আল্লাহর কাছে কম দামী নও।[৩]

এ ঘটনা থেকে অনুমান করুন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। আবার সেখানে একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে রসিকতা করছেন। কোনো দর্শক কি অনুমান করতে পারবে যে, তিনি এতো মহান একজন 'উলুল আযম' নবী! যাঁর সামনে হযরত জিবরাঈল আমীনেরও পাখা জ্বলে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম তো নয়, যেন একজন সাধারণ পথিক

আমার শাইখ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. (আল্লাহ তাঁর মর্যাদা সুউচ্চ করুন) বলেন, একবার আমি আমার চেম্বারে বসে আছি (হযরতের চেম্বার তখন প্রিন্স রোডে ছিলো এবং আমাদের বাসাও তখন প্রিন্স রোডের কাছেই ছিলো) এমন সময় দেখলাম, পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম হযরত মুফতী শফী রহ. একটি পাতিল নিয়ে খুব সাধারণ মানুষের মতো ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি তো এ দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, সারা বিশ্ব যার তাকওয়া, পরহেযগারী ও গুণগরিমায় মুখরিত, তিনি এভাবে একজন সাধারণ মানুষের মতো পাতিল হাতে নিয়ে হাঁটছেন? তখন সাথীদেরকে বললাম, দেখুন তো! তাঁকে দেখে কারো পক্ষে বোঝার উপায় আছে কি, তিনি পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম?

এরপর হযরত ডা. আরেফী রহ. বললেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকে তাঁর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নসিব করেন, তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের মাঝে

---

৩. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২১৮৭, শামায়েলে তিরমিযী, পৃঃ ১৬

এমনভাবে মিশিয়ে রাখেন, যা দেখে কখনো বোঝা যায় না যে, তিনি কোন স্তরের মানুষ।

আর এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। নিজের বিশেষ শান বজায় রাখার জন্যে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা তাঁর সুন্নাতের পরিপন্থী।

বিনয়ের সঙ্গে মসজিদে নববী থেকে মসজিদে কোবায় গমণ

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্ধুসুলভ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববী থেকে পায়ে হেঁটে হযরত ইতবান ইবনে মালেক রাযি.-এর বাড়িতে গেলেন। যার অবস্থান প্রায় তিন মাইল দূরে মসজিদে কোবার নিকটে। তাঁর ঘরে গিয়ে তিনবার আওয়াজ দিলেন। সম্ভবত তিনি এমন কোনো অবস্থায় ছিলেন যে, ডাকে সাড়া দিতে পারেননি। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের নির্দেশ-وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ 'যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও তাহলে তোমরা ফিরে যাও।'[৪]-এর উপর আমল করে মসজিদে নববীতে ফিরে গেলেন এবং বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। নিজের পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের হক আদায় করার জন্যে বন্ধুর বাড়িতে এসেছেন। সাক্ষাত হয়নি তো স্বাভাবিকভাবেই ফিরে গিয়েছেন। কিছুই মনে করেননি। পরে যখন হযরত ইতবান ইবনে মালেক তাঁর আগমন এবং তাকে না পেয়ে ফিরে যাওয়ার কথা জানতে পারলেন তিনি দৌড়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং নিজেকে উৎসর্গ করে ক্ষমা চান।

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, আল্লাহকে তোমরা কীভাবে ভালোবাসবে? তাঁকে কখনো দেখোনি, বোঝোনি, এমনকি কখনো তাঁকে কল্পনাও করতে পারোনি।

আল্লাহ বলেন, আমার সঙ্গে যদি তোমার ভালোবাসা থাকে, তবে আমার মাখলুককে ভালোবাসো। আমার মাখলুকের সঙ্গে সদাচরণ করো। তাহলে তোমাদরে জীবনে আমার ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হবে। এটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এ জন্যেই ইমাম বুখারী রহ. স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়

---

৪. নূর ঃ ২৮

রচনা করেছেন, যার শিরোনাম হলো, بَابُ الْإِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ। অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে এমনভাবে মিলেমিশে থাকা যে, আমি তাদেরই একজন। নিজের অবস্থানগত কোনো বৈশিষ্ট্য তৈরী না করাই হলো এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। এতে তিনি হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রহ.-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি ঐ সকল সাহাবীর একজন, যাঁরা অধিক ইবাদতগুজার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক বড়ো আবেদ, যাহেদ ও বুযুর্গ ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল শরীফের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এ কিতাবগুলো আপন অবস্থায় বহাল ছিলো না, বরং ইহুদী-নাসারারা এগুলো বিকৃত করেছিলো। কিন্তু তথাপিও সেগুলোর বাস্তবতা ও বিকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ইহুদী-নাসারাদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করার উদ্দেশ্য সেগুলো পড়ার অনুমতি রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. তাওরাতের কিছু অংশ ইহুদীদের কাছে পড়েছিলেন।

তাওরাতে এখনো কিতাবুল্লাহর আলো বিচ্ছুরিত হয়

তাওরাত যদিও এখন পরিপূর্ণ আগের মতো নেই। অনেকাংশই ইহুদীরা বিকৃত করে ফেলেছে। অনেক সংযোজন বিয়োজন করেছে। কিন্তু তথাপিও অনেক জায়গা থেকে এখনো কিতাবুল্লাহর আলো বিচ্ছুরিত হয়।

তাই এখনো তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমণের সুসংবাদ এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা বিদ্যমান রয়েছে। যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় আরো অনেক সুস্পষ্ট ছিলো। এ জন্যে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

'ইহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে চেনে, যেমন তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে।'[৫]

কারণ, তাওরাতে আখেরী নবীর বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিত উল্লিখিত ছিলো। তিনি কেমন গুণাবলীর অধিকারী হবেন, তাঁর অবয়ব কেমন হবে এবং তিনি কোন শহরে ও কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করবেন ইত্যাদি সব উল্লেখ ছিলো। ফলে যারা ঐ সব কিতাবের আলেম ছিলো, তারা স্বচক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে আখেরী নবীর সকল নিদর্শন দেখেও একগুঁয়েমি, গোঁড়ামি ও হঠকারিতার কারণে তাঁকে মেনে নিতো না। হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রাযি. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি.-এর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাত হলো, তখন তাকে বললাম, আপনি তো তাওরাত পড়েছেন। তাওরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, তা আমাদেরকে বলুন।

বাইবেল বনাম কুরআন

এ সব কিতাব এতো পরিবর্তন করা সত্ত্বেও সেগুলোর কোনো কোনো অংশ এমন মনে হয়, যেন হুবহু কুরআনের অনুবাদ। তাদের প্রসিদ্ধ কিতাব বাইবেল, যাকে 'কিতাবে মুকাদ্দাস'ও বলা হয়। ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়েই এ কিতাব মানে। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ আজও বিদ্যমান আছে। এই মুহূর্তে তাওরাতের একটি বাক্য আমার মনে পড়লো। বাক্যটি হলো,

(অনুবাদ) 'যিনি 'ফারান' থেকে উদিত হবেন। 'সালাহে'র অধিবাসীরা গীত গাইবে। 'কায়দার'-এর জনপদগুলো প্রশংসা করবে।'

'ফারান' ঐ পাহাড়ের নাম, যাতে হেরা গুহা অবস্থিত। 'সালাহ' ঐ পাহাড়ের নাম, যার একাংশ 'সানিয়্যাতুল ওয়াদা'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের সময় মদীনার শিশুরা যেখানে দাঁড়িয়ে এই গীত গেয়ে স্বাগত জানিয়েছিলো,

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ‎ ‎ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

৫. বাকারাহ ঃ ১৪৬

'সানিয়্যাতুল ওয়াদা' থেকে আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে।'[৬]

আর 'কায়দার' হলো, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ছেলের নাম। তাঁর বংশধারা আরবের বিভিন্ন জনপদ আবাদ করেছে। সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে যখন শেষ নবীর আগমন ঘটবে, তখন কায়দারের জনপদগুলো তার প্রশংসা করবে।

তাওরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর উল্লেখ

হযরত আতা ইবনে ইয়াসারের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. বললেন,

وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ

'আল্লাহর কসম! তাওরাতে তাঁর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে, যা কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে।'

এরপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি।'[৭]

شَاهِدًا 'সাক্ষী'- অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আপনি এ কথার সাক্ষ্য দিবেন যে, এ উম্মতকে আল্লাহর তাওহীদের পয়গাম পৌঁছানো হয়ে ছিলো। তারপর অমুক লোকেরা তা মেনে নিয়েছে, আর অমুক লোকেরা তা মেনে নেয়নি।

مُبَشِّرًا 'সুসংবাদদাতা'- অর্থাৎ, তিনি ঈমানদারদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন।

نَذِيرًا 'ভীতিপ্রদর্শনকারী'- অর্থাৎ, গোনাহগার ও কাফেরদেরকে জাহান্নামের ভীতিপ্রদর্শন করবেন।

---

৬. আররিয়াজুন নাদরাহ ফি মানাকিবিল আশারা, খণ্ডঃ ১, পৃঃ ৫৬, দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৬৩, হাদীস নং ৭৫৩, আসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ইবনে কাসীরকৃত, খণ্ডঃ ২, পৃঃ ২৬৯

৭. আহযাব ঃ ৪৫

হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. উক্ত আয়াত তেলাওয়াতের পর তাওরাতের বক্তব্য পড়ে শোনালেন,

وَحِرْزًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী লোকদের মুক্তিদাতা হয়ে আগমন করবেন। 'উম্মী' শব্দটি বিশেষত আরবদের জন্যে উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কারণ, তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন ছিলো না। এ বিষয়টিই তাওরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

এরপর তাওরাতে এসেছে,

أَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ

আল্লাহ বলছেন, হে নবী মুহাম্মাদ! আপনি আমার বান্দা ও রাসূল।

سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ

'আমি আপনার নাম রেখেছি মুতাওয়াক্কিল' অর্থাৎ, আল্লাহর উপর ভরসাকারী।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো গুণ আলোচিত হয়েছে এভাবে,

لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ

'তিনি শক্ত কথা বলেন না এবং রূঢ় স্বভাবের নন।'

وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ

'এবং তিনি বাজারে শোর-গোলকারীও নন।'

وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ

'তিনি মন্দের প্রতিদান মন্দ দ্বারা দিবেন না।'

وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ

'বরং ক্ষমা করে দিবেন এবং ছাড় দিবেন।'

وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ تَعَالٰى حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

'আর এই বক্র জাতিকে ঠিক না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন না। অর্থাৎ, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করার আগে আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিবেন না।'

فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا

'অতপর আল্লাহ এই কালেমার বদৌলতে অন্ধ চোখসমূহ, বধির কানসমূহ এবং পর্দাবৃত অন্তরসমূহ খুলে দিবেন।'

উপরোক্ত এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা প্রায় হুবহু শব্দে আজো তাওরাতে বিদ্যমান রয়েছে।

তাওরাতের হিব্রু ভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক ভাষার রীতি ও বাক-শৈলী ভিন্ন। মূল তাওরাত ছিলো হিব্রু ভাষায়। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, উর্দূ বাকরীতি অনুসারে তার অনুবাদ করলে বলা যায়,

وہ ٹلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا' ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا

হিব্রু ভাষারীতি অনুযায়ী এভাবে অনুবাদ করা হয়,

'তিনি মন্দের প্রতিদান মন্দ দিয়ে দিবেন না, বরং ক্ষমা ও ছাড়ের দৃষ্টিতে দেখবেন এবং তাঁর সামনে পাথরের মূর্তিগুলো সব উপুড় হয়ে পড়ে যাবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করেছিলেন, তখন এ ঘটনা ঘটেছিলো। কাবা ও তার আশপাশে যতো মূর্তি স্থাপিত ছিলো, সব তার সামনে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিলো। 'বাইবেল সে কুরআন তক' নামে 'ইযহারুল হক'-এর যে অনুবাদ আমি করেছি, তার তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়টি এ জাতীয় সুসংবাদ দ্বারাই পরিপূর্ণ। সেখানে আমি দুই কলাম বানিয়ে প্রথম কলামে বাইবেলের বক্তব্য এবং দ্বিতীয় কলামে কুরআন ও হাদীসের বিবরণ তুলে ধরে দেখিয়ে দিয়েছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বৈশিষ্ট্যগুলো কুরআন-হাদীসে এসেছে, সেগুলো বাইবেলেও এসেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বাইবেলের এতো বিকৃতি সত্ত্বেও আজো বাইবেলে তা বিদ্যমান রয়েছে।

উক্ত হাদীস দ্বারা ইমাম বোখারী রহ.-এর উদ্দেশ্য

যে উদ্দেশ্যে ইমাম বোখারী রহ. তাঁর কিতাবে উক্ত হাদীসটি এনেছেন তা হলো, পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করা। বিশেষ করে সে সব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কোনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বপূর্ণ, তার বিবরণ দেওয়া।

সে বৈশিষ্ট্য হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শক্ত কথা বলেন না, তিনি রূঢ় স্বভাবের নন এবং তিনি মন্দের প্রতিকার মন্দ দিয়ে করেন না।

এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নাত। যদিও কুরআনে কারীমে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে তার সম পরিমাণ প্রতিশোধ তুমিও নিতে পারো। কেউ যদি তোমাকে একটা থাপ্পড় দেয়, তাহলে তুমিও সমপরিমাণ থাপ্পড় দিতে পারো। কিন্তু তার চেয়ে বেশি দিতে পারবে না। তবে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি ভিন্ন বিষয়, আর সুন্নাত ভিন্ন বিষয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুরো জীবনে কারো থেকে কখনো নিজের জন্যে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

মন্দের প্রতি-উত্তরে সদাচরণ

এটিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক বড়ো একটা সুন্নাত। আজকাল আমরা সুন্নাতকে কিছু বাহ্যিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছি। যেমন মেসওয়াক করা, দাড়ি রাখা এবং বাহ্যিক বেশ-ভূষা সুন্নাত মোতাবেক করাকেই সুন্নাত মনে করি। এগুলো সুন্নাত ঠিক আছে এবং যে এগুলো অস্বীকার করবে, সে সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞ। তবে সুন্নাত শুধু এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, লেনদেন ও আচার-আচরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কর্মপদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোও সুন্নাতের অনেক বড়ো একটি অংশ এবং যে পরিমাণ গুরুত্বের সঙ্গে অন্যান্য সুন্নাতের উপর আমল করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে এসব সুন্নাতের উপর আমল করা উচিৎ। মন্দের প্রতি-উত্তর মন্দ দ্বারা দেবো না, বরং মন্দের প্রতি-উত্তর সুন্নাত মোতাবেক সদাচরণ দ্বারা দেবো। এবার আমরা আমাদের জীবনের পাতায় একটু চোখ বুলিয়ে দেখতে পারি যে, আমরা এই সুন্নাতের উপর কতোটুকু আমল করছি। আমার সাথে কেউ অসদাচরণ করলে তার

প্রতিশোধ স্পৃহা আমার অন্তরে কীভাবে জমতে থাকে এবং তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে কী পরিমাণ চেষ্টা করি। চিন্তা করলে দেখা যাবে, আমাদের বর্তমান সমাজের অধঃপতনের বড়ো একটা কারণ হলো, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুন্নাতটি ছেড়ে দিয়েছি। আমরা চিন্তা করি যে, যখন আমার সাথে খারাপ করেছে, আমিও তার সাথে খারাপ করবো। যে আমাকে গালি দিবে, আমিও তাকে গালি দেবো। সে আমার বিয়েতে যেমন উপহার দিয়েছে, আমিও তাকে তেমন উপহারই দেবো। সে যদি আমার বিয়েতে কোনো উপহার না দিয়ে থাকে, তাহলে আমিও তাকে দেবো না। এমন করার অর্থই হলো, এগুলো প্রতিদান দেওয়ার জন্যে করা হয়। আর যে শুধু প্রতিদান দেয়, সে কখনো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হয় না। হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا

'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি নয়, যে ব্যক্তি প্রতিদান দেয়, বস্তুত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ঐ ব্যক্তি, যার সঙ্গে আত্মীয়তা ছিন্ন করলে এবং আত্মীয়ের হক আদায় না করলে তবুও সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে না, বরং তাদের সঙ্গে সদাচরণ করে।'[৮]

হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ.-এর অত্যাশ্চর্য ঘটনা

একদিন হযরত আরেফী রহ. তাঁর ভক্ত-মুরীদদের সঙ্গে ঘরে বসে ছিলেন। হঠাৎ হযরতের এক আত্মীয় এসে উপস্থিত হলেন। তার দাড়ি-মোচ সব মুণ্ডানো। দরজায় এসেই সে গালি-গালাজ শুরু করে দিলো। নিতান্তই বেয়াদবের মতো গাল-মন্দের যতো শব্দ তার জানা ছিলো, একাধারে সব বলতে থাকলো। এদিকে তার প্রত্যেক কথার জবাবে হযরত বলে যাচ্ছিলেন, ভাই আমাদের ভুল হয়ে গিয়েছে, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। সামনে এ ভুলের ক্ষতিপূরণ করে দেবো। তোমার পায়ে ধরি, তুমি ক্ষমা করে দাও। অবশেষে হযরতের বিনয়ী আচরণে তার এই অগ্নিশর্মা রাগ ঠান্ডা হলো।

পরে বললেন, আল্লাহর এ বান্দার কাছে কোনো ভুল তথ্য পৌছে ছিলো। এ কারণেই সে এভাবে রাগ হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে তার জবাব দিতে

---

৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৩২, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৩১, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৪৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬২৩৮

পারতাম এবং তার গাল-মন্দেরও প্রতিশোধ নিতে পারতাম। কিন্তু আমি তাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করেছি। কারণ, যতো হোক সে আমার আত্মীয়। আত্মীয়ের অনেক অধিকার আছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অনেক সহজ। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত শিক্ষা হলো, আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। আর এটাই হলো,

لَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ

মন্দের প্রতিউত্তর মন্দ দ্বারা না দেওয়া, বরং আদর-সোহাগ এবং মহব্বত ও কল্যাণকামনা দ্বারা দেওয়া।

মাওলানা রফীউদ্দীন রহ.-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা রফীউদ্দিন রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। অত্যাশ্চর্য বুযুর্গ ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মানে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। তিনি একটি গাভী পালন করতেন। একবার তিনি গাভী নিয়ে আসছেন। পথিমধ্যে মাদরাসার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি গাভী নিয়েই মাদরাসায় চলে আসেন। গাভীটি মাদরাসার মাঠে গাছের সঙ্গে বেঁধে তিনি দপ্তরে যান। এমতাবস্থায় দেওবন্দের এক লোক মাদরাসায় এসে খুব হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। এ গাভী কার? এখানে গাভী বেঁধেছে কে? লোকেরা বললো, এটা মুহতামিম ছাহেবের গাভী। এরপর সে বলতে লাগলো- ও! মাদরাসা মুহতামিম ছাহেবের কসাইখানা হয়েছে বুঝি! মাদরাসাকে উনি এমনভাবে খাওয়া আরম্ভ করেছেন যে, এখন এটাকে গোয়াল ঘর বানিয়েছেন! তার হৈ-চৈ শুনে সেখানে মানুষের জটলা হয়ে গেলো এবং বিভিন্ন অপবাদ শুরু হয়ে গেলো। হযরত দপ্তরে কাজ করছেন। আওয়াজ শুনে বের হলেন যে, কি ঘটনা? লোকেরা বললো, হযরত মাদরাসায় গাভী বাঁধার কারণে এ লোক খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। হযরত বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। এ মাদরাসা আল্লাহর। এখানে আমার গাভী বাঁধা ঠিক হয়নি। কারণ, গাভী আমার ব্যক্তিগত জিনিস, আর মাঠটি হলো মাদরাসার। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি এই ভুলের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আর আমার মন চাচ্ছে এই ভুলের কাফফারা হিসেবে আপনি গাভীটি নিয়ে যান। এ আল্লাহর বান্দাও এমন ছিলো যে, সে গাভী নিয়ে রওয়ানা দিলো।

দেখুন! যেখানে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে সাধারণ মানুষ সবার সামনে এভাবে উচ্চ-বাচ্য করলো, সেখানে তাকে কিছু তো বলা হলো না। উল্টো গাভীটিও

তাকে দিয়ে দেওয়া হলো। এটাই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। لَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ 'মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত না করা'র উপর আমল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সুন্নাতের উপর আমল করা জরুরী

সহজ সহজ সুন্নাতের উপর আমল করার নাম সুন্নাতের পাবন্দী নয়। সুন্নাতের পাবন্দ হওয়ার জন্যে প্রত্যেক সুন্নাতের উপর আমল করার ফিকির করা উচিৎ। মানুষ যতো অধিক পরিমাণে সুন্নাতের নিকটবর্তী হবে, সমাজ ততো অধিক পরিমাণে ফেৎনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত হবে। চিন্তা করে এবং পরীক্ষা করে দেখুন! যতো ফেৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে, সব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত থেকে দূরে থাকারই অবশ্যম্ভাবী ফল।

وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ

'বরং তিনি ক্ষমা করে দেন এবং ছাড় দেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ তো ছিলো, যে যাই বলুক না কেন তিনি কোনো জবাব দিতেন না। আল্লাহর ওলীগণও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁর পন্থা অনুসরণ করতেন। কামনা করি, আল্লাহ আমাদেরকেও এর কিছু অংশ দান করুন। আমীন।

এ কথাগুলো এ জন্যে আরয করছি যে, আমরা সকলে মূলত একই নৌকার আরোহী। এখন আমাদের নিজেদেরও জানা নেই যে, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি। কোথা থেকে কোথায় গন্তব্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে বসার উদ্দেশ্য হলো, কিছু সময়ের জন্যে হলেও সুন্নাতের কথা স্মরণ হবে। এবং আশা করি অন্তরে সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা তৈরী হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার উপর আমল করার তাওফীক দান করবেন। সকল সুন্নাতের উপর আমল করার অভ্যাস গড়ুন। এ জন্যে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমাদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। মনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের গন্তব্যে উপনীত হতে হলে এ তিক্ত ঢোক গিলতেই হবে।

আল্লাহর নিকট প্রিয়তম ঢোক

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যতো ঢোক গেলে তার মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো ক্রোধের ঢোক, যার দ্বারা বান্দা তার রাগ হজম করে।[৯]

অর্থাৎ, মানুষের যখন রাগ উঠে এবং রাগের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্যের ক্ষতি করে ফেলার আশঙ্কা করে, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সেই রাগ হজম করে নেওয়া এবং রাগের চাহিদা অনুসারে কাজ না করা আল্লাহর নিকট অনেক প্রিয় কাজ। এমন লোকদের প্রশংসায় কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

'আর যারা ক্রোধ হজম করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়।'[১০]

অর্থাৎ, তাদের যখন ক্রোধ জাগে এবং প্রতিশোধ স্পৃহা জ্বলে ওঠে- যদিও সীমার ভিতর থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে- কিন্তু তখন তারা ভাবে, প্রতিশোধ নিলে কী লাভ হবে? মনে করো, তোমাকে কেউ একটা থাপ্পড় মারলো। তুমি যদি তার প্রতিশোধে একটা থাপ্পড় মেরে দাও, তাতে তোমার কী লাভ হবে? পক্ষান্তরে তুমি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তার কতো বড়ো প্রতিদান পাবে!

আল্লাহর নিকট ধৈর্যশীলদের প্রতিদান

উপরোক্ত আমলের ফল হবে এই,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ বেহিসাব প্রতিদান দিবেন।'[১১]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিতে অভ্যস্ত, তার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, সে আমার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে, আমি তো তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার আরো বেশি অধিকার রাখি। এই বলে আল্লাহ এমন ব্যক্তির গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

---

৯. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৮৬০

১০. আল ইমরান ঃ ১৩৪

১১. যুমার ঃ ১০

ক্ষমা ও ধৈর্যের একটি আদর্শ ঘটনা

হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর জামানায় দুই ব্যক্তির পরস্পরে ঝগড়া লাগলো। তাতে একজনের দাঁত ভেঙ্গে গেলো। যার দাঁত ভেঙ্গে গেলো, সে অপরজনকে হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর কাছে ধরে নিয়ে এলো। এসে বললো, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত চাই। আপনি আমার দাঁতের 'কিসাস' দিয়ে দিন।

হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন, ঠিক আছে, তোমার 'কিসাস' নেওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু এতে তোমার কী লাভ হবে? তোমার দাঁত তো ভেঙ্গেই গিয়েছে। এখন তার দাঁত ভেঙ্গে তোমার কী লাভ হবে? তার চেয়ে বরং সমঝোতা করে তার কাছ থেকে দাঁতের 'দিয়্যাত' নিয়ে নাও। সে বললো, না আমি দাঁতের বদলে দাঁত চাই। হযরত মুআবিয়া রাযি. তাকে আবার বোঝালেন, কিন্তু সে তা মানলো না। অবশেষে তিনি বললেন, ঠিক আছে চলো তার দাঁত ভেঙ্গে দিচ্ছি।

রাস্তায় হযরত আবুদ দারদা রাযি. বসা ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের সাহাবী। তিনি বললেন, দেখো ভাই! 'কিসাস' তো নিতে যাচ্ছো, তবে একটি কথা শুনে যাও। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি কাউকে কষ্ট দেয় এবং সে তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে এই ক্ষমাকারীকে আল্লাহ তখন ক্ষমা করে দিবেন, যখন সে (পরকালে) ক্ষমার প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। ইতিপূর্বে লোকটি দাঁতের বিনিময়ে পয়সা নিতেও সম্মত ছিলো না, কিন্তু সে এ কথা শুনে হযরত আবুদ দারদা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলো,

أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আপনি কি নিজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শুনেছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি নিজে শুনেছি এবং আমার এই কানগুলো শুনেছে। তখন সে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এ কথা বলে থাকেন তাহলে আমি কোনো বিনিময় ছাড়াই তাকে ক্ষমা করে দিলাম।[১২]

---

১২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৩১৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৬৮৩

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এবং আমাদের মাঝে পার্থক্য

হাদীস আমরাও শুনি এবং তাঁরাও শুনতেন। কিন্তু তাঁদের অবস্থা ছিলো এই যে, যতো বড়ো ইচ্ছা এবং যতো বড়ো প্রকল্প ও সংকল্পই হোক না কেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী কানে পড়া মাত্র তা ধুলিস্যাৎ করে দিতেন। আমরা সকাল-সন্ধ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনতে থাকি, পড়তে থাকি, কিন্তু আমাদের কোনো প্রেরণা জাগ্রত হয় না। এ কারণেই এ পড়া ও শোনার দ্বারা আমাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে না। এ জন্যেই সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতে অভাবনীয় সম্মান দান করেছেন এবং আখেরাতে দান করবেন অনেক উঁচু মর্যাদা। ইনশাআল্লাহ।

আলোচ্য হাদীসের শেষাংশ

উক্ত হাদীসে আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বক্র জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিবেন না। বক্র জাতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আরবের মূর্তিপূজারী সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে মূর্তিপূজার শিরক তো ছিলোই, পাশাপাশি এই ভূতও মাথায় চড়ে বসেছিলো যে, আমরাই হলাম শ্রেষ্ঠ জাতি। এ ছাড়াও নিজেদের ব্যাপারে অনেক কিছু মনে করতো। তাদেরকে সংশোধন করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। তাঁর মাধ্যমে মাত্র তেইশ বছর সময়ে পুরো জাযীরাতুল আরবে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু-র হুকুমত কায়েম করেন।

হাদীসে এর পরে বলা হয়েছে,

فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا

অর্থাৎ, তাওহীদের কালেমার দ্বারা তাদের অন্ধ চোখগুলো ও বধির কানগুলো খুলে দিবেন এবং পর্দাবৃত অন্তর থেকে পর্দার আবরণ সরিয়ে দিবেন। এ বাক্যগুলো সব তাওরাতের, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণে এসেছে। আল্লাহ আমাদেরকেও এ সমস্ত গুণ ধারণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

গরীবদেরকে তুচ্ছ মনে করবেন না*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ[১]

আল্লামা নববী রহ. আরেকটি অধ্যায় লিখেছেন,

بَابُ فَضْلِ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْفُقَرَاءِ وَ الْخَامِلِيْنَ

অর্থাৎ, সহায়-সম্পদ, পদবী ও শারীরিক দিক থেকে দুর্বল মুসলমানদের ফযীলত[২] সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. তাঁর কিতাব রিয়াযুস সালেহীনে একটি অধ্যায় স্থাপন করেছেন।

কিছু লোক আছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার দিক থেকে কোনো মর্যাদা দান করেছেন, কাউকে সম্পদ দান করেছেন, কাউকে পদ-পদবি দান করেছেন, আবার কাউকে খ্যাতি ও সম্মান দান করেছেন। এরা সাধারণত

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ২, পৃঃ ১৯০-২০১, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ইং, রোজ শুক্রবার, বাদ আসর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী। এ আলোচনাটি আল্লামা নববী রহ.-এর কিতাব রিয়াযুস সালেহীনের একটি অংশের দরস।

১. কাহাফ ঃ ২৮

২. রিয়াযুস সালেহীন, পৃঃ ১১৫

দুর্বল শ্রেণির লোকদেরকে তুচ্ছ মনে করে এবং বিভিন্ন সময় তাদের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের আচরণ করে। মূলত এদেরকে সতর্ক করার জন্যেই ইমাম নববী রহ. উক্ত অধ্যায় রচনা করেছেন যে, এমন দুর্বল লোকদেরকে কখনো তুচ্ছ মনে করবে না। কারণ, হতে পারে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। এ জন্যে তিনি এ অধ্যায়ের শুরুতে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

উক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন, আপনি আপনার নিজেকে ধৈর্য সহকারে তাদের সংস্পর্শে রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে তাঁর ইবাদত করে। তাদেরকে উপেক্ষা করে কখনো যেন আপনার দৃষ্টি দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে ধাবিত না হয়।[৩] অর্থাৎ, তারা গরীব, মিসকীন, সাধারণ মানুষ তাদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন কী, এই ভেবে আপনি যেন সম্পদশালীদের দিকে ধাবিত না হন।

কে আল্লাহর প্রিয়তম?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহর যে সুসম্পর্ক রয়েছে, তা কার জানা নেই? মুসলমান বলতেই জানে, আল্লাহর নিকট সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে প্রিয়তম ব্যক্তি হলেন হযরত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিশ্বজগতের আর কিছুই তাঁর চেয়ে অধিক প্রিয় হতে পারে না। তাই তো পুরো কুরআনে কারীম তাঁর সানা-সিফাত বর্ণনা ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

'হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।'[৪]

৩. কাহাফ : ২৮

৪. আহযাব : ৪৫-৪৬

আল্লাহ যখন তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করেন, তখন এভাবে যেন শব্দের বারী বর্ষণ করেন।

স্নেহপূর্ণ শাসন

কিন্তু পুরো কুরআনের দুই-তিন জায়গায় আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্নেহপূর্ণ শাসনের সুরে বলেছেন, আপনার অমুক কাজটি আমার পছন্দ হয়নি। তন্মধ্যে একটি হলো 'সূরা আবাসা'য়। ঘটনা ছিলো- একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক আসলো। তিনি ভাবলেন, এরা যেহেতু সমাজের প্রভাবশালী এবং অনুসৃত লোক, সুতরাং এদের সংশোধন হয়ে গেলে হয়তো সমাজের অন্য লোকের হেদায়েতের পথ খুলে যাবে। এ জন্যে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার বিষয়টি অধিক গুরত্বপূর্ণ বিবেচনা করলেন এবং তাদের প্রতি একটু বেশি মনোনিবেশ করলেন। এ অবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি. আসলেন। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মসজিদে নববীর মুয়াযযিন নিযুক্ত করে ছিলেন। তিনি এসে তাঁকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, তিনি তো নিজের মানুষ। সবসময়ই তার সঙ্গে সাক্ষাত হয়, কথা হয়, এখন যদি তার সঙ্গে কথা না বলি, কোনো অসুবিধা নেই। পরেও তার মাসআলা বলে দেওয়া যাবে। এই ভেবে তাকে বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো। এরপর তিনি মুশরিক নেতাদের সঙ্গে এ উদ্দেশ্যে দাওয়াতের কথায় লিপ্ত হলেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের সম্প্রদায়ের অন্য সবলোকের ঈমানের রাস্তা খুলে যাবে। ঘটনা ছিলো এতোটুকুই। কিন্তু এতোটুকুর উপরই আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আয়াত নাযিল করলেন,

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۙ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۗ

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাম পুরুষরূপে সম্বোধন করে বললেন, 'সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ

ফিরিয়ে নিলো। কারণ, তার কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি এলো।'[৫] (যেন তা এ কাজটি আল্লাহর পছন্দ হয়নি।)

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ۝ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۝

'তুমি কি জানো? হয়তো সেই অন্ধ লোকটি পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ তার উপকারে আসতো।'

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۝ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۝

পক্ষান্তরে যে উপেক্ষা করে (এবং দ্বীনের অন্বেষা নিয়ে আপনার নিকট আসেনি, বরং সত্য দ্বীনের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করে) তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো!

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۝

'অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই।' (যখন তার নিজের মধ্যে সত্যের অন্বেষা নেই, বরং সম্পূর্ণ বেপরোয়া। তো এ বিষয়ে তোমার উপর কোনো দায় বর্তাবে না।)

وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۝ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۝

'অপর দিকে যে লোকটি তোমার কাছে ছুটে আসলো এবং সে অন্তরে আল্লাহর ভয় লালন করে, তাকে তুমি উপেক্ষা করলে।'[৬]

অন্বেষণকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ

আল্লাহ এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটু স্নেহপূর্ণ শাসন করেছেন। কারণ এ কথা সুস্পষ্ট যে, তার উদ্দেশ্য কখনো এমন ছিলো না যে, এই লোক দুর্বল আর তারা সবল এ জন্যে একে উপেক্ষা করি এবং তাদেরকে গুরুত্ব দেই। বরং তিনি তো এই হিকমত ও কৌশলের কথা চিন্তা করেছেন যে, এ তো নিজের মানুষ, তার সঙ্গে তো পরেও কথা বলা যাবে আর তারা এখন এসেছে, কিন্তু দ্বিতীয় বার পুনরায় আসবে কি না, কে জানে! সুতরাং এ সুযোগে তাদেরকে সত্যের বাণী শুনিয়ে দেই। কিন্তু আল্লাহ পাক এতোটুকুও পছন্দ করেননি। বরং বলে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের অন্বেষা

---

৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড ৪, পৃঃ ৬০৫-৬০৬

৬. 'আবাসা ঃ ১-১০

ও পিপাসা নিয়ে এসেছে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক গুরুত্ব পাওয়ার অধিকার রাখে, যে দ্বীনের তলব ও অন্বেষা ছাড়া বসে আছে। তার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যে অন্বেষা নিয়ে এসেছে তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

উক্ত আয়াতসমূহে যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো, তাঁর মাধ্যমে তাঁর সকল উম্মতকে এ বিষয়ের প্রতি তাগিদ করা যে, বাহ্যত কোনো মানুষকে সাধারণ দেখলে প্রকৃতপক্ষেও তাকে সাধারণ মনে করো না। কারণ, তোমার তো জানা নেই যে, আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা কতো? সুতরাং তার সঙ্গে সম্মানের আচরণ করো।

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের আলোচনা

আল্লামা নববী রহ. এ অধ্যায়ে প্রথমে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা হলো,

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো, জান্নাতী কে? এরপর বলেন, জান্নাতী ঐ ব্যক্তি, যে দুর্বল এবং মানুষও তাকে দুর্বল মনে করে। অর্থাৎ, শারীরিকভাবে, আর্থিকভাবে কিংবা মর্যাদাগতভাবে দুর্বল। দুনিয়ার মানুষও তাকে দুর্বল এবং নিচু মর্যাদার মনে করে। অথচ এই দুর্বল ব্যক্তিটির মর্যাদা আল্লাহর কাছে এতো বেশি যে, সে যদি আল্লাহর নামে কোনো কসম করে, তাহলে আল্লাহ তার কসম পূর্ণ করে দেন। অর্থাৎ, সে যদি কসম করে বলে যে, অমুক কাজটি এভাবে হতে হবে, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও সে কাজটি সেভাবে করে দেন। কারণ, সে আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা। তাই মহব্বত করে আল্লাহ তাকে এভাবেই মর্যাদা দেন।[৭]

---

৭. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৩৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০৯২, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২০১৯

আল্লাহওয়ালাদের শান

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার দুই মহিলার সাথে ঝগড়া হলো তারে এক মহিলা অপর মহিলার দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। ইসলামী আইনে দাঁতের বদলা দাঁত দিতে হয়। যখন অপরাধী মহিলাকে এই শাস্তির কথা শোনানো হলো, তখন তার অভিভাবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কসম করে বলছি, তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার উপর আপত্তি করা আদৌ তার উদ্দেশ্য ছিলো না (নাউযুবিল্লাহ), হঠকারিতাও তার উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে এ কথা বলেছিলেন যে, ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিবেন, যাতে তার দাঁত ভাঙ্গা ছাড়াই তার প্রতিপক্ষ মেনে নেয়। এ জন্যেই এ কথা বলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছুই বলেননি।

যেখানে ইসলাম দাঁতের পরিবর্তে দাঁত, চোখের পরিবর্তে চোখের 'কিসাস' নেওয়ার বিধান দিয়েছে, সেখানে এ বিধানও দিয়েছে যে, যার দাঁত ভেঙ্গে গেছে, সে যদি ক্ষমা করে দেয়, তাহলে আর 'কিসাস' বহাল থাকে না। এ ঘটনায় পরে আল্লাহ যা ঘটালেন তা হলো, যে মহিলার দাঁত ভাঙ্গা হয়েছে, তার অন্তরকে ক্ষমা করার প্রতি বিনম্র করে দিলেন ফলে সে বললো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমার দাঁতের পরিবর্তে আমি তার দাঁত ভাঙ্গতে চাই না।

এ ঘটনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু মানুষ আল্লাহর খুব প্রিয়, বাহ্যত তাদের চুল এলোমেলো, দুর্বল, কারো দুয়ারে গেলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা এতো বেশি যে, আল্লাহর নামে কসম করে কোনো কথা বললে তিনি তা পূর্ণ করে দেন। এ লোকটিও তেমনি একজন লোক। তাই তিনি যখন কসম করে বললেন, তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না, তখন তার কসম এভাবে পূর্ণ করে দিলেন যে, যার দাঁত ভাঙ্গা হয়েছে, তিনি নিজ থেকেই ক্ষমা করে দিলেন।[৮]

আলোচ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, এমন কিছু লোক আছে, যারা বাহ্যত দুর্বল এবং মানুষও

---

৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫০৪, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৬৭৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯৭৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৬৩৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১১৮৫৪

তাদেরকে দুর্বল মনে করে। কিন্তু তাদের তাকওয়া ও খোদাভীতির কারণে তারা আল্লাহর কাছে এতো প্রিয় এবং এতো মর্যদাবান যে, তারা কসম করে কোনো কথা বললে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। এরা হলো জান্নাতী লোক।

কঠিন স্বভাব মারাত্মক ক্ষতিকর

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো, জাহান্নামী কে? জাহান্নামী হলো,

كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

'প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে কঠিন স্বভাবের।'

عُتُلٌّ অর্থ হলো, কঠিন স্বভাব ও অমসৃণ মানুষ। যে কথা বললেই আঘাত করে। নরম কথা বলে না। গরম হয়ে এবং রাগ দেখিয়ে কথা বলে। অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কথা বলে।

দ্বিতীয় শব্দটি হলো جَوَّاظٌ। অর্থ হলো নাক চড়া লোক। যার কপালে সর্বদা বিরক্তির ভাব থাকে। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে চায় না। দুর্বল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে কথা বলতে অপমান বোধ করে এবং সবসময় দাম্ভিকতার সঙ্গে চলে।

তৃতীয় শব্দ হলো مُسْتَكْبِرٌ। অর্থ অহংকারী। যে নিজেকে বড়ো মনে করে এবং অন্যকে ছোট জ্ঞান করে। এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এরা হলো জাহান্নামী।

তাদের মর্যাদা অনেক

এ হাদীসে বলা হয়েছে, সমাজের সাধারণ, দুর্বল ও গরীব শ্রেণির মানুষদেরকে তুচ্ছ মনে করো না। কারণ, আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা অনেক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন, তাদের মধ্যে সব ধরনের লোক ছিলো। তাদের অধিকাংশ মানুষই সম্পদের দিক থেকে বড়ো ছিলেন না। গরীব-ধনী সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এক সঙ্গে বসতেন। যেখানে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত উসমান গণীর মতো ধনী সাহাবী

বসতেন, সেখানে হযরত বেলাল হাবশী, হযরত সুহাইব রুমী ও হযরত সালমান ফারসীর মতো এমন সকল সাহাবীও বসতেন, যারা দিনের পর দিন না খেয়েও জীবন যাপন করেছেন।

ক্ষুৎ-পিপাসাগ্রস্ত এ মহান ব্যক্তিগণ

একদিন মক্কার কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমরা আপনার কথা শোনার জন্যে আপনার মজলিসে আসতে প্রস্তুত। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, সবসময় আপনার কাছে কিছু অনাহারী ফকির-ফুকারা বসে থাকে, তাদের সঙ্গে গিয়ে বসা তো আমাদের মানায় না। এতে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। আপনি তাদেরকে পৃথক করে দিয়ে আমাদের বিশেষ মজলিসের ব্যবস্থা করুন, তাহলে আমরা আপনার কথা শুনতে আসবো। তাদের এ প্রস্তাবে বাহ্যত কোনো সমস্যা ছিলো না। যদি তাদের জন্যে ভিন্ন মজলিসের ব্যবস্থা করা হতো, তাহলে তারা দ্বীনের কথা শোনার সুযোগ পেতো এবং তাতে হয়তো তাদের সংশোধন হয়ে যেতো। আমরা হলে তাদের কথা মেনেও নিতাম। কিন্তু বিষয়টি ছিলো শরীয়তের মূলনীতি সংক্রান্ত। তাই তৎক্ষণাৎ কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

'তাদেরকে আপনি দূরে সরিয়ে দিবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁকে ডাকে।'[৯]

এখানে আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, যদি সত্যের অন্বেষা নিয়ে আসতে চাও তবে তাদের সঙ্গেই বসতে হবে। আর যদি তাদের সঙ্গে বসতে তোমাদের সম্মানে বাধে, তবে মনে রেখো, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। কোনো অবস্থাতেই তার প্রিয় বান্দাদের বাদ দিয়ে তোমাদের জন্যে বিশেষ মজলিসের ব্যবস্থা করা যাবে না।[১০]

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অনুসারীগণ গরীবই হয়ে থাকেন

অন্যান্য নবীগণের সঙ্গে একই ঘটনা ঘটেছে। ঐ সময়ের কাফেররাও তাদেরকে বলেছিলো,

---

৯. আনআম ঃ ৫২

১০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪৩৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪১১৮

مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ

'আমরা তো দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল তারাই, যারা আমাদের মধ্যে বাহ্যত দৃষ্টিতেই অধম।'[১১]

উদ্দেশ্য হলো, আমরা কীভাবে তোমার সঙ্গে আসতে পারি? কারণ, আমরা তো হলাম অনেক বড়ো বুদ্ধিমান, অনেক মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ বলছেন, যে সব লোককে তোমরা অধম বলছো, দুর্বল ও ফকির-মিসকীন বলছো, আল্লাহর নিকট তারা অনেক মর্যাদার অধিকারী। তাই তাদেরকে তুচ্ছ ভেবো না। এটাই হলো ইসলামের নীতির কথা। এখানে এটা সম্ভব নয় যে, শুধু নেতৃত্ব ও প্রাচুর্যের কারণে তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটা এমন এক নীতি, যাতে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল কোনো মূল্যেই আপোস করেত সম্মত নন। কারণ, মুমিন বান্দাগণ তোমাদের দৃষ্টিমতে দুর্বল হলেও আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অকৃত্রিম বন্ধু হযরত যাহের রাযি.

জনৈক বেদুঈন গ্রাম থেকে কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন। তাঁর নাম ছিলো যাহের রাযি.। তিনি দেখতে শ্রীহীন এক গ্রাম্য মানুষ ছিলেন এবং সম্পদেও ছিলেন অনেক দুর্বল। মানুষের দৃষ্টিতেও তার বিশেষ কোনো মর্যাদা ছিলো না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন যাহের রাযি. বাজারে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা খুব স্বাভাবিক যে, এমন একজন সাধারণ মানুষ যখন বাজারে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন কে তার প্রতি খেয়াল করে! গায়ের পোশাকও পুরাতন। এ অবস্থায় কেউই তার দিকে খেয়াল করার কথা নয়, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাজার দিয়ে যাচ্ছিছিলেন, তখন তিনি অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে পেছনের দিক থেকে হযরত যাহির রাযি.-এর কাছে এলেন। একবন্ধু আরেক বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে হাসি-তামাশা করে ঠিক সেভাবে

---

১১. হুদ : ২৭

পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে তার চোখ দুটো ধরে ফেললেন। আর যাহির রাযি. নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা শুরু করলেন। এর পর ফেরিওয়ালা যেভাবে তার পণ্য বিক্রির জন্যে ক্রেতা আহবান করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবে বলতে লাগলেন-

مَنْ يَّشْتَرِيْ هٰذَا الْعَبْدَ مِنِّيْ

'গোলামটি কে খরিদ করবে?'

এ পর্যন্ত যাহের রাযি. বুঝতে পারেননি যে, কে তাকে ধরেছেন। এ জন্যে এতোক্ষণ নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আওয়াজ শোনামাত্র যখন চিনে ফেললেন, তখন ছাড়াবার পরিবর্তে নিজের শরীর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন। আর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাকে গোলাম হিসেবে বিক্রি করতে চান, তবে তো খুব কম মূল্য পাবেন। কারণ, আমি তো অতি সাধারণ মানুষ। যারা আমাকে কিনবে, তারা বেশি দাম দিবে না। তাঁর এ কথার উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো চমৎকার বলেছেন। সুবাহানাল্লাহ! তিনি বলেছেন,

لٰكِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ

হে যাহের! মানুষ তোমাকে মূল্য দিক আর না দিক, আল্লাহর নিকট কিন্তু তুমি কম মূল্যের নও। আল্লাহর নিকট তোমার মূল্য অনেক। দেখুন! বাজারে নিশ্চয়ই অনেক বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী ছিলো। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির সমাগম ছিলো। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বাদ দিয়ে হযরত যাহের রাযি.-কে খুশি করার জন্যে এবং তাঁকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে তাঁর কাছেই চলে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে এমন বন্ধুসুলভ আচরণ করলেন, যা একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু অপর বন্ধুর সঙ্গে করে থাকে।[১২]

এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন দু'আ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

---

১২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২১৮৭, শামায়েলে তিরমিযী, পৃঃ ১৬

'হে আল্লাহ আমাকে মিসকীন বানিয়ে জীবিত রাখুন, মিসকীন হিসাবে মৃত্যু দিন এবং মিসকীনদের সাথে আমার হাশর করুন।'[১৩]

চাকরকেও সম্মান করুন

আজকাল মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এখন দুনিয়ায় যারা প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এবং বড়ো পদ ও টাকা-পয়সার অধিকারী, তাদের সম্মানও আছে এবং তাদের প্রতি মনোনিবেশ আছে। আর যারা দুনিয়ার হিসাবে দুর্বল, অর্থ-সম্পদ কম, অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও মনোনিবেশ কিছুই নেই। বরং তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। মনে রাখবেন! দ্বীনের সঙ্গে এমন চিন্তা-চেতনার কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক সময় আমরা মুখে যদিও বলি যে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ

'যে যতো বেশি মুত্তাকী, সে আল্লাহর কাছে ততো বেশি সম্মানী।'[১৪]

কিন্তু বাস্তবে তাদের সঙ্গে সেরকম আচরণ আমরা করি না। আপনার ঘরে যে চাকর কাজ করে, আপনার কাছে যে ফকীর আসে, তার সঙ্গে কীভাবে কথা বলেন? আপনার কথায় তাদের দিল ঠান্ডা হয়, না ব্যথিত হয়? এ হাদীসের উপর বাস্তবেই কি আমল করেন? মনে রাখবেন! তাদের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের আচরণ করা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

১৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২৭৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪১১৬

১৪. হুজরাত : ১৩

মিসকীনদের ফযীলত*

عَنْ أَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا[১]

জান্নাত ও জাহান্নামের বিতর্ক

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে পরস্পরে এ বিষয়ে বির্তক হয় যে, কে উত্তম। জাহান্নাম বলে, আমার মর্যাদা বেশি। কারণ, আমার মধ্যে এসে বড়ো বড়ো অহংকারী ও দাম্ভিক বসতি গড়বে। অর্থাৎ, যতো লোক অহংকারী, বড়ো বড়ো পদের অধিকারী, অনেক সম্পদশালী, নিজেকে অনেক বড়ো বলে এবং বড়ো মনে করে তারা সবাই আমার কাছে আসবে, সুতরাং আমি উত্তম। অপরদিকে জান্নাত বলে, আমার মধ্যে অসহায়, গরীব শ্রেণির লোক আসবে, অতএব আমি উত্তম। এরপর আল্লাহ উভয়ের মাঝে ফায়সালা করে জান্নাতকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি হলে জান্নাত, আমার রহমত। তোমার মাধ্যমে আমার যাকে ইচ্ছা তাকে রহমত দান করবো। জাহান্নামকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি হলে জাহান্নাম, আমার আযাব। তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা তাকে আমি শাস্তি দেবো। তোমাদের উভয়ের সঙ্গে আমি ওয়াদা করছি। তোমাদেরকে পূর্ণ করে

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ২, পৃঃ ২০২-২২৪, বাদ আসর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী। উক্ত বয়ানটি আল্লামা নববী রহ.-এর কিতাব রিয়াযুস সালেহীনের একটি অংশের দরস।

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০৮২, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৮৪, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭১৯৩

দেবো। জান্নাতকে এমন লোকদের দ্বারা পূর্ণ করে দেবো, যাদের উপ্ আমার রহমত নাযিল হবে। আর জাহান্নামকে এমন লোকদের দ্বারা পূর্ণ কর্ দেবো, যাদের উপর আমার আযাব নাযিল হবে।

জান্নাত-জাহান্নাম কীভাবে কথা বলবে?

উক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত জাহান্নামে মধ্যে বির্তকের কথা বলেছেন। সম্ভাবনা আছে যে, প্রকৃত অর্থেই তাদে মাঝে কথোপকথন ও বির্তক হয়েছে। কারণ জান্নাত জাহান্নাম আল্লাহ মাখলুক। আর ইচ্ছা করলেই আল্লাহ তাদেরকে কথোপকথনের শক্তি এব বিতর্কের যোগ্যতা দিতে পারেন। আল্লাহর কুদরতের কাছে এটা খুব স্বাভাবিক বিষয়। এসব বিষয়ে আশ্চর্য হওয়া যে, এরা কীভাবে কথা বল এদের তো কোনো জিব নেই। জান্নাত তো একটা এলাকার নাম, বি বাগানের নাম। জাহান্নামও একটা জায়গার নাম, আগুনের নাম। এরা ক করে কথা বলবে? যারা এই ভেবে আশ্চর্য হন, তাদেরকে বলবো, একটু চি করে দেখুন তো, মানুষ কীভাবে কথা বলে? তার মধ্যে কীভাবে কথা বল শক্তি এলো? তার মধ্যে তো এ শক্তি তখনই এসেছে, যখন আল্লাহ তা শক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে শক্তি দান না করলে তো সে বলতে পার না। তিনি দিয়েছেন বলেই তো সে কথা বলতে পারে। সুতরাং আল্লাহ যদি শক্তি পাথরকে দান করেন, তাহলে পাথরও নিশ্চয়ই কথা বলতে পারবে কোনো গাছকে দান করলে সে গাছও কথা বলতে পারবে। আল্লাহ কো জমিনকে বাকশক্তি দান করলে সে জমিনও কথা বলতে পারবে। এতে আশ্চ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

কিয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রতঙ্গ কীভাবে কথা বলবে?

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. একবা কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় আধুনিক শিক্ষার অতি ভক্ত জনৈক ব্যক্তি সঙ্গে সাক্ষাত। তিনি কুরআনের একটি আয়াতের উপর এই সংশয় পে করলেন যে, হযরত কুরআনে এসেছে, কিয়ামতের দিন মানুষের অঙ্গপ্রত কথা বলবে। হাত সাক্ষ্য দিবে, আমার মাধ্যমে সে এই গোনাহ করেছে। পা সাক্ষ্য দিবে, আমার দ্বারা সে এই গোনাহ করেছে। তো হযরত হাত-পা কথ বলবে এটা তো একটা অদ্ভুত কথা হলো। এটা কী করে সম্ভব? হযরত

বললেন, এটা আল্লাহর কুদরত, তিনি যাকে বাকশক্তি দান করবেন, সে কথা বলবে। সে বললো, হযরত এমন ঘটনা কখনো ঘটেছে কি? হযরত বললেন, তুমি কি দলিল জানতে চাচ্ছো, না কোনো দৃষ্টান্ত দেখতে চাচ্ছো? দলিল তো এতোটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আর সম্ভব হওয়ার জন্যে সব কিছুর দৃষ্টান্ত থাকতে হয় না। তখন ঐ লোক বললো, হযরত মনের প্রশান্তির জন্যে একটা দৃষ্টান্ত দেখান না। হযরত বললেন, আচ্ছা বলো তো, জিব কীভাবে কথা বলে? সে যেহেতু বলেছিলো জিব ছাড়া হাত কীভাবে কথা বলবে, এজন্যে হযরত বললেন, জিবের তো কোনো জিব নেই। তাহলে জিব কীভাবে কথা বলে? এটাও তো একটা গোশতের টুকরা। এখানে বাকশক্তি এলো কোত্থেকে? এটা তো আল্লাহই দান করেছেন। সুতরাং যে আল্লাহ জিবকে বাকশক্তি দান করেছেন, তিনি তো হাতকেও বাকশক্তি দান করতে পারেন। এতে আশ্চর্যের কী আছে?

যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, জান্নাত জাহান্নাম পরস্পরে বির্তক করেছে। এটা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। আল্লাহ তাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, ফলে তারা কথা বলেছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আবার এও হতে পারে যে, জান্নাত জাহান্নামের অবস্থা বোঝাবার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা একটা উপমা দিয়েছেন।

অহংকারী জাহান্নামে যাবে, আর দুর্বল-গরীব যাবে জান্নাতে

খোলাসা কথা হলো, জাহান্নাম অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদের দিয়ে পূর্ণ করা হবে, যারা নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করে এবং অন্যের সঙ্গে অহংকারের আচরণ করে এবং অন্যকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে।

পক্ষান্তরে জান্নাত পূর্ণ করা হবে দুর্বল ও গরীব প্রকৃতির লোক দ্বারা, যারা বাহ্যত দেখতে দুর্বল মনে হয়। যারা বিনয়ী এবং নিজেকে ছোট মনে করে। বিনয়ী ও বিনম্র আচরণ করে।

অহংকার আল্লাহর পছন্দ নয়

জাহান্নামকে আল্লাহ তা'আলা অহংকারীদের দিয়ে পূর্ণ করবেন। কারণ, অহংকারী হলো এমন ব্যক্তি, যে অন্যের উপর নিজের বড়োত্ব প্রকাশ করে। নিজেকে বড়ো মনে করে এবং অন্যকে ছোট মনে করে। নিজেকে মহান

ভাবে, আর অন্যকে ভাবে তুচ্ছ। অহংকার আল্লাহর নিকট মুহূর্তের জন্যেও পছন্দ নয়। এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহর রাব্বুল আলামীন বলেন,

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أُلْقِيهِ فِي النَّارِ

বস্তুত অহংকার ও বড়োত্ব হলো আমার চাদর। আমার বৈশিষ্ট্য। আল্লাহই হলেন প্রকৃত বড়ো। সুতরাং আমার চাদর নিয়ে যে ঝগড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।[২] অহংকার হলো, জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার আমল। আল্লাহ মেহেরবানী করে এই নাফরমানী থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। এটা এমন এক গোনাহ, যাকে আত্মিক ব্যাধিকূলের জননী বলা হয়। অর্থাৎ সকল গোনাহের মূল। এই এক গোনাহের কারণে কতো গোনাহ যে জন্ম নেয়, তার ইয়ত্তা নেই। একবার যদি অন্তরে অহংকার এবং নিজের বড়োত্বের কথা চলে আসে, তাহলে তা বিভিন্ন প্রকারের গোনাহে লিপ্ত করে দেয়।

অহংকারীর দৃষ্টান্ত

আরবী ভাষায় বড়ো সুন্দর প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি দৃষ্টান্ত আছে। যার অনুবাদ এরকম- অহংকারীর দৃষ্টান্ত হলো ঐ লোকের মতো, যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। উপরে যাওয়ার কারণে সে যেমন অন্যদেরকে ছোট মনে করে এবং নিচে থেকে অন্য সকল মানুষ তাকে মনে করে ছোট, তদ্রূপ অহংকারী ব্যক্তি যখন অন্যের দিকে দৃষ্টি দেয়, তখন তাদেরকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করে। অথচ শুধু মুমিন নয় একজন কাফেরের দিকেও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা কবীরা গোনাহ। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন। এভাবে অহংকারী লোক যতো অন্যদেরকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, তার আমলনামায় ততো কবীরা গোনাহের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

এমন অহংকারী যখন অন্যের সঙ্গে কথা বলে, তখন এমন রুক্ষভাবে কথা বলে যে, অন্যের অন্তরে আঘাত লাগে। আর কোনো মুসলমানের মনে কষ্ট দেওয়াও গোনাহ।

কাফেরকেও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখো না

আমি বললাম, কোনো কাফেরকেও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখো না এবং এটাও গোনাহ। এর কারণ হলো, হতে পারে আল্লাহ কখনো তাকে ঈমানের

---

২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৬৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭০৭৮

তাওফীক দান করবেন এবং সে আল্লাহর কাছে তোমার চেয়ে অনেক প্রিয় হয়ে যাবে। তাই কোনো কাফেরকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। অবশ্য কুফরকে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য মনে করা উচিত। কিন্তু গোনাহগার ব্যক্তিসত্তার প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত নয়। তবে এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমার অন্তর কখন গোনাহগার ব্যক্তিকে ঘৃণা করছে, আর কখন ব্যক্তিকে নয়, বরং তার পাপ ও অপরাধকে ঘৃণা করছে, এ বিষয়টি অনেক সময় মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় না। এটা বোঝার জন্যে বুযুর্গদের সাহচর্যের প্রয়োজন হয়।

হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর বিনয়

আমার আপনার অবস্থা তো কোনো হিসাবে আসারই যোগ্য নয়। দেখুন! হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, আমি নিজেকে বর্তমান বিচারে সকল মুসলমান থেকে এবং শেষ অবস্থা ও সম্ভাবনার বিচারে কাফের থেকেও ছোট মনে করি। অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলমান থেকে বর্তমানে আমি নিজেকে ছোট মনে করি। আর কাফের থেকেও এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে নিজেকে ছোট মনে করি যে, হতে পারে সে কখনো মুসলমান হয়ে যাবে এবং আমলে আমার চেয়ে অনেক অগ্রসর হয়ে যাবে।

অহংকার ও ঈমান একত্র হতে পারে না

অহংকার ও ঈমান একত্র হতে পারে না। আল্লাহ হেফাজত করুন। মানুষের মধ্যে যখন অহংকার চলে আসে, তখন তার ঈমান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। এই অহংকারই ইবলিসকে ধ্বংস করেছে। তাকে বলা হয়েছিলো- আদমকে সেজদা করো। কিন্তু তার মাথায় অহংকার চেপে বসলো যে, আমি তো আগুনের তৈরী, আর আদম হলো মাটির তৈরী। নিজেকে বড়ো মনে করলো এবং অপরকে তুচ্ছ ও ছোট মনে করলো। এভাবে সে চির দিনের জন্যে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়ে গেলো।

অহংকার একটি গোপন ব্যাধি

আমাদের প্রতি অত্যাধিক দয়াপরবশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্যে উক্ত হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, দেখো! অহংকার যেন কাছে ভিড়তে না পারে। এটা এমন এক ব্যাধি, যা

অনেক আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেও টের পায় না যে, আমি এ রোগে আক্রান্ত। বরং সে মনে করে, আমার তো সবই ঠিক আছে। অথচ তার মধ্যে অহংকার বিদ্যমান। আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে যা বুঝতে পারা অনেক দুরূহ ব্যাপার। এ জন্যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞজনেরা কোনো আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

তাসাওউফের উদ্দেশ্য

পীর-মুরীদির যে প্রথা চালু আছে, সে সম্পর্কে অনেকে মনে করে যে, পীর ছাহেবের হাতে হাত দিলেই বরকত হয়ে গেলো, বা পীর কিছু ওযীফা বলে দিলেন আর মুরিদ সেগুলো আদায় করে নিলো, ব্যস এখানেই শেষ। খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন যে, এটা আদৌ পীর-মুরীদির আসল উদ্দেশ্য নয়। কোনো পীর বা শাইখের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার আসল উদ্দেশ্যই হলো, অন্তরে যে সব আধ্যাত্মিক ব্যাধি আছে, যেগুলোর শীর্ষ তালিকায় হলো অহংকার, সে সব ব্যাধির চিকিৎসা করানো। যেমনিভাবে রোগীর অনেক সময় জানা থাকে না যে, তার রোগ কী? ডাক্তার বলে দেন, তোমার এই রোগ আছে এবং এই রোগের চিকিৎসা করতে হবে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্যেও শাইখের কাছে যেতে হয়। তিনি রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা দেন। সুতরাং শাইখের শরণাপন্ন হয়ে তার হাতে হাত রাখার উদ্দেশ্য হলো, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক চিকিৎসা

একটা সমস্যা হলো, আজকাল তাবিজ-তুমারের নাম হয়ে গিয়েছে রূহানী এলাজ বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। খুব ভালো করে বুঝে নিন- এই তাবিজ-তুমার বা ঝাড়-ফুঁকের নাম আধ্যাত্মিক চিকিৎসা নয়। প্রকৃত আধ্যাত্মিক চিকিৎসা হলো, অন্তরে যে সব রোগ আছে- যেমন অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, দুশমনি ইত্যাদি- এগুলোর চিকিৎসার জন্যে শাইখের শরণাপন্ন হওয়ার পর শাইখ দেখবেন যে, তার অন্তরে আসলে কী রোগ আছে? রোগ নির্ণয়ের পর তার জন্যে সহজ চিকিৎসা কী হতে পারে, সে চিকিৎসা তিনি মুরীদকে দিবেন, আর তার দেওয়া চিকিৎসা অনুযায়ী মুরীদ আমল করবে। এটাই হলো প্রকৃত পীর-মুরীদি।

হযরত থানভী রহ.-এর চিকিৎসা-পদ্ধতি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর ওখানে এ জাতীয় রোগীরা আসতেন এবং তিনি তাদের চিকিৎসা দিতেন। এ বিষয়ের উপর তার ওখানে বেশি গুরুত্বারোপ করা হতো। কোনো ঔষধ সেবন, কিংবা কোনো ওযীফা পাঠ করিয়ে এর চিকিৎসা হতো না, বরং তা হতো আমলের মাধ্যমে। অহংকারে আক্রান্ত এক লোক এসেছে তো তার চিকিৎসা ঠিক করলেন যে, মসজিদে যারা নামায পড়তে আসে, তুমি তাদের জুতা সোজা করবে। কোনো ওযীফা, কোনো তাসবীহ বা যিকির কিছুই দিলেন না। তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে, তার মধ্যে অহংকার আছে এবং এটাই তার উপযুক্ত চিকিৎসা।

অহংকারের গন্তব্য জাহান্নাম

আল্লাহ আমাদেরকে এ ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন। এ রোগ মানুষের অন্তরে এমনভাবে প্রবেশ করে যে, অনেক সময় সে নিজেও তা অনুভব করতে পারে না। সে মনে করে, আমার তো সবই ঠিক আছে, কিন্তু বস্তুত সে অহংকারের রোগে আক্রান্ত। আর এ পথে সে সোজা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কারণ, প্রকৃত অহংকারের সঙ্গে ঈমান একত্র হতে পারে না। এ জন্যে এ রোগের চিকিৎসা খুবই জরুরী। আলোচ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়েই আমাদেরকে সর্তক করছেন।

জান্নাতে দুর্বল ও গরীব লোকের আধিক্য

আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয়াংশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত দুর্বল ও গরীব শ্রেণির লোক দ্বারা পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ, যাদেরকে তোমরা দুনিয়াতে গুরুত্বহীন মনে করো, গরীব-মিসকীন, ফকির-ফুকারা, খুব সাধারণ মানুষ, সাধারণ কাপড় পরিধানকারী, যাদেরকে মানুষ কোনো গুরুত্ব দেয় না এ শ্রেণির অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর নৈকট্যভাজন হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহর আযমত ও মহব্বত থাকে। তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। এ জন্যে অধিকাংশ জান্নাতীই এই শ্রেণির লোক হবে।

কুরআনে কারীমে দেখুন! যতো নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন তাদের অধিকাংশ অনুসারী এ রকম গরীব শ্রেণির সাধারণ মানুষ ছিলেন। এ জন্যে

মুশরিকরা বলতো- আমরা এ সব গরীব-মিসকীনদের সঙ্গে এক মজলিসে কীভাবে বসবো? এরা কেউ জেলে, কেউ জোলা, আবার কেউ কাঠমিস্ত্রি, আরো এ জাতীয় নগণ্য পেশাজীবী। আমরা হলাম বড়ো বড়ো নেতা। আমরা তাদের সঙ্গে আপনার কাছে কী করে বসতে পারি? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হলো, দুনিয়ার মানুষ যাই ভাবুক না কেন, আল্লাহ এই দুর্বল শ্রেণির লোকদেরকে প্রকৃত মর্যাদা ও ভালোবাসা দান করেছেন। তাই কখনো এই শ্রেণির লোকদেরকে ছোট বা তুচ্ছ ভাববেন না। ভুলেও যেন তাদের প্রতি কোনো তাচ্ছিল্যের ভাব অন্তরে জায়গা না পায় এবং আচরণে-উচ্চারণে তাদের প্রতি কোনো অবমূল্যায়ন না হয়।

দুর্বল ও মিসকীন কারা

উক্ত হাদীসের বিশেষভাবে লক্ষণীয় আরেকটি বিষয় হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক ضُعَفَاءُ, দুই مَسَاكِيْن। ضُعَفَاءُ বা দুর্বল শ্রেণি বলতে বোঝানো হয়েছে, যারা শারীরিক দিক থেকে, সম্পদের দিক থেকে এবং পদমর্যাদার দিক থেকে দুর্বল। আর مَسَاكِيْن তথা মিসকীন শব্দের দুই অর্থ। একটি হলো, এমন লোক, যার কাছে অর্থ-বিত্ত নেই, গরীব। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এমন ব্যক্তি, যার কাছে অর্থ থাক বা না থাক, কিন্তু তার স্বভাবের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা আছে। এমন ব্যক্তি সম্পদশালী হলেও তার মধ্যে অহংকার আসে না। নম্র ও বিনয়ী হয়। মিসকীনদের সঙ্গে উঠাবসা করে। তাদেরকে ভালোবাসে। তাদেরকে কাছে রাখে। এমন ব্যক্তিও মিসকীন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

বিনম্রতা ও ধনাঢ্যতার সহাবস্থান

সুতরাং এমন সংশয়ের কোনো কারণ নেই যে, কেউ যদি সম্পদশালী ও সচ্ছল হয়, তাহলে সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। তা নয়। বরং আল্লাহ যদি কাউকে ধন-সম্পদ দেন তাহলে এটা অবশ্যই নেয়ামত। এর কারণে যদি তার অন্তরে অহংকার না আসে। বিনয়-নম্রতা এবং আল্লাহর সামনে নিজের অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিতার স্বীকারোক্তি থাকে। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করে। আল্লাহ ও তাঁর মাখলুকের হক যথাযথভাবে আদায় করে। এমন ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ মিসকীন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে। যাদের ব্যাপারে হাদীসে জান্নাতের সুসংবাদ এসেছে।

দারিদ্র্য ও বিনম্রতা ভিন্ন বিষয়

এক হাদীসে এসেছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ

'হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখুন, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং মিসকীনদের সঙ্গে আমার হাশর করুন।'[৩]

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ

'হে আল্লাহ! আমি দারিদ্র্য ও অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৪]

এখানে দেখা যাচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছেন, আর উপরের হাদীসে দেখা গেলো, তিনি মিসকীন হিসেবে জীবন, মৃত্যু এবং মিসকীনদের সাথে হাশর প্রার্থনা করছেন। অতএব বোঝা গেলো, দারিদ্র্য আর মিসকীনী এক কথা নয়। দারিদ্র্য হলো, অভাব-অনটন। পক্ষান্তরে মিসকীনী অর্থ হলো, স্বভাবগত বিনয়, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা, আল্লাহর সামনে নিজের দীনতা-হীনতা ও অসহায়ত্বের প্রকাশ এবং অসহায়-অনাথের সঙ্গে সদাচরণ ইত্যাদি। উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি কারো অন্তরে থাকে, তবে সে আলোচ্য হাদীসের সুসংবাদের অধিকারী হবে।

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে আল্লাহর ফায়সালা

আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে এসেছে যে, আল্লাহ উভয়ের মাঝে ফয়সালা করলেন এভাবে- জান্নাতকে বললেন, তুমি হলে আমার রহমতের নিদর্শন। যাকে রহমত ও দয়া করতে চাই, তোমার দ্বারা তার প্রতি দয়া করবো। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাবের নিদর্শন। যাকে আযাব দিতে চাই, তোমার দ্বারা আযাব দেবো। জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়কেই মানুষ দ্বারা পূর্ণ করবো। এ কারণে দুনিয়ায় দুই ধরনের লোকই পাওয়া যাবে। জান্নাতের

---

৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২৭৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪১১৬

৪. সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৫৩৬৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩২০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭৭০৮

অধিকারী লোকও পাওয়া যাবে, তারা জান্নাতের কাজ করে। আর জাহান্নামের উপযুক্ত লোকও পাওয়া যাবে, তারা জাহান্নামের কাজ করে। আমারা কেবল দু'আ করবো, আল্লাহ যেন আমাদেরকে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদেরকে তিনি জান্নাতের জন্যে তৈরী করেছেন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

জনৈক বুযুর্গের পরকালভীতি

এক বুযুর্গ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তিনি জীবনে কখনো হাসেননি এমনকি তার মুখে কখনো মুচকি হাসিও দেখা যায়নি। সর্বদাই তিনি চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। কেউ প্রশ্ন করলো, হযরত আপনার চেহারায় কখনো একটু মুচকি হাসিও দেখা যায় না, আপনি সবসময় শুধু চিন্তাগ্রস্থ থাকেন, এর কারণ কী? তিনি উত্তরে বললেন, ভাই! আসল ঘটনা হলো, আমি হাদীসে শুনেছি যে, আল্লাহ কিছু মানুষ তৈরী করেছেন জান্নাতের জন্যে, আর কিছু মানুষ তৈরী করেছেন জাহান্নামের জন্যে। কিন্তু আমি জানি না যে, আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হতে পারবো না যে, আমি জান্নাতী দলের অন্তর্ভুক্ত, ততোক্ষণ পর্যন্ত কীভাবে হাসি আসবে, বলো? এ জন্যেই আমি সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকি।

ঈমানদারের চোখ কী করে ঘুমাতে পারে?

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন,

وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيْرَةٌ

وَلَمْ تَدْرِ فِيْ أَيِّ الْمَحَلَّيْنِ تَنْزِلُ

'মুমিন যতোক্ষণ জানবে না যে, তার ঠিকানা জান্নাতে না জাহান্নামে, ততোক্ষণ তার চক্ষুদ্বয় কীভাবে সুখনিদ্রায় বিভোর হতে পারে!'

প্রাণ যাওয়ামাত্র মুচকি হাসি

যেই বুযুর্গকে সারা জীবন হাসতে দেখা যায়নি, মৃত্যুকালে যারা তাকে দেখেছে, তাদের বিবরণ হলো, তার প্রাণ বের হওয়ামাত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে মুচকি হাসি ফুটে উঠেছে। কারণ, এখন সে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

গাফলতের জীবন খুব খারাপ

আল্লাহ যাদেরকে এই চিন্তা দান করেছেন যে, এখন আল্লাহ আমার উপর সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট, তার মুখে কী করে হাসি ফুটতে পারে? কিন্তু আল্লাহরই একটা মেহেরবানী যে, তিনি আমাদেরকে এ অবস্থায় রাখেন না। যদি দুনিয়ার সব মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়া অচল হয়ে পড়বে। দুনিয়ার কোনো কাজ-কারবার চলবে না। এ জন্যে ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি করেন না। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার হাদীসে সতর্ক করেছেন যে, এর অর্থ এই নয় যে, সবসময় গাফলতে ডুবে থাকবে। কখনো এ কথা চিন্তা করবে না যে, জান্নাতের দিকে যাচ্ছি, না জাহান্নামের দিকে। তুমি বরং চোখ খুলে একটু দেখো, কোন পথে যাচ্ছো, জান্নাতের পথে না জাহান্নামের পথে? নিজের আমলের দিকে একটু দৃষ্টি বুলিয়ে দেখো, কি আমল করছো? আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের সকলকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদেরকে তিনি জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ ও রূপ-সৌন্দর্যের উপর দম্ভ করো না

পরবর্তী হাদীস হলো,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي

الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন এক লোককে আনা হবে, যে শারীরিক দিক থেকে তো অনেক মোটা-তাজা এবং দুনিয়ার মর্যাদায় অনেক বড়ো হবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মূল্য একটা মশার ডানার বরাবরও হবে না।[৫] দুনিয়ার এই শক্তি-সামর্থ ও রূপ-সৌন্দর্য সেদিন কোনো কাজে আসবে না। কারণ, এসব সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করেনি। এ জন্যে আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানার বরাবর মূল্যও তার নেই।

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, নিজের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ ও রূপ-সৌন্দর্যের এবং পদমর্যাদা ও সহায়-সম্পদের উপর কখনো দম্ভ করো না।

---

৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৬০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯৯১

তকদীরী লোকও পাওয়া যাবে, তারা জান্নাতের কাজ করে। আর জাহান্নামের উপযুক্ত লোকও পাওয়া যাবে, তারা জাহান্নামের কাজ করে। আমরা কেবল দু'আ করবো, আল্লাহ যেন আমাদেরকে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদেরকে তিনি জান্নাতের জন্যে তৈরী করেছেন। আমীন ছুম্মা আমীন।

জনৈক বুযুর্গের পরকালভীতি

এক বুযুর্গ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তিনি জীবনে কখনো হাসেননি, এমনকি তার মুখে কখনো মুচকি হাসিও দেখা যায়নি। সর্বদাই তিনি চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। কেউ প্রশ্ন করলো, হযরত আপনার চেহারায় কখনো একটু মুচকি হাসিও দেখা যায় না, আপনি সবসময় শুধু চিন্তাগ্রস্ত থাকেন, এর কারণ কী? তিনি উত্তরে বললেন, ভাই! আসল ঘটনা হলো, আমি হাদীসে শুনেছি যে, আল্লাহ কিছু মানুষ তৈরী করেছেন জান্নাতের জন্যে, আর কিছু মানুষ তৈরী করেছেন জাহান্নামের জন্যে। কিন্তু আমি জানি না যে, আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হতে পারবো না যে, আমি জান্নাতী দলের অন্তর্ভুক্ত, ততোক্ষণ পর্যন্ত কীভাবে হাসি আসবে, বলো? এ জন্যে আমি সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকি।

ঈমানদারের চোখ কী করে ঘুমাতে পারে?

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন,

وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيْرَةٌ

وَلَمْ تَدْرِ فِيْ أَيِّ الْمَحَلَّيْنِ تَنْزِلُ

'মুমিন যতোক্ষণ জানবে না যে, তার ঠিকানা জান্নাতে না জাহান্নামে, ততোক্ষণ তার চক্ষুদ্বয় কীভাবে সুখনিদ্রায় বিভোর হতে পারে!'

প্রাণ যাওয়ামাত্র মুচকি হাসি

যেই বুযুর্গকে সারা জীবন হাসতে দেখা যায়নি, মৃত্যুকালে যারা তাকে দেখেছে, তাদের বিবরণ হলো, তার প্রাণ বের হওয়ামাত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে মুচকি হাসি ফুটে উঠেছে। কারণ, এখন সে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

গাফলতের জীবন খুব খারাপ

আল্লাহ যাদেরকে এই চিন্তা দান করেছেন যে, এখন আল্লাহ আমার উপর সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট, তার মুখে কী করে হাসি ফুটতে পারে? কিন্তু আল্লাহরই একটা মেহেরবানী যে, তিনি আমাদেরকে এ অবস্থায় রাখেন না। যদি দুনিয়ার সব মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়া অচল হয়ে পড়বে। দুনিয়ার কোনো কাজ-কারবার চলবে না। এ জন্যে ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি করেন না। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার হাদীসে সতর্ক করেছেন যে, এর অর্থ এই নয় যে, সবসময় গাফলতে ডুবে থাকবে। কখনো এ কথা চিন্তা করবে না যে, জান্নাতের দিকে যাচ্ছি, না জাহান্নামের দিকে। তুমি বরং চোখ খুলে একটু দেখো, কোন পথে যাচ্ছো, জান্নাতের পথে না জাহান্নামের পথে? নিজের আমলের দিকে একটু দৃষ্টি বুলিয়ে দেখো, কি আমল করছো? আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের সকলকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদেরকে তিনি জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন।

বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ ও রূপ-সৌন্দর্যের উপর দম্ভ করো না

পরবর্তী হাদীস হলো,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي

الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন এক লোককে আনা হবে, যে শারীরিক দিক থেকে তো অনেক মোটা-তাজা এবং দুনিয়ার মর্যাদায় অনেক বড়ো হবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মূল্য একটা মশার ডানার বরাবরও হবে না।[৫] দুনিয়ার এই শক্তি-সামর্থ ও রূপ-সৌন্দর্য সেদিন কোনো কাজে আসবে না। কারণ, এসব সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করেনি। এ জন্যে আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানার বরাবর মূল্যও তার নেই।

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, নিজের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ ও রূপ-সৌন্দর্যের এবং পদমর্যাদা ও সহায়-সম্পদের উপর কখনো দম্ভ করো না।

---

৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৬০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯৯১

কারণ, এসব কিছু আল্লাহর নিকট একটি মশার ডানার সমান মূল্যও রাখে না। আসল দেখার বিষয় হলো, আমল কেমন করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় চলেছে কি না।

মসজিদে নববীর ঝাড়ুদার মহিলা

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

উক্ত হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা রাযি. ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় এক মহিলা ছিলেন। যিনি মাঝে মধ্যে এসে মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতেন। তার চেহারা ছিলো কালো। হঠাৎ কিছুদিন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, অনেক দিন থেকে ঐ মহিলাকে দেখছি না কেন, যে মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিতো। সে এখন ঝাড়ু দিতে আসে না কেন?[৬] দেখুন একেকজন সাহাবীর সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেমন সম্পর্ক ছিলো। এই মহিলা সাহাবী মসজিদে এসে ঝাড়ু দিয়ে চলে যেতেন তার কথাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে রাখতেন। যার কারণে এখন না দেখে জিজ্ঞাসা করছেন যে, সে কোথায়?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো ইন্তিকাল করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার মৃত্যু-সংবাদ আমাকে দাওনি কেন? সাহাবায়ে কেরাম চুপ হয়ে গেলেন। কিছু বললেন না। কিন্তু তাদের অবস্থা থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে, সে তো একজন সাধারণ মানুষ তার মৃত্যু-সংবাদ এমন কি গুরুত্ব রাখে যে, আপনার মতো ব্যক্তিত্বকে খবর

---

৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৫১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৮৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৭৮৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৫১৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮২৮০.

দিতে হবে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা তার কবর কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করে তার কবরে গিয়ে তার জানাযার নামায আদায় করলেন।

কবরে জানাযা নামাযের বিধান

জানাযার নামাযের সাধারণ বিধান হলো, যদি কারো জানাযার নামায হয়ে থাকে তাহলে তার কবরের উপর জানাযার নামায জায়েয নেই। আর যদি জানাযার নামায ছাড়া কাউকে দাফন করা হয়, তাহলে যতোক্ষণ পর্যন্ত লাশ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কবরের উপর তার জানাযার নামায পড়া যায়। কিন্তু যখন লাশ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা হবে, তারপর আর কবরের উপর জানাযার নামায পড়া যাবে না।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত মহিলার কবরে জানাযার নামায পড়ার বিষয়টি ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিজের বিশেষত্ব হিসাবেই তিনি তাঁর কবরের উপর জানাযার নামায পড়েছেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই কবরগুলো অন্ধকরাচ্ছন্ন থাকে। আমার নামাযের বদৌলতে আল্লাহ সেগুলোকে আলোকিত করে দেন।

কাউকে তুচ্ছ মনে করবে না

উক্ত কাজটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সর্তক করার জন্যে করেছেন যে, কোনো মানুষ- সে নারী হোক বা পুরুষ এবং বাহ্যত সে যে কোনো মর্যাদারই হোক না কেন- তাকে এমন মনে করবে না যে, সে প্রকৃত অর্থেই খুব সাধারণ মানুষ। তাকে গুরুত্ব দেওয়ার কি প্রয়োজন? কারণ, কে জানে যে, আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা কতো বেশি?

এলোকেশী লোকগুলো!

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে সব লোক এলোকেশী। চুলে চিরুনী লাগায় না। ধূলিমলিন থাকে। মেহনত-মজদুরী করে। শারীরিক শ্রম দিয়ে খেটে খায়।

যার ফলে শরীরে ধূলার স্তর জমে যায়। কারো দুয়ারে গেলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। এরা বাহ্যত দুনিয়ার দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন হলেও আল্লাহর কাছে এমন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে, তারা যদি আল্লাহর নামে কোনো কসম করে, তাহলে আল্লাহ তাদের কসম পূর্ণ করে দেন।[৭] অর্থাৎ, তারা যদি কসম করে বলে দেয় যে, অমুক কাজটি হবে, তাহলে আল্লাহ ঐ কাজ করে দেন। আর যদি বলে এটা হবে না, তখন আল্লাহ ঐ কাজ বন্ধ করে দেন।

গরীব-অসহায়দের সঙ্গে আমাদের আচরণ

উক্ত হাদীসগুলোর আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, বাহ্যত কোনো মানুষকে সাধারণ বা গরীব দেখে মর্যাদাহীন ভাবা যাবে না। আমরা তো মুখে মুখে খুব বলি যে, সব মুসলমান ভাই ভাই। আল্লাহর নিকট আমীর-গরীব সব সমান। বরং আল্লাহর কাছে গরীবের মূল্য অনেক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিভিন্ন আচরণে উচ্চারণে যখন আমরা তাদের মুখোমুখি হই, তখন কি এ বিষয়গুলো আমাদের মনে থাকে। নিজের চাকর, খাদেম, অধীনস্থ কোনো লোক বা অন্যান্য গরীব সাধারণের সঙ্গে যখন কোনো কাজ করি, তখন কি আমরা এ কথাগুলো মনে রাখি? বাস্তবতা হলো, আমি বক্তৃতা দিচ্ছি, আর আপনারা বক্তৃতা শুনছেন, কিন্তু যখন আমলের প্রসঙ্গ আসবে, তখন সব ভুলে যাবো। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

নিজের খাদেমের সঙ্গে হযরত থানভী রহ.-এর আচরণ

আল্লাহর যেই খাস বান্দাদেরকে তিনি এ বিষয়গুলো যথাযথ বুঝে আমল করার তাওফীক দান করেছেন, এবার তাদের গল্প শুনুন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর এক খাদেম ছিলেন। নাম তার ভাই নিয়ায। খানকায় যাতায়াতকারী সবাই তাকে 'ভাই নিয়ায' বলে ডাকতো। তিনি হযরতের খাস খাদেম ছিলো। যেহেতু হযরতের খেদমত করতেন এবং হযরতের সাহচর্যধন্য ছিলেন, আর এমন লোকদের মধ্যে অনেক সময় কিছু মান-অভিমান কাজ করে- তাই 'ভাই নিয়াযে'র মধ্যেও কিছুটা 'নায' ছিলো। এ জন্যে সে খানকায় আগত লোকদের সঙ্গে কখনো কখনো কিছুটা শক্ত আচরণ করতো। একবার হযরতের কাছে কেউ ভাই নিয়াযের ব্যাপারে

---

৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৫৪

অভিযোগ করে বললো, হযরত! সে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে। আমাকেও সে অন্যায় কথা বলেছে। হযরতের কাছে যেহেতু আগেও বিভিন্ন সময় তার ব্যাপারে অভিযোগ এসেছে। এ জন্যে এবার হযরত একটু কষ্ট পেলেন এবং নারাজ হলেন। হযরত তাকে ডাকলেন এবং বকা দিয়ে বললেন, ভাই নিয়ায! তুমি সবার সঙ্গে কেন ঝগড়া করে বেড়াও? সে হযরতের এ কথা শোনামাত্র বলে উঠলো- 'হযরত মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন।' দেখুন, একজন চাকর বা খাদেম তার মনিবকে কেমন কথা বলছে! আর মনিব হলেন হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.। আসলে তার উদ্দেশ্য মূলত এমন ছিলো না যে, হযরত আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনি মিথ্যা বলবেন না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিলো- যারা আপনার কাছে অভিযোগ করেছে, তারা মিথ্যা অভিযোগ করেছে। তাদের উচিত ছিলো মিথ্যা না বলা এবং আল্লাহকে ভয় করা। কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে অনিচ্ছাতেই মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে- হযরত মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন। এখানে লক্ষ করুন, মনিব যখন শাসন করে, তখন যদি ভৃত্য বলে- 'মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন' তাহলে মনিবের রাগ আরো বেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি ছিলেন হযরত হাকীমুল উম্মত। সে যখন বললো, মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন। হযরত সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত করে ফেললেন এবং বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ।

যাঁরা আল্লাহর সীমানায় থেমে যান

এরপর হযরত বললেন, আসলে আমারই ভুল হয়েছে। আমি একপক্ষের কথা শুনেই তাকে শাসন করা আরম্ভ করে দিয়েছি। অথচ শরীয়তের নির্দেশ হলো, একপক্ষের কথা শুনে ফয়সালা করবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষের কথা না শুনবে। প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন ছিলো যে, কী ঘটনা ঘটেছে? সে তার অবস্থান ব্যক্ত করার পর ফয়সালা করা দরকার ছিলো। কিন্তু আমি তার বক্তব্য শোনার আগেই তাকে শাসন করতে আরম্ভ করেছি। অতএব ভুল আমার হয়েছে। তাই সে যখন বললো, 'আল্লাহকে ভয় করুন' তখনই আমি আল্লাহমুখী হয়ে বলতে লাগলাম- আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ।

বস্তুত এঁরাই ছিলেন ঐ সকল লোক, যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللهِ

'আল্লাহর বিধানের সীমা-রেখায় দাঁড়িয়ে যেতেন।'

তাই নিজের চাকর, খাদেম ও অধীনস্থ সকলের সঙ্গে সদাচরণ করুন। তাদের সঙ্গে কখনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের আচরণ করবেন না। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

হযরত উসামা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক প্রিয় সাহাবী ছিলেন এবং তার পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর ছেলে ছিলেন। অতএব উসামা রাযি. ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপৌত্র। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি (এটি সম্ভবত মেরাজের সময়কার ঘটনা। কারণ, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত ও জাহান্নাম ভ্রমণ করানো হয়েছিলো। অথবা এ ঘটনা অন্য কোনো স্বপ্নজগত বা কাশফ জগতেরও হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।) এক পর্যায়ে দেখলাম, জান্নাতে যতো মানুষ আছে তাদের অধিকাংশই গরীব শ্রেণির। পক্ষান্তরে যাদেরকে দুনিয়ায় বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী মনে করা হতো এবং বড়ো বড়ো পদমর্যাদার অধিকারী এবং সহায় সম্পদের অধিকারী ছিলো, তাদেরকে দেখলাম জান্নাতের দরজায় বাধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ যেন তাদেরকে বাধা দিয়ে রেখেছে, ফলে তারা প্রবেশ করতে পারছে না।[৮]

এ কথার দুটি অর্থ হতে পারে, হয়তো তারা জান্নাতের উপযুক্ত, কিন্তু তাদের হিসাব-নিকাশ অনেক দীর্ঘ, যা পরিষ্কার করার আগে তারা জান্নাতে

---

৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭৯৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯১৯, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ২০৮২৪

যেতে পারবে না। এ জন্যে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অথবা যারা জাহান্নামী, তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়েছে যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাও। এ জন্যে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

আর জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্যে অধিকাংশ হলো নারী।

মিসকীনরা জান্নাতী হবে

উক্ত হাদীসে দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হলো, জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে অধিকাংশই হবে 'মিসকীন'। এ বিষয়টি ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, 'মিসকীন' হওয়ার জন্যে ফকীর হওয়া জরুরী নয়। বরং মিসকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বভাবগতভাবে বিনয়ী ও বিনম্র হওয়া। এমন স্বভাবের লোকেরাও মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত।

জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা বেশি হবে কেন

হাদীসের দ্বিতীয়াংশ হলো জাহান্নামীদের অধিকাংশ দেখেছি নারী। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন,

إِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

'আমাকে দেখানো হয়েছে, অধিকাংশ জাহান্নামী হলে তোমরা।'

উক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বোঝা গেলো যে, জাহান্নামীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হবে। তবে এটার অর্থ এই নয় যে, নারীরা নারী হওয়ার কারণে জাহান্নামে যাবে। বরং অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। একবার তিনি নারীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে নারী।

নারী সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন-

بِمَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟

কেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ?

তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এর মৌলিক কারণ দুটি,

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ

নারীদের মধ্যে এমন দুটি গোনাহ বেশি পাওয়া যায়, যেগুলো নারীদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।[১] যে নারী এগুলো থেকে বেঁচে থাকবে, সে জাহান্নাম থেকেও বেঁচে যাবে, ইনশাআল্লাহ! প্রথম কারণ হলো, তারা অভিশাপ করে বেশি। যখন তখন যাকে তাকে অভিশাপ করে। খুব সাধারণ কথায় কাউকে বদ-দু'আ করা, গাল-মন্দ বলা এবং দোষারোপ করার প্রবণতা নারীদের মধ্যে বেশি। অর্থাৎ, এমন কথা বলা, যার কারণে মনে কষ্ট হয়, মন ভেঙে যায়। এ প্রবণতা যে নারীদের মধ্যে বেশি, তা সুস্পষ্ট বিষয়।

স্বামীর অকৃতজ্ঞতা একটি বড়ো গোনাহ

উক্ত হাদীসে নারীদের অধিকহারে জাহান্নামে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ বলা হয়েছে, তারা স্বামীর খুব বেশি অকৃতজ্ঞ হয়। সাধা-সিধা সম্ভ্রান্ত স্বামী জান-মাল খরচ করে তোমাদের খুশি করার জন্যে অনেক পরিশ্রম করে, কিন্তু তোমাদের মুখে কখনো শুকরিয়া আসে না, বরং উল্টো না-শোকরি প্রকাশ পায়। এ দুটি কারণেই নারীরা অধিক পরিমাণে জাহান্নামে যাবে।

অকৃতজ্ঞতা এমনিতেই খারাপ এবং আল্লাহর নিকট অনেক অপছন্দনীয়। না-শোকরি যে আল্লাহর কতো অপছন্দ তা এ শব্দ থেকেই অনুমিত হয় যে, না-শোকরির আরবী প্রতিশব্দ হলো 'কুফর'। 'কাফের' শব্দের মূল ধাতু 'কুফর' অর্থও হলো 'না-শোকরি'। কাফেরকে এ জন্যে 'কাফের' বলে যে, সে আল্লাহর না-শোকরি করে। আল্লাহ তাকে এতো নেয়ামত দান করলেন, তাকে সৃষ্টি করলেন, তাকে লালন-পালন করছেন, তার উপর নেয়ামতের বারি বর্ষণ করছেন, আর সে এসব নেয়ামতের না-শোকরি করে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করে, বা তাঁর অস্তিত্বই অস্বীকার করে। এ জন্যেই না-শোকরি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গোনাহ।

স্বামীর মর্যাদা

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যদি দুনিয়ায় আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ১৫৫৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১২৭৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১০৬৩৭

নারীদেরকে হুকুম দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সেজদা করার জন্যে। কিন্তু সেজদা যেহেতু কারো জন্যেই বৈধ নয়, এ জন্যে এ নির্দেশ দেই না। উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর আনুগত্য ও তার কৃতজ্ঞতা স্ত্রীর অন্যতম ফরয। স্ত্রী যদি স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়, তাহলে সে মূলত আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হলো। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা আল্লাহর এতো অপছন্দ, যার ফলে আল্লাহ তাদের বলে দিয়েছেন যে, এ কারণে তোমরা জাহান্নামে যাবে।[১০]

জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুটি উপায়

আল্লাহ স্বামীর উপর স্ত্রীর কিছু হক রেখেছেন, আবার স্ত্রীর উপরও স্বামীর কিছু হক রেখেছেন। বিশেষ করে আমাদের মা-বোনদের খুব মনে রাখা দরকার যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নারী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাদের অধিকহারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ এ দুটি। এ কথা স্বাভাবিক যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে আর কে বেশি জানে এবং তাঁর উম্মতের ব্যাপারেও তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে? উম্মতের রোগ কী? রোগের চিকিৎসা কী? এ বিষয়ে তাঁর চেয়ে নিশ্চয়ই অন্য কেউ বেশি জানে না। তাই নারীদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্যে তিনি দুটি পন্থা বলে দিয়েছেন- এক অভিশাপ না করা, দুই স্বামীর না-শোকরি না করা।

স্বামীর হকের ব্যাপারে হাদীসে এ কথা পর্যন্ত এসেছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে তার বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দেয়, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, আর এ অবস্থায় স্ত্রী রাত যাপন করে, তাহলে সারা রাত ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ করতে থাকে।

জিবকে সংযত রাখুন

আজকাল খুব শ্লোগান ও প্রোপাগান্ডা চলছে যে, নারীদেরকে অবমূল্যায়ণ করা হয়েছে। এমনকি জাহান্নামেও তাদেরকে বেশি দেওয়া হবে। কিন্তু যে বিষয়টি এখানে খুব ভালোভাবে বোঝা দরকার, তা হলো নারীদেরকে তো নারী হওয়ার কারণে জাহান্নামে বেশি দেওয়া হবে না, বরং তাদেরকে জাহান্নামে দেওয়া হবে তাদের বদ আমল বেশি হওয়ার কারণে। বিশেষ করে

---

১০. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮২৮, সুনানে দারেমী, হাদীস নং ১৪২৭

তাদের অসংযতো জিবই তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিপতিত করার বস্তু হলো তার জিব। কারণ, সাধারণত দেখা যায় জিব যখন মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তখন এর কারণে অসংখ্য গোনাহ হতে থাকে। চিন্তা করে দেখুন, পুরুষের জিব তুলনামূলক বেশি সংযত থাকে। পক্ষান্তরে নারীরা সাধারণত জিবকে সংযত রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে না। এ জন্যেই এ সমস্যা তৈরী হয়। দয়া করে আল্লাহর ওয়াস্তে জিবকে সংযত রাখার চেষ্টা করুন। জিব থেকে যেন এমন কোনো শব্দ বের না হয়, যার কারণে কেউ মনে ব্যথ্যা পায়। বিশেষত যে স্বামীর অন্তর খুশি রাখা আল্লাহ নারীর অন্যতম ফরয সাব্যস্ত করেছেন, তাদের মন রক্ষা করায় সচেতন হওয়া জরুরী। এমন মনে করা অন্যায় যে, নারীদেরকে এমনিতেই অন্যায়ভাবে জাহান্নামে বেশি দেওয়া হবে। বরং তারা তাদের আমলের কারণে জাহান্নামে বেশি যাবে। আল্লাহ তাদেরকে এমন কাজ থেকে হেফাজত করুন। আমীন। তারা নিজেরা যদি বাঁচতে চায় তাহলে অবশ্যই বেঁচে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আপনারা জানেন, আল্লাহ জান্নাতের নারীদের সর্দার যাকে বানিয়েছেন, তিনিও এমনই একজন নারী ছিলেন। তিনি হলেন হযরত ফাতেমা রাযি.। আল্লাহ নারীদেরকেও জান্নাতের অধিকারী বানিয়েছেন। তবে সকলের জন্যেই জান্নাতে যাওয়ার ভিত্তি হলো তার আমল।

বান্দার হকের গুরুত্ব

আরো একটি বিষয় বুঝুন, যা এ হাদীস থেকেই বোঝা যায়, তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেননি যে, নারীদের অধিকহারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হলো, তারা ইবাদাত কম করে, বা তারা নফল নামায কম পড়ে, কিংবা তিলাওয়াত কম করে, ওযীফা কম পড়ে, বরং কারণ হিসাবে যে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, লানত বা অভিশাপ করা এবং স্বামীর না-শোকরি করা। এ দুটি বিষয়ই হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক সম্পর্কীয়। এতে বোঝা যায়, নফল ইবাদতের চেয়ে বান্দার হকের গুরুত্ব বেশি। আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদেরকে সঠিক বুঝ এবং সকলের সকল হক আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اٰمِيْنَ. بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

গোনাহগারকে তিরস্কার করবেন না*

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهٗ[1]

গোনাহের কারণে কাউকে লজ্জা দেওয়ার আপদ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে এমন কোনো গোনাহের কারণে লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে, সে ব্যক্তি ততোক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে ঐ গোনাহে লিপ্ত না হবে। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার জানা আছে যে, এ ব্যক্তি অমুক গোনাহে লিপ্ত ছিলো বা লিপ্ত হয়েছে এবং আপনার এ কথাও জানা আছে যে, সে তা থেকে তওবাও করেছে, তাহলে এমন গোনাহের কারণে তাকে হেয় জ্ঞান করা, লজ্জা দেওয়া বা তিরস্কার করা যে, তুমি তো সেই ব্যক্তি, যে অমুক কাজ করতে- এভাবে তিরস্কার করা একটা পৃথক গোনাহ। সে ব্যক্তি তওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক পরিষ্কার করে নিয়েছে। তওবা করার দ্বারা

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ৭, পৃঃ ৭২-৮২, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ জুমাবার, আসর নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪২৯

গোনাহ শুধু মাফই হয় না, বরং আমলনামা থেকে তা মুছে ফেলা হয়। এক আল্লাহ তা'আলা তো তার গোনাহ আমলনামা থেকে মুছে দিয়েছেন, কি আপনি তাকে ঐ গোনাহের কারণে হেয় ও লাঞ্ছিত মনে করছেন, তিরস্কার করছেন এবং ভালো-মন্দ বলছেন, এ কাজটি আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয়।

গোনাহগার ব্যক্তি রোগীর ন্যায়

এটা তো ঐ ব্যক্তির বিষয়, যার সম্পর্কে আপনার জানা আছে যে, সে গোনাহ থেকে তওবা করেছে। আর যদি সে তওবা করেছে কি না, তা জানা না থাকে, তাহলে একজন মুমিনের বিষয়ে এ সম্ভাবনা তো আছে যে, সে তওবা করেছে, বা আগামীতে তওবা করবে। এ জন্যে যদি কেউ গোনাহ করে আর তার তওবা করার বিষয় আপনার জানা না থাকে, তাহলেও তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার কোনো অধিকার আপনার নেই। জানা তো নেই, হয়তো সে তওবা করেছে। মনে রাখবেন! গোনাহের প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত, গোনাহগারের প্রতি নয়। পাপ ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা থাকতে হবে, কিন্তু পাপী ও নাফরমান ব্যক্তিকে ঘৃণা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেখাননি। গোনাহগার ব্যক্তি বরং দয়া-মায়ার যোগ্য। যেমন, কোনো ব্যক্তি দৈহিক কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তার ব্যাধির সাথে তো ঘৃণা থাকবে, কিন্তু ঐ ব্যাধিগ্রস্থকে কি ঘৃণা করবেন? বলা বাহুল্য যে, অসুস্থ ব্যক্তি ঘৃণার যোগ্য নয়। তার অসুস্থতাকে ঘৃণা করুন, তা দূর করার চেষ্টা করুন, তার জন্যে দু'আ করুন। অসুস্থ ব্যক্তি ঘৃণার যোগ্য নয়। সে তো দয়া-মায়ার উপযুক্ত যে, আল্লাহর এ বান্দা কি বিপদেই না আক্রান্ত হয়েছে!

কুফর ঘৃণার যোগ্য, কাফের নয়

এমনকি কেউ যদি কাফের হয়, তাহলে তার কুফরীকে ঘৃণা করবেন, কিন্তু ব্যক্তি কাফেরকে ঘৃণা করবেন না, বরং তার জন্যে দু'আ করবেন, যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে হেদায়েত দান করেন। দেখুন! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেররা কতো কষ্ট দিতো। তাঁর উপর যখন তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে, পাথর বর্ষণ করা হচ্ছে, তাঁর দেহ রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে, এমন সময়ও তাঁর মুখে যে কথা উচ্চারিত হয়েছে, তা ছিলো এই,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'হে আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করুন। তারা তো হাকীকত সম্পর্কে জানে না।'[১]

লক্ষ করুন! তাদের নাফরমানি, কুফর, শিরক, জুলুম ও বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেননি, বরং স্নেহ প্রকাশ করে বলেছেন, হে আল্লাহ এরা অজ্ঞ, এরা প্রকৃত অবস্থা জানে না, এ জন্যে এরা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছে। হে আল্লাহ এদেরকে হেদায়েত দান করুন। এ জন্যে যখন কাউকে গোনাহে লিপ্ত দেখবেন, তখন তার প্রতি সহমর্মী হবেন। তার জন্যে দু'আ করবেন। চেষ্টা করবেন যেন সে গোনাহ থেকে বেঁচে যায়। তার কাছে তাবলীগ করবেন। তাকে দাওয়াত দিবেন। কিন্তু তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবার তাওফীক দিবেন, তার পর সে আপনার থেকেও সম্মুখে অগ্রসর হবে।

হযরত থানভী রহ.-এর অন্যাদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করা

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. থেকে এবং হযরত ডা. আব্দুল হাই ছাহেব রহ. থেকে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর এ উক্তি শুনেছি যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে বর্তমান অবস্থায় এবং প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অবস্থায় নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অবস্থার অর্থ এই যে, যদিও এখন সে কুফরীর মধ্যে লিপ্ত, কিন্তু জানা তো নেই হয় তো আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবার তাওফীক দান করবেন, ফলে সে কুফরীর গোনাহ থেকে রক্ষা পাবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাকে এতো উঁচু মর্যাদা দান করবেন যে, সে আমার থেকেও সম্মুখে অগ্রসর হবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমান, যার ঈমান আছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তার অবস্থা কী, তা তো জানা নেই। কারণ, আল্লাহর সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের অবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে। তারো সম্পর্কে আমরা কী করে মন্তব্য করতে পারি যে, সে এমন। এ জন্যে আমি প্রত্যেক মুসলমানকে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। বলা বাহুল্য যে, এখানে মিথ্যা ও বানিয়ে বলার কোনো সম্ভাবনা নেই যে, এমনিতেই

---

[১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৪৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪০১৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৪২৯

সৌজন্যেমূলকভাবে বলেছেন যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। নিশ্চিতভাবেই তিনি এমন মনে করতেন বলেই তা বলেছেন। মোটকথা, কাউকে গোনাহ ও নাফরমানীর কারণেও তুচ্ছ জ্ঞান করা জায়েয নেই।

এ ব্যাধি কাদের মধ্যে পাওয়া যায়

এই তুচ্ছ জ্ঞান করার ব্যাধি সে সব লোকের মধ্যে বিশেষভাবে জন্মায়, যারা বদ-দ্বীনির পথ থেকে দ্বীনের দিকে ফিরে আসে। উদাহরণস্বরূপ, শুরুর দিকে যাদের দ্বীনী অবস্থা ভালো ছিলো না, পরবর্তীতে দ্বীনের দিকে এসেছে, নামায-রোযার অনুগামী হয়েছে, বেশ-ভূষা, পোষাক-আসাক শরীয়তসম্মত বানিয়েছে, মসজিদে আসতে আরম্ভ করেছে, জামাতের সাথে নিয়মিত নামায পড়তে আরম্ভ করেছে, এমন লোকদের অন্তরে শয়তান এ কথা ঢেলে দেয় যে, তুমি তো এখন সঠিক পথে এসেছো। আর যারা গোনাহে লিপ্ত, তারা তো ধ্বংসের মধ্যে আছে। এর ফলে এ ব্যক্তি তাদেরকে তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করতে থাকে, হেকারতের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে এবং তাদের উপর এমনভাবে আপত্তি করতে থাকে যে, তাদের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। এর ফলে শয়তান তাকে আত্মশ্লাঘা, অহমিকা, অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত করে। যখন মানুষের মধ্যে অহংকার ও আত্মশ্লাঘা চলে আসে, তখন তা মানুষের সব আমলকে বরবাদ করে দেয়। যখন মানুষের দৃষ্টি এ দিকে যায় যে, আমি বড়ো নেককার, আর অন্যেরা খারাপ, তখনই মানুষ আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত হয়ে যায়। আর আত্মশ্লাঘার ফলে তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায়। কারণ, ঐ আমল মাকবুল, যা ইখলাসের সাথে আল্লাহর জন্যে করা হয়। যে আমলের পর মানুষ আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে যে, তিনি আমাকে এর তাওফীক দান করেছেন। এ কারণে কারো সঙ্গে হেয়তার আচরণ করা উচিত নয়। কোনো কাফের, ফাসেক ও ফাজেরকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়।

কাউকে অসুস্থ দেখলে এই দু'আ পাঠ করুন

হাদীস শরীফে এসেছে যে, কোনো মানুষ অন্যাকে রোগাক্রান্ত দেখলে এই দু'আ পাঠ করবে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

'হে আল্লাহ! আপনার শোকর যে, আপনি আমাকে এই ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন, যে ব্যধিতে এ ব্যক্তি আক্রান্ত এবং অনেক মানুষের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'[৩]

অর্থাৎ, অনেক লোক অসুস্থতায় আক্রান্ত, কিন্তু আপনি আমাকে সুস্থতা দান করেছেন। কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের হযরত আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন যে, যখনই কোনো হাসপাতালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করি, তখনই- আলহামদুলিল্লাহ- এই দু'আ পাঠ করি, সাথে এ দু'আও করি যে, হে আল্লাহ! এই অসুস্থ লোকদেরকে সুস্থতা দান করুন।

কাউকে গোনাহে লিপ্ত দেখলে একই দু'আ পাঠ করবে

আমাদের একজন ওস্তাদ বলতেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ লোককে দেখে যে দু'আ পাঠ করার শিক্ষা দিয়েছেন, আমি যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো গোনাহে লিপ্ত দেখি, তখনও এ দু'আ-ই পাঠ করি। উদাহরণস্বরূপ, পথ দিয়ে যাওয়ার সময় কখনো দেখি যে, মানুষ সিনেমা দেখার জন্যে বা তার টিকেট ক্রয়ের জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরকে দেখে এ দু'আই পাঠ করি এবং আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করি যে, তিনি আমাকে এ গোনাহ থেকে হেফাজত করেছেন।

এ দু'আ পাঠ করার কারণ এই যে, অসুস্থ ব্যক্তি যেমন সমবেদনার যোগ্য, তেমনিভাবে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিও সমবেদনার যোগ্য। কারণ সেও বিপদে আক্রান্ত। তার জন্যেও দু'আ করা উচিত যে, হে আল্লাহ! তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। জানা তো নেই, আজ যেসব লোক গোনাহের পথে চলছে আর আপনি তাদেরকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওফীক দান করবেন আর তারা আপনার চেয়েও অগ্রগামী হয়ে যাবে। এ জন্যে কিসের ভিত্তিতে আপনি অহংকার করবেন? তাই আল্লাহ তা'আলা যে, আপনাকে গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দিয়েছেন, সে জন্যে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করুন। তারা গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক লাভ করেনি, তাই তাদের জন্যে দু'আ করুন যে, হে

৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৫৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৮২

আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন। তাদেরকে এই রোগ থেকে মুক্তি দান করুন। মোটকথা, কুফরীর প্রতি ঘৃণা থাকবে; গোনাহ, নাফরমানী ও পাপ কাজের প্রতি ঘৃণা থাকবে, কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করবে না, তার সঙ্গে ভালোবাসা ও মমতার আচরণ করবে। তাকে কোনো কথা বলতে হলে স্নেহ ও নম্রতার সাথে বলবে। সহমর্মিতা ও ভালোবাসার সাথে বলবে। যাতে তার উপর ভালো প্রভাব পড়ে। আমাদের সকল বুযুর্গের আমল এমনই ছিলো।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর চোরের পা চুম্বন করা

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর নিকট হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর ঘটনা শুনেছি যে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. কোথাও যাচ্ছিলেন। এক জায়গায় দেখলেন যে, এক ব্যক্তিকে শূলীতে ঝুলানো হয়েছে, তার এক হাত ও এক পা কাটা। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- কি হয়েছে? লোকেরা বললো, এ ব্যক্তি অভ্যস্ত চোর। প্রথমবার ধরা পড়লে তার হাত কাটা হয়, দ্বিতীয় বার ধরা পড়লে পা কাটা হয়, এবার তৃতীয় বার ধরা পড়লে তাকে শূলীতে চড়ানো হয়। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার পা চুম্বন করলেন। লোকেরা বললো, হযরত এ ব্যক্তি এতো বড়ো অভ্যস্ত চোর, আর আপনি তার পা চুম্বন করছেন! উত্তরে তিনি বললেন, যদিও এ ব্যক্তি মারাত্মক অপরাধ করেছে, গোনাহের কাজ করেছে, যে কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি অত্যাধিক উত্তম গুণ রয়েছে, তা হলো ইস্তিকামাত (অবিচলতা)। যদিও সে এ গুণকে ভুল জায়গায় ব্যবহার করেছে। সে যে কাজকে নিজের পেশা বানিয়েছে তার উপর সে অটল ছিলো, তার হাত কেটে দেওয়া হয়েছে, তার পরেও সে ঐ কাজ ছাড়েনি। পা কেটে দেওয়া হয়েছে তবুও তা ছাড়েনি। এমনকি তার মৃত্যুদন্ড হয়েছে, কিন্তু সে তার কাজে অটল ছিলো। এর দ্বারা জানা গেলো যে, তার মধ্যে ইস্তিকামাতের গুণ ছিলো। এই গুণের কারণে আমি তার পা চুম্বন করেছি। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে তাঁর ইবাদত ও বন্দেগীর কাজে এ গুণ দান করেন।

মোটকথা, আল্লাহর নেক বান্দাগণ মানুষকে ঘৃণা করেন না, তাদের মন্দ চরিত্রকে ঘৃণা করেন। তারা বলেন, কোনো খারাপ মানুষের মধ্যে ভালো গুণ থাকলে তা অর্জন করার চেষ্টা করো, আর তার মধ্যে যে খারাপ দিক রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করো। তাকে ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে বুঝাও। তাকেই গিয়ে বলো। অন্যের কাছে তার দোষ চর্চা করো না।

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্যে আয়না স্বরূপ

হাদীস শরীফে এসেছে,

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ

'এক মুমিন অন্য মুমিনের আয়না।'[৪]

মানুষের চেহারায় কোনো দাগ লাগলে আর সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আয়না তাকে বলে দেয় যে, তোমার চেহারায় এই দাগ লেগে আছে। আয়না যেন মানুষের দোষ বলে দেয়। এমনিভাবে একজন মুমিনও অন্য মুমিনের জন্যে আয়না স্বরূপ। অর্থাৎ, যখন একজন মুমিন অন্য মুমিনের মধ্যে কোনো দোষ দেখবে, তখন তাকে স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে বলে দিবে যে, তোমার মধ্যে এই দোষ রয়েছে, তা দূর করো। যেমন কোনো মানুষের শরীরের উপর যদি কোনো পোকা বা পিপড়া হাঁটতে থাকে আর আপনি তা দেখেন, তখন ভালোবাসার দাবি হলো, আপনি তাকে বলে দিবেন যে, ভাই দেখো তোমার শরীরের উপর পোকা হাঁটছে তা ফেলে দাও। এমনিভাবে কোনো মুসলমানের মধ্যে দ্বীনের দিক থেকে কোনো খারাপি থাকলে স্নেহ-ভালোবাসার সাথে তাকে বলে দেওয়া উচিত যে, তোমার মধ্যে এই খারাপি রয়েছে। কারণ, এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্যে আয়না স্বরূপ।

একজনের দোষ অন্য জনকে বোলো না

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন যে, এ হাদীস দ্বারা এ কথা জানা গেলো যে, তুমি যখন অন্য কারো মধ্যে কোনো দোষ দেখবে, তখন শুধু তাকেই বলবে যে, তোমার মধ্যে এই দোষ রয়েছে। অন্যকে বলবে না যে, অমুকের মধ্যে এই দোষ রয়েছে। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনকে আয়নার সাথে তুলনা করেছেন। যে ব্যক্তি আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, আয়না কেবল তাকেই চেহারার দাগের কথা বলে দেয়। আয়না অন্যকে বলে না যে, অমুক ব্যক্তির চেহারায় দাগ রয়েছে। তাই একজন মুমিনের কাজ এই যে, যার মধ্যে কোনো দোষ বা খারাপ কিছু দেখবে শুধু তাকেই বলবে। অন্যদের সাথে আলোচনা করবে না যে, অমুকের মধ্যে এই দোষ রয়েছে। একজনের দোষের কথা যদি অন্যকে বলো, তার

---

৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৭২

অর্থ হবে এর মধ্যে তোমার রিপু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তখন তা আর দ্বীনী কাজ থাকবে না। আর যদি শুধু তাকে নির্জনে স্নেহ-মমতার সাথে তার দোষের ব্যাপারে সতর্ক করো, তাহলে এটা হবে ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানের দাবি। কিন্তু তাকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

গোনাহগারকে হেয় প্রতিপন্ন করো না*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ!

গোনাহগারকে হেয় জ্ঞান করো না

হযরত বলেন যে, গোনাহগারের প্রতি রাগ করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তো জায়েয আছে, কিন্তু তাকে নিজের চেয়ে হেয় জ্ঞান করো না। কাউকে শাস্তি প্রদানের জন্যে কখনো তোমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলে, সাবধান তখন নিজেকে তার থেকে কখনোই ভালো মনে করবে না। হতে পারে ঐ অপরাধী ব্যক্তি শাহাজাদার মতো, আর তুমি চাকর ও জল্লাদের মতো। বলা বাহুল্য যে, অপরাধী শাহাজাদাকে বাদশাহ জল্লাদের হাতে শাস্তি প্রদান করলে জল্লাদ তার থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।[1]

অর্থাৎ, একজন মানুষ খারাপ কাজ করছে, কোনো নাজায়েয ও গোনাহের কাজে লিপ্ত রয়েছে, তখন তার প্রতি তুমি রাগ হতে পারো, বিদ্বেষ রাখতে পারো, অর্থাৎ তার এই কাজকে ঘৃণা করতে পারো- কারণ, তার এ কাজ ঘৃণার যোগ্য- কিন্তু তাকে নিজের থেকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। একদিকে তার খারাপ কাজকে খারাপ মনে করবে, অপরদিকে তাকে নিজের থেকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না- এ উভয় বিষয় কী করে একত্রিত হতে পারে?

গোনাহের প্রতি ঘৃণা থাকবে, গোনাহগারের প্রতি নয়

বিষয়টিকে দুই শব্দে এভাবে বোঝো যে, 'ফিসক'কে ঘৃণা করবে, 'ফাসেক'কে নয়। অর্থাৎ, ব্যক্তি ফাসেককে ঘৃণা করবে না, বরং তার কাজকে ঘৃণা করবে। ব্যক্তি কাফেরকে ঘৃণা করবে না, কুফরকে ঘৃণা করবে। ফাসেক

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ডঃ ১, পৃঃ ৩১৭-৩৩৯

১. আনফাসে ঈসা পৃঃ ১৫৫

ও ফাজেরকে মনে করবে যে, এ ব্যক্তি অসুস্থ। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়
তাকে ঘৃণা করা হয় না, বরং রোগকে ঘৃণা করা হয়। বরং মানুষ রোগীর প্র
সহমর্মী হয় যে, এ বেচারা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এমনিভাবে কোনো ব্য
যদি গোনাহে লিপ্ত হয়, বা কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে তা
খারাপ কাজকে ঘৃণা করবে, কিন্তু ঐ ব্যক্তির প্রতি সহমর্মী হবে।

গোনাহগার ব্যক্তি সমবেদনার যোগ্য

আমার শ্বশুর (জনাব ভাই শারাফতুল্লাহ ছাহেব, আল্লাহ তা'আলা ত
শান্তি ও নিরাপদে রাখুন।) যখন গোনাহ বা খারাপ কাজে লিপ্ত কো
ব্যক্তির কথা আলোচনা করেন, তখন তিনি এভাবে বলেন যে, 'অমুক বেচা
বিদআতের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে।' তার জন্যে তিনি 'বেচারা' শব্দ ব্যবহ
করেন। উদ্দেশ্য হলো, সে ব্যক্তি সমবেদদনার যোগ্য। কারণ, সে রো
আক্রান্ত। এ জন্যে তার কাজ ঘৃণার যোগ্য, কিন্তু সে নিজে সমবেদনা
যোগ্য। যেহেতু সে সমবেদনার যোগ্য, তাই তাকে হেয় জ্ঞান করা জা
নয়। বিশেষত এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, হয়তো আল্লাহ তা'আলা তা
গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করবেন, তওবার তাওফীক দান করবে
ফলে সে অনেক সম্মুখে অগ্রসর হবে। আর আমি এখানেই পড়ে থাকবো।
জন্যে কাউকে নিজের থেকে ছোট জ্ঞান করবে না।

শয়তান কীভাবে বিপথগামী করে

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমাদের চাওয়া এ
যোগ্যতা ছাড়া এমন লোকদের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন, যারা দ্বীনের সা
সম্পর্ক রাখে। দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা যখন এমন লোকদেরকে দে
যারা দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং গোনাহে লিপ্ত, তখন অনেক সময় তা
প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি জাগ্রত হয়। মনে হ
যে, আমরা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এখান থেকেই শয়তান বিপথগামী করে।
জন্যে এ কথা মনে রাখবে যে, কারো ব্যক্তির প্রতি যেন ঘৃণা না থাকে। ঘৃ
থাকলে তার আমলের প্রতি থাকবে। তার মন্দ আমলের কারণে তার প্র
সমব্যথী হতে হবে। আর সাথে সাথে চিন্তা করবে যে, হয়তো আল্
তা'আলা তাকে তওবার তাওফীক দিবেন, ফলে সে আমার চেয়ে আগে বে
যাবে।

হযরত থানভী রহ.-এর তারবিয়াতের ধরন

হযরত থানভী রহ.-এর নিকট এমন পীর-মুরীদি ছিলো না যে, ইসলাহের জন্যে আগত ব্যক্তিদের শুধু ওযীফা বলে দিলেন। এবার সে খানকায় বসে বসে ওযীফা জপছে। আর ওযীফা জপার ফলে ভিতরে ভিতরে তার নফস ফুলছে। বরং কোনো ব্যক্তি যখন তাঁর নিকট তারবিয়াত গ্রহণের জন্যে আসে, তখন বাস্তবেই তিনি তার তারবিয়াত করতেন। আর তারবিয়াতের জন্যেই কখনো ধমক দেওয়ার, কখনো রাগ হওয়ার, আর কখনো শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন পড়তো। এ কারণেই হযরত কড়া বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরতের নিকট নিজেদের ইসলাহের জন্যে একদিকে যেমন জ্ঞানী-বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আসতো, অপরদিকে অসভ্য গন্ড-মূর্খ ব্যক্তিরাও আসতো। হযরত প্রত্যেকের আখলাকী তারবিয়াত করতেন। মুআশারা ও মুআমালায় নিয়ম-নীতির পরিপন্থী কোনো কাজ করলে ধর-পাকড় করতেন। সে ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের সাথে তার উপযুক্ত আচরণ করতেন।

তুমি 'বলদ' হলে আমি 'কসাই'

একবার এক গ্রাম্য লোক আসে। সে নীতি পরিপন্থী কাজ করে। হযরত তাকে বুঝান। ধমক দেন। তখন ঐ গ্রাম্য লোকটি বলে- হযরত আমি তো বলদ। উত্তরে হযরত বলেন, আমিও তো কসাই। এভাবেই প্রত্যেকের সাথে তার উপযুক্ত আচরণ হতো।

একটি চুটকি

একবার হযরত হাউজে ওযু করছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্য লোক বড়ো একটি তরমুজ এনে বলে- 'নে মৌলবী তোর জন্যে এনেছি। এটা কোথায় রাখবো?' হযরত ওযু করতে করতে বললেন, 'আমার মাথার উপর রাখো।' গ্রাম্য লোকটি তরমুজ তুলে হযরতের মাথার উপর রাখলো। লোকজন দৌড়ে এলো- এ কি আচরণ করছে! হযরত বললেন, 'ভুল আমার হয়েছে। আমিই বলেছি যে, মাথার উপর রাখো।' এমন সব লোক আসতো! যাদের তারবিয়াতের জন্যে কখনো তিনি রাগও হতেন। তিনি বলতেন যে, রাগ হওয়া আমার জন্যে ফরয। দিয়ানতের দাবি এটাই। এটা না করলে বদদিয়ানত হবে। আমানতের মধ্যে খেয়ানত হবে।

আমার দৃষ্টান্ত

হযরত বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি যখনই কারো উপর রাগ হই, তখ আমি এ কথা ভুলি না যে, আমার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোনো বাদশা জল্লাদকে হুকুম দেয় যে, শাহজাদাকে বেত্রাঘাত করো। জল্লাদ হুকুম মাফি শাহজাদাকে বেত্রাঘাত করে। কিন্তু ঠিক বেত্রাঘাত করার সময়ও সে নিজেক শাহজাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে না। সে জানে যে, এ শাহজাদা, আর আ জল্লাদ। বাদশাহর হুকুম তামিলে বেত্রাঘাত করছি। আলহামদুলিল্লাহ! আ যখন কাউকে ধমক দেই এবং কোনো বিষয়ে কাউকে ধরি, তখন এ ক মনে থাকে যে, এ ব্যক্তি শাহজাদা,. আর আমি জল্লাদ। আমি এর চেয়ে শ্রে নই।

ধমক দেওয়ার সময়ও দু'আ করা

দ্বিতীয়ত যখন ধমক দিচ্ছি বা ধর-পাকড় করছি, তখনই আবার মনে মনে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দু'আও করি যে, হে আল্লাহ! আমাকে এভা ধরবেন না, আখেরাতে আমাকে এভাবে পাকড়াও করবেন না।

দেখুন! যে ব্যক্তি এই নিয়তে ধমক দেয় যে, নিষিদ্ধ কাজে বাধা দি হবে এবং এর ইসলাহ করা জরুরী। আমাদেরকে এর হুকুম দেওয়া হয়েছে আবার প্রত্যেক ধমক ও ক্রোধের সময় এ দুই বিষয়ও লক্ষ রাখে, তা ক্রোধও ইবাদত নয় তো আর কি? মোটকথা, এভাবে এই দুই জিনি একত্রিত হয় যে, ক্রোধও হচ্ছে এবং খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বে হচ্ছে, কিন্তু নিজের থেকে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে না। নিজেকে তার থে শ্রেষ্ঠও মনে করছে না। তবে এ যোগ্যতা মেহনত-মুজাহাদা এবং কা সামনে নিজেকে মিটিয়ে দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে লা হয়।

সালেকীনের অহংকার ও অতিরঞ্জিত বিনয়ের চিকিৎসা

হযরত বলেন, দ্বীনের কাজ করার ফলে দুই ধরনের ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এ অহংকার, আরেক অতিরঞ্জিত বিনয়। অহংকার তো এই যে, ওযীফা ক করে নিজেকে বড়ো মনে করতে থাকে। নামায পড়ে বেনামাযীদেরকে তু জ্ঞান করতে থাকে। এর চিকিৎসা এ কথা চিন্তা করা যে, অহংকারের কার

বড়ো বড়ো ইবাদতকারীর পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। অভিষ্ট লক্ষ্যে তারা পৌছতে পারেনি। শয়তান ও বাল'আম বাউরের ঘটনা তার দৃষ্টান্ত। অতিরঞ্জিত বিনয় এই যে, নিজের নেক আমলের অবমূল্যায়ন করতে আরম্ভ করা। উদাহরণস্বরূপ মনে করে যে, যদিও আমি নামায পড়ছি, কিন্তু এর মধ্যে তো খুশু নেই। যিকির করছি, কিন্তু মোটেও নূর নেই। যেন পরোক্ষভাবে আল্লাহর উপর অভিযোগ আরোপ করছে। এর চিকিৎসা এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ! আপনার শোকর যে, আপনি আমাকে যিকির ও নামাযের তাওফীক দান করেছেন। অন্যথায় আপনার বন্দেগী করার তো কোনো ক্ষমতা আমার ছিলো না।

দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত করা

এ মালফূযে হযরত বিপরীতমুখী দুই ব্যাধির কথা উল্লেখ করেছেন। যারা দ্বীনের কাজে মগ্ন হয়, শয়তান তাদেরকে দ্বীনের মাধ্যমে বিচ্যুত করে। শয়তানের প্রথম চেষ্টা তো হয় এই যে, আল্লাহর কোনো বান্দা যেন দ্বীনের কাজে না লাগে। বরং তাকে প্রবৃত্তির ভোগ ও গোনাহের কাজে এমনভাবে ফাঁসানো যায়, যেন দ্বীনের কোনো কাজের প্রতি তার মনোযোগই না থাকে। নামাযের দিকেও যেন মনোযোগ না থাকে, রোযার দিকেও যেন মনোযোগ না থাকে, যাকাত ও হজ্বের দিকেও যেন তার মনোযোগ না থাকে। বরং প্রবৃত্তির চাহিদার মধ্যে আটকা থাকে। আর যদি কোনো ব্যক্তি দ্বীনের কাজে লেগেই যায়, তখন সে এই চেষ্টা করে যে, যা কিছু দ্বীনের কাজ সে করছে, তা নষ্ট করে দেই। সুতরাং তা নষ্ট করার জন্যে শয়তান বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। এ মালফূযে হযরত সেগুলোর মধ্যে থেকে দুটি পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

অহংকারের মাধ্যমে বিচ্যুত করা

প্রথম পন্থা এই যে, যে দ্বীনের কাজ করে, তার অন্তরে শয়তান অহংকার, আত্মশ্লাঘা ও অহমিকা সৃষ্টি করে। যেমন সে তাকে বলে- তুমি অনেক উঁচু স্তরের মানুষ হয়েছো। অত্যন্ত খুশু খুযুর সাথে নামায পড়ো। নামায ও জামাতের পাবন্দি করো। অনেক মানুষ নামায পড়ে না, বরং গোনাহের কাজে লিপ্ত। এর ফলে নিজের বড়ত্ব ও বেনামাযীদের হেয়তা অন্তরে আসে। যারা ছোট মনের মানুষ, তারা যখন নিয়মিত নামায পড়তে আরম্ভ করে এবং

আল্লাহর দিকে কিছুটা ঝুঁকতে আরম্ভ করে, তখন নিজেকে নিজে অনেক কিছু মনে করতে আরম্ভ করে।

এক জোলার দৃষ্টান্ত

আরবীতে একটি প্রবাদ রয়েছে,

صَلَّى الْحَائِكُ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ

একবার এক জোলা দু'রাকাত নামায পড়লো এবং নামাযের পর ওহীর প্রতীক্ষায় থাকলো যে, এখন আমার নিকট ওহী আসবে।

এ হলো আমাদের মতো মানুষের অবস্থা। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে একটু ইবাদতের তওফীক লাভ হলে দেমাগ আরশে পৌঁছে যায়। আমি বড়ো আবেদ, যাহেদ, মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়েছি- এটা অহংকার। এর চিকিৎসাস্বরূপ হযরত বলেন, এর চিকিৎসা এ কথা চিন্তা করা যে, অহংকারের ফলে বড়ো বড়ো ইবাদতকারীর পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তারা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। শয়তান ও বালআমবাউরের ঘটনা এর দৃষ্টান্ত।

অর্থাৎ, মানুষ চিন্তা করবে যে, আমি যদি অহংকার করি, তাহলে আমি যতো আমল করছি সব বেকার হয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্ত হলো শয়তান। কারণ, শয়তান প্রথমে অনেক ইবাদত করতো। এমনকি তার উপাধি- طَاوُسُ الْمَلَائِكَةِ তথা 'ফেরেশতাদের ময়ূর' হয়ে যায়। কিন্তু এই ইবাদতের ফলে মস্তিষ্কে অহংকার ঢুকে পড়ে। যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দেন, তখন সে সেজদা করতে অস্বীকার করে। এই যুক্তি তুলে ধরে যে, আপনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা, তাই আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি তাকে কেন সেজদা করবো? মোটকথা, এই অহংকারের ফলে সে বিতাড়িত হয়। না'উযুবিল্লাহ।

বাল'আম বাউরের ঘটনা

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বাল'আম বাউরের। বাল'আম বাউর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যুগের এক ব্যক্তি। সে অত্যন্ত আবেদ-যাহেদ ব্যক্তি ছিলো। মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত ছিলো। অর্থাৎ, সে যে দু'আই করতো, তা সাথে

সাথে কবুল হয়ে যেতো। মানুষ তার দ্বারা দু'আ করাতো। আল্লাহ তা'আলা তাকে এ মর্যাদা দিয়েছিলেন। সে 'আমালেকা'দের অঞ্চলে বাস করতো। এ অঞ্চলের লোকেরা ছিলো কাফের। এ জন্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের উপরে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেন। ঐ অঞ্চলের কাফেররা যখন জানতে পারলো যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আক্রমণ করবেন, তখন তারা বাল'আম বাউরের কাছে গেলো। গিয়ে বললো, আপনি বড়ো ইবাদতকারী, বুযুর্গ ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবুল করেন। আপনি দু'আ করুন যেন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বাহিনী পরাজয় বরণ করে। আমাদের উপর বিজয়ী হতে না পারে।

বাল'আম বাউর বললো, আমি এ দু'আ করতে পারবো না। কারণ, তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত পয়গম্বর। তাঁর সঙ্গে যে সৈন্যবাহিনী আছে, তারা সকলেই ঈমানদার। আমি তাদের পরাজয়ের দু'আ করতে পারবো না। তারা পীড়াপিড়ী করলো যে, আপনি অবশ্যই দু'আ করুন। তখন সে বললো, আচ্ছা আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিখারা করি। সুতরাং সে ইস্তিখারা করলো- ইস্তিখারার মধ্যে এ উত্তরই এলো যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর। তুমি তাঁর জন্যে কি করে বদ-দু'আ করবে? সুতরাং সে মানুষদেরকে জানিয়ে দিলো যে, আমি আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা করেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা বদ-দু'আ করতে নিষেধ করেছেন।

লোকেরা দ্বিতীয় দিন আবার তার কাছে গেলো। তার জন্যে ঘুষস্বরূপ কিছু হাদিয়াও নিয়ে এলো। এসে বললো, এই হাদিয়া নিন এবং দু'আ করুন। ইস্তিখারার মাধ্যমে যখন সে জানতে পেরেছে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার মঞ্জুর নয়, তখন বদ-দু'আ করতে তার অস্বীকার করা উচিত ছিলো। তখন এখানেই বিষয়টা চুকে যেতো। কিন্তু হাদিয়া পাওয়ার পর আরেকবার ইস্তিখারার কথা মাথায় এলো। তাদেরকে বললো যে, আচ্ছা আমি আরেকবার ইস্তিখারা করি। যখন দ্বিতীয়বার ইস্তিখারা করলো, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো উত্তর এলো না। তখন সে মানুষদেরকে জানিয়ে দিলো যে, আমি বদ-দু'আ করবো না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনি যে ইস্তিখারা করলেন, তার কী উত্তর এসেছে? সে বললো, কোনো উত্তর আসেনি। লোকেরা বললো, তাহলে তো কাজ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার যদি আপনাকে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা থাকতো, তাহলে তো আপনাকে নিষেধ করতেন। যখন নিষেধ করেননি এবং কোনো উত্তর আসেনি, এর অর্থ হলো

আপনি অনুমতি লাভ করেছেন। লোকেরাও এই ব্যাখ্যা করলো, সাথে ঐ ইবাদতকারী ব্যক্তিও একই ব্যাখ্যা করলো। পরিশেষে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর জাতির ধ্বংসের জন্যে বদ-দু'আ করলো।

এই বদ-দু'আ যেহেতু একজন নবীর বিরুদ্ধে ছিলো এ কারণে তা কবুল হয়নি। তবে কেউ কেউ লিখেছেন যে, বাল'আম বাউরের বদ-দু'আর ফলে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কয়েক বছর পর্যন্ত তীহ ময়দানে ঘুরতে থাকেন। তারপর ঐ আবেদ ব্যক্তি তার জাতিকে বলে- আমি তোমাদের কথা মতো দু'আ তো করেছি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন না কারণ, আমি পূর্বেই ইস্তিখারা করেছিলাম। লোকেরা বললো, আপনি যে গোনাহ করার তা তো করেই ফেলেছেন। এখন দু'আও কবুল হচ্ছে না। এখন এমন কোনো ব্যবস্থা বলে দিন, যেন মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়।

তখন ঐ আবেদ চিন্তা করে বললো, আমি এমন এক ব্যবস্থার কথা বলছি, যার ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ছাড়বে। তা হলো, তোমরা নিজেদের যুবতী মেয়েদেরকে তৈরী করো। তাদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঐ বাহিনীর মধ্যে পাঠিয়ে দাও। এরা বহু দিন যাবৎ পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করছে। যুবতীরা যখন তাদের কাছে যাবে, তখন কেউ না কেউ গোনাহে লিপ্ত হবে। যখন এরা গোনাহে লিপ্ত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর আযাব আসবে। এভাবে তোমরা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে। তারা তাই করলো। যুবতী মেয়েদেরকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বাহিনীর মধ্যে পাঠিয়ে দিলো। ফলে কতক লোক গোনাহের মধ্যে লিপ্ত হলো। বরং ঘটনার বিবরণে লেখা আছে যে, আমালেকার শাহাজাদী বনী ইসরাঈলের একজন সর্দারের কাছে গেলো। ঐ সর্দার শাহাজাদীকে নিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এলো এবং জিজ্ঞাসা করলো যে, এই শাহাজাদী কি আমার জন্যে হারাম? হযরম মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ তোমার জন্যে হারাম। সে বললো, হারাম হওয়া সত্ত্বেও আজ আমি তাকে সাথে নিয়ে যাবো। সুতরাং সে তাকে নিয়ে গেলো এবং অপকর্মে লিপ্ত হলো। হযরত হারুন আলাইহিস সালামের এক সন্তান তা জানতে পেরে উভয়কে বর্শা দ্বারা হত্যা করলো। এ ঘটনার পর এই অপকর্মের আযাব স্বরূপ বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্লেগ রোগের মহামারী দেখা দিলো। সুতরাং হাদীস শরীফেও এসেছে যে,

الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

'এই প্লেগ ঐ আযাবের অবশিষ্টাংশ, যা বনী ইসরাঈলের নিকট পাঠানো হয়েছিলো।'[২]

এসব কিছু বাল'আম বাউরের প্রস্তাবে হয়। সে আমালেকাকে এ ব্যবস্থা শিখিয়েছিলো। লক্ষ করুন! যেই বাল'আম বাউর এতো বড়ো আবেদ, আলেম ও মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত ছিলো। যখন তার মন ঘুরে গেলো, তখন তার পরিণতি এই হলো। যার উল্লেখ কুরআনের এ আয়াতে রয়েছে,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۝

'তাদেরকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শুনান, যাকে আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম অতপর সে তা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বের হয়ে যায়, অতপর শয়তান তার পিছু নেয়, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি চাইলে তাকে এসব আয়াতের বদৌলতে উঁচু মর্যাদায় পৌঁছে দিতাম, কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকে ধাবিত হলো এবং নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার অনুগমন করলো, তাই তার অবস্থা হয়ে গেলো কুকুরের ন্যায়। তুমি তার উপর হামলা করলেও সে হাঁপায়, তাকে ছেড়ে দিলেও সে হাঁপায়।'[৩]

অন্তর কখন ঘুরে যায়

হযরত থানভী রহ. এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন যে, বাল'আম বাউরের ঘটনা এর একটি দৃষ্টান্ত। সে এতো বড়ো আলেম, আবেদ ও মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত ছিলো, মানুষ তার কাছে গিয়ে নিজেদের জন্যে দু'আ করাতো, কিন্তু তার পরিণতি হলো এই। মন ঘুরে যেতে সময় লাগে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরকে এমনিতেই অন্ধকারের দিকে ঘুরিয়ে দেন না যে, অকস্মাৎ একজন মুসলমান কাফের হয়ে যাবে। বরং তার আচরণ

---

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২১৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪১০৮, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৯৮৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২০৭৫৬

৩. আ'রাফ ঃ ১৭৫-১৭৬

এমন হতে থাকে, যার ভিত্তিতে মন ঘুরে যায়। সেই আচরণ হলো, নিজের ইবাদতের কারণে অহমিকা চলে আসে, অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকারের ফলে বড়ো বড়োদের পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর ঘটনা

হযরত শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. অনেক উঁচু স্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. সম্পর্কে একটি ঘটনা লিখেছেন। একবার হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন যে, একটি নূর চমকালো। পুরো পরিবেশ আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই আলোর মধ্যে থেকে আওয়াজ এলো- হে আব্দুল কাদের! তুমি আমার ইবাদতের হক আদায় করেছো। এ পর্যন্ত তুমি যতো ইবাদত করেছো, তাই যথেষ্ট। আজকের পর থেকে তোমার উপর নামায ফরয নয়, রোযা ফরয নয়, সমস্ত ইবাদতের কষ্ট তোমার থেকে তুলে নেওয়া হলো।

আলোর মধ্যে থেকে এই আওয়াজ এলো। যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তোমার ইবাদত এ পর্যায়ে কবুল হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তোমার আর ইবাদত করতে হবে না। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. যখন এ নূর দেখলেন এবং এ আওয়াজ শুনলেন, তখন সাথে সাথে তিনি উত্তরে বললেন,

'হতভাগা! দূর হ, আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিস। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামা থেকে তো ইবাদত মাফ হয়নি, তাঁর উপর থেকে ইবাদতের দায়িত্ব রহিত হয়নি, আর আমার থেকে রহিত হচ্ছে। তুই আমাকে ধোঁকা দিতে চাস।'

দেখুন, শয়তান কতো বড়ো আক্রমণ করেছে! তার অন্তরে যদি ইবাদতের অহংকার চলে আসতো, তাহলে সেখানেই পদস্খলন ঘটতো। যেসব লোক অনেক বেশি কাশফ ও কারামতের পিছনে লেগে থাকে, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে তো শয়তানের এটা উত্তম আক্রমণ ছিলো। কিন্তু তিনি তো ছিলেন শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.। অবিলম্বে তিনি বুঝে ফেললেন যে, এ কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে না। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর থেকে ইবাদতের দায়িত্ব লোপ পায়নি। তাহলে আমার উপর থেকে কি করে লোপ পায়?

শয়তানের দ্বিতীয় আক্রমণ

অল্পক্ষণ পর আরেকটা নূর ভেসে উঠলো। দিগন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই নূরের মধ্যে থেকে আওয়াজ এলো-

হে আব্দুল কাদের! তোমার ইলম আজ তোমাকে রক্ষা করেছে। অন্যথায় কতো আবেদকে যে আমি এই আক্রমণ দ্বারা ধ্বংস করেছি, তার হিসাব নেই।

হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. পুনরায় বললেন,

'হতভাগা আবারও আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিস। আমার ইলম আমাকে রক্ষা করেনি, আল্লাহর অনুগ্রহ আমাকে রক্ষা করেছে।'

এই দ্বিতীয় আক্রমণ ছিলো প্রথম আক্রমণের চেয়ে বিপদজনক ও মারাত্মক। কারণ, এর মাধ্যমে তার মধ্যে ইলমের অহমিকা ও গর্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো।

দ্বিতীয় আক্রমণ ছিলো অধিক মারাত্মক

হযরত শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন যে, প্রথম আক্রমণ অধিক মারাত্মক ছিলো না। কারণ, যার কাছে সামান্য শরীয়তের ইলম থাকবে, সেও এ কথা বুঝতে পারবে যে, জীবনে যতোক্ষণ হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষের ইবাদত মাফ হতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় আক্রমণটি ছিলো অতি মারাত্মক। কতো মানুষ যে, এই আক্রমণে বিপথগামী হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কারণ, এর মাধ্যমে ইলমের অহংকার সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য ছিলো, যা একটি সূক্ষ্ম বিষয়।

অন্তর থেকে অহংকার বের করে দাও

এ কারণে হযরত থানভী রহ. বলেন যে, এ অহংকারের চিকিৎসা এই যে, মানুষ চিন্তা করবে যে, বড়ো বড়ো আলেম, বুযুর্গ, ইবাদতগুজার, মুত্তাকী ও পরহেযগারও যখন অহংকারে লিপ্ত হয়েছে, তখন তাদের পরিণতি মারাত্মক হয়েছে, না'উযুবিল্লাহ। তাই অন্তর থেকে অহংকার বের করে দাও। তুমি যদি দীনের পথে লেগে থাকো, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, তুমি মানুষকে হেয় জ্ঞান করতে থাকবে এবং সকলকে জাহান্নামী মনে করতে থাকবে।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

'যে ব্যক্তি বলে যে, সারা দুনিয়ার মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, সে অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত।'[৪]

যে ব্যক্তির নিজের দোষ চোখে পড়ে না, বরং সারা দুনিয়ার মানুষের দোষ তালাশ করে এবং তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ।

অহংকারের চিকিৎসা আল্লাহমুখী হওয়া

যখনই অন্তরে নিজের ইবাদত, ইলম, যুহ্দ ও দান-খয়রাতের চিন্তা জাগবে, সাথে সাথে আল্লাহর দিকে রুজু হবে এবং বলবে, হে আল্লাহ! এ কাজ আমার সাধ্যভুক্ত ছিলো না। আপনার দেওয়া তাওফীকের ফলে আমি এ কাজ করতে পেরেছি। তাই আমি আপনার শোকর আদায় করছি। একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু হওয়াতেই শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারবে। একই সাথে নিজের দোষের কথা চিন্তা করবে। যখন আল্লাহমুখী হওয়া এবং নিজের দোষের কথা চিন্তা করা এই দুই বিষয় একত্রিত হবে, তখন অহংকার সৃষ্টি হবে না।

অতিরঞ্জিত বিনয়

এ মালফূযে হযরত বলেন, যারা দ্বীনের কাজ করে, তাদের মধ্যে একদিকে অহংকার সৃষ্টি হয়, আবার কতক সময় এর সম্পূর্ণ বিপরীত অতিরঞ্জিত বিনয় সৃষ্টি হয়। বিনয় ভালো জিনিস, কিন্তু তাও সীমার মধ্যে থাকা উচিত। সীমা অতিক্রম করে গেলে এটাও ক্ষতিকর।

অতিরঞ্জিত বিনয়ের একটি ঘটনা

এ সম্পর্কে হযরত থানভী রহ. তাঁর ওয়াজের মধ্যে তাঁর দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি রেল গাড়িতে সফর করছিলাম। আরো কিছু লোকও আমার নিকট বসা ছিলো। খানা খাওয়ার সময় হলে তারা

---

৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৫৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৩১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭৩৬০, মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, হাদীস নং ১৫৫৯

তাদের খাবার বের করলো। দস্তরখান বিছালো। সাথীদেরকে একত্রিত করে খানা খেতে আরম্ভ করলো। আমরা যেমন বিনয়ের সাথে বলি যে, আসুন আপনিও ডাল-রুটি খান। সেভাবে তারাও পাশে বসা ব্যক্তিকে বিনয়ের সাথে বললো যে, আপনিও কিছু গু-মোত খান। তারা বিনয়ের কারণে নিজেদের খাবারকে গু-মোত বললো। না'উযুবিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার রিযিককে গু-মোত বলা এটা অতিরঞ্জিত বিনয়। বিনয়ের ফলে এমন কাজ করা, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের না-শোকরি, হেয় প্রতিপন্ন ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হয়, এটা খারাপ জিনিস। সীমাতিরিক্ত বিনয় অকৃতজ্ঞতা। কারণ, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তাকদীরের উপর আপত্তি করা হয়। এটা অতি মারাত্মক বিষয়।

নিজের নামাযকে 'ঠোকর মারা' বলো না

অতিরঞ্জিত এই বিনয় মানুষকে নিরাশ করে। মানুষের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। যেমন, আপনারা মানুষের মুখে শুনে থাকবেন- 'আরে আমাদের নামায আর কি, কয়েকটা ঠোকর মারি।' নামায পড়াকে 'ঠোকর মারা' বলা অতিরঞ্জিত বিনয়। এমন করা উচিত নয়। আল্লাহর দেওয়া তাওফীকের শোকর আদায় করা উচিত যে, তিনি তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। কতো মানুষ এমন আছে, আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার তাওফীকও যাদের লাভ হয়নি। এ জন্যে কেন এ নামাযের অবমূল্যায়ন ও না-শোকরি করো? এ কথা ঠিক যে, তোমার নামাযের মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সে ত্রুটি তোমার। আর তাওফীক দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। এ জন্যে প্রথমে তাওফীকের শোকর আদায় করো। তারপর ত্রুটির জন্যে ইস্তিগফার করো। আল্লাহ তা'আলাকে বলো- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নামায পড়ার তাওফীক দান করেছিলেন, কিন্তু আমি সেই নামাযের হক আদায় করিনি। আসতাগফিরুল্লাহ। প্রথমে ইবাদতের তাওফীকের উপর শোকর আদায় করো, তারপর নিজের ত্রুটির জন্যে ইস্তিগফার করো। এ কথা বলো না যে, আমার নামায তো ঠোকর মারা। এ কথা বলা মোটেই ঠিক নয়।

ত্রুটির জন্যে ইস্তিগফার করো

তুমি নিজের ত্রুটির জন্যে ইস্তিগফার করলে যিনি ইবাদত করার তাওফীক দিয়েছেন, তিনি তোমার ইস্তিগফার কবুল করে ঐ ইবাদতের মধ্যে পূর্ণতাও

দান করবেন, ইনশাআল্লাহ। আরে এমন কোনো মানুষ আছে কি, যে আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় করতে পারে? আমি আর তুমি তো দূরের কথা, রাতের তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেই নবীর পা ফুলে যেতো, তিনি বলছেন,

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

'আমরা আপনার ইবাদতের হক আদায় করতে পারিনি।'[৫]

তিনি যখন এ কথা বলছেন, তখন আমরা কী করে তাঁর ইবাদতের হক আদায় করতে পারি! আমাদের সব ইবাদতই তো তাঁর তুলনায় ত্রুটিপূর্ণ হবে। কিন্তু তিনি যখন তাঁর দুয়ারে আসার তাওফীক দিয়েছেন, তাঁর চৌকাঠে সেজদা করার তাওফীক দান করেছেন, তখন তাঁর সম্পর্কে এ বদগুমানী কেন করছো যে, তিনি এ সেজদা কবুল করবেন না! কেমনে তোমরা সেজদার অবমূল্যায়ন করে বলো যে, এটা নাপাক সেজদা! যখন তুমি তাঁর দেওয়া তাওফীকের শোকর আদায় করে ইস্তিগফার করবে এবং বলবে যে, হে আল্লাহ এ ইবাদতে যা কিছু ত্রুটি হয়েছে, আপনি দয়া করে তা মাফ করে দিন, তখন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে ভুল ত্রুটি-মাফ করে দিবেন।

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ.-এর একটি ঘটনা

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ.-এর সামনে যখন কেউ এসে বলতো যে, 'আমি কি আর নামায পড়ি, কয়েকটা ঠোকর মারি।' তিনি এসব কথায় খুব ভয় পেতেন। সুতরাং এক ব্যক্তি এসে হযরতের কাছে বললো যে, হযরত আমার নামায আর কি! সেজদা আর কি! সেজদার মধ্যে প্রবৃত্তির অনেক পঁচা পঁচা কামনা-বাসনা জাগ্রত হয়। আমার এ নামায তো আল্লাহর সামনে পেশ করার উপযুক্ত নয়।

হযরত বললেন, আচ্ছা তোমার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দিয়ে ভরা এ সেজদা তো অত্যন্ত নাপাক।

সে বললো, হ্যাঁ, অত্যন্ত নাপাক সেজদা।

হযরত বললেন, আচ্ছা এমন নাপাক সেজদা তুমি আমাকে করো। কারণ খাহেশাতপূর্ণ এ সেজদা আল্লাহর সামনে পেশ করার উপযুক্ত নয়, এ জন্যে এ সেজদা আল্লাহকে না করে আমাকে করো।

---

৫. মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ১৫০২, শোয়াবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬৬

সে বললো, হযরত এ আপনি কেমন কথা বলছেন! আমি আপনাকে সেজদা করবো!

হযরত বললেন, এটা যেহেতু নাপাক সেজদা এবং আল্লাহকে করার উপযুক্ত নয়, তাই আমাকে করে দেখাও!

লোকটি বললো, হযরত এটা হতে পারে না। আমি অন্য কাউকে সেজদা করতে পারি না।

হযরত বললেন, এ সেজদা যখন অন্য কোথাও হতে পারে না, তাই বুঝা গেলো, এ সেজদা তাঁর জন্যেই। এ কপাল অন্য কোথাও ঠেকতে পারে না। এ সেজদা অন্য কোথাও হতে পারে না। এ মাথা অন্য কোনো চৌকাঠে নত হতে পারে না। এ সেজদা তো তাঁর জন্যেই এবং তাঁরই তাওফীকে লাভ হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের ভুল-ত্রুটির কারণে এ সেজদা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এ জন্যে ইস্তিগফার করো। কিন্তু এ কপাল তো সেখানেই ঠেকবে। কবি কতো চমৎকার বলেছেন,

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے

وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے

'কবুল হোক বা না হোক, তারপরেও তা নেয়ামত,
এ সেজদা, তোমার চৌকাঠের সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে।'

এ সেজদা কোনো মামুলী জিনিস নয়। সেজদা সম্পর্কে উল্টা-সিধা মন্তব্য করো না। আল্লাহর দেওয়া তাওফীকের শোকর আদায় করো।

ইবাদত ছাড়ানোর পদ্ধতি

শয়তান অতিরঞ্জিত এই বিনয় সৃষ্টি করে বিপথগামী করে থাকে। অন্তরে এই চিন্তা জাগ্রত করে যে, আমি তো অহংকারের রোগে আক্রান্ত নই। কারণ, আমি তো আমার নামাযকে কিছুই মনে করি না এবং সাথে সাথে বিনয়ও অবলম্বন করছি। কিন্তু এ চিন্তা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন ক্রমান্বয়ে অন্তরে নৈরাশ্য সৃষ্টি করে যে, ইবাদত করা তোমার সাধ্যভুক্ত নয়। তোমার নামায কখনোই কবুল হতে পারে না। যখন কবুলই হবে না, তখন পড়ে লাভ কি? তাই নামায ছেড়ে দাও। ঘরে বসে থাকো। এভাবে শয়তান নামায ছাড়িয়ে থাকে।

ইবাদতের জন্যে শোকর আদায় করুন

ভালোভাবে মনে রাখুন! যখনই আল্লাহ তা'আলা কোনো আমল করার তাওফীক দিবেন, তার জন্যে শোকর আদায় করুন। সাথে এ কথাও বলুন যে, হে আল্লাহ! আপনার দেওয়া তাওফীকেই আমি এ ইবাদত সম্পাদন করেছি। তবে আমার পক্ষ থেকে অনেক ভুল-ত্রুটি হয়েছে, আপনি দয়া করে সেগুলো মাফ করে দিন। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন,

لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

'হে আল্লাহ! যদি আপনার দেওয়া তাওফীক না হতো, তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। আপনার দেওয়া তাওফীক না হলে আমরা দান করতে পারতাম না এবং নামায পড়তে পারতাম না।'[৬]

যাকিছু হয়েছে, তা আপনার দেওয়া তাওফীকেই হয়েছে। এ জন্যে এই তাওফীকের আমরা শোকর আদায় করছি। নিজের ভুল-ত্রুটির কারণে ইস্তিগফার করছি। এ দুটা বিষয় যদি আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে অহংকারও সৃষ্টি হবে না, অতিরঞ্জিত বিনয়ও সৃষ্টি হবে না। যা শয়তানের দুটি অস্ত্র।

শয়তানের মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী শব্দ

আমি আমার শাইখের নিকট হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর এ উক্তি শুনেছি যে, কোনো ব্যক্তি যদি নেক আমল করে 'আলহামদুলিল্লাহ' ও 'আসতাগফিরুল্লাহ'[৭] বলে, তখন শয়তান বলে যে, সে আমার কোমর ভেঙে দিয়েছে। কারণ 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার দ্বারা তাওফীক লাভের শোকর আদায় হয়। এর দ্বারা অহংকারের মূল কেটে যায়। এবং 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলার দ্বারা অতিরঞ্জিত বিনয়ের ফলে যেসব ত্রুটির উপর নযর পড়ছিলো, সেগুলোর শিকড় কেটে যায়। এভাবে উভয়ের চিকিৎসা হয়ে যায়। এজন্যে

৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬২৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৬৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৭৫৫

৭. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭১, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩০০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩৮৫

প্রত্যেক নামাযের এবং প্রত্যেক নেক আমলের পর 'আলহামদুলিল্লাহ' ও 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলুন। সাথে আরো বলুন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নেক আমলের তাওফীক দান করেছেন, এ কারণে আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলছি। আর এ আমলের মধ্যে আমার পক্ষ থেকে যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তার জন্যে আমি 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলছি। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন। আমাদের হযরত বলতেন যে, হা-হুতাশ করার প্রয়োজন নেই। যে কোনো ইবাদত করার পর এই দু'আ পড়বে। ইনশাআল্লাহ, শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বড়োদের আনুগত্য ও আদবের দাবি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ السَّعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهٗ، أَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ أُنَاسٍ مَّعَهٗ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلٰوةُ.....

মানুষের মাঝে আপোস করানোর বর্ণনা চলছে। এ অধ্যায়ের তিনটি হাদীস ইতিপূর্বে চলে গিয়েছে। এটি এ অধ্যায়ের শেষ হাদীস। যা একটু দীর্ঘ। এ কারণে এর অর্থ ও ব্যাখ্যা পেশ করছি।

মানুষের মাঝে আপোস করানো

হযরত সাহল ইবনে সা'দ আসসায়েদী রাযি. বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন যে, বানী আমর ইবনে আউফ কবীলার মাঝে পরস্পরে ঝগড়া দেখা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে আপোস করানোর উদ্দেশ্যে

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ৩ পৃঃ ২২২-২৩৪, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, জুমাবার, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

তাশরীফ নিয়ে যান। কতিপয় সাহাবীকেও তিনি সঙ্গে নেন, যাতে তার আপোস স্থাপনের কাজে সহযোগিতা করেন। আপোস করতে গিয়ে কথা দীর্ঘ হয়ে যায়। এতো দেরি হয় যে, নামাযের সময় ঘনিয়ে আসে। অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে যে সময় নামায পড়িয়ে থাকেন, সে সময় চলে আসে। কিন্তু যেহেতু তিনি তখনও অবসর হতে পারেননি, তাই মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনতে পারেননি।[১]

এখানে এ হাদীস আনার উদ্দেশ্য এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে ঝগড়া নিরসন ও সন্ধি স্থাপনকে এতো গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ কাজে এতো নিমগ্ন হয়েছেন যে, নামাযের নির্ধারিত সময় চলে এসেছে অথচ তিনি মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনতে পারেননি।

বর্ণনাকারী বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন হযরত বেলাল রাযি. যখন দেখলেন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনেননি, তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর নিকট গেলেন এবং নিবেদন করলেন- জনাব আবু বকর সিদ্দীক! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিলম্ব হচ্ছে, নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে। হতে পারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কিছু বিলম্ব হবে। মানুষ নামাযের প্রতীক্ষায় আছে। আপনার জন্যে কি ইমামতি করা সম্ভব? হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বললেন, তুমি চাইলে তা হতে পারে। আমরা নামায পড়ে নেই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হয়তো বিলম্ব হয়েছে। তারপর হযরত বেলাল রাযি. তাকবীর বললেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ইমামতির জন্যে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. নামায শুরু করার জন্য 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং লোকেরাও তাকবীর বললো। যখন নামায শুরু করলেন, তখন নামায চলাকালীন অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং কাতারের মাঝে মুক্তাদি হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা যখন দেখলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযি. সম্মুখে থাকার কারণে তাঁর আগমণ সম্পর্কে জানতে পারেননি, তখন লোকেরা মনে করলো- এখন আবু বকর সিদ্দীককে জানানো উচিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন, যাতে তিনি পিছনে সরে আসেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৫৮, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৭৭৬

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখে গিয়ে নামায পড়ান। মানুষের মাসআলা জানা না থাকায় হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি.-কে অবগত করার জন্যে তারা নামাযের মধ্যে তালি বাজাতে আরম্ভ করে, এভাবে তাকে সতর্ক করতে থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি যখন নামায আরম্ভ করতেন, তখন দুনিয়ার কোনো কিছুর ব্যাপারে তাঁর খবর থাকতো না। ডানে বামে কি হচ্ছে সেদিকে তিনি মনোযোগ দিতেন না। এ কারণে শুরুর দিকে যখন দু'-একজন তালি বাজিয়েছে, তখন আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বুঝতে পারেননি। তিনি তাঁর নামাযের মধ্যে মগ্ন থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন দেখলেন যে, আবু বকর সিদ্দীক রাযি. মনোযোগ দিচ্ছেন না, তখন লোকেরা আরো জোরে তালি বাজাতে আরম্ভ করে। যখন কয়েকজন সাহাবী তালি বাজাতে থাকে এবং আওয়াজ উঁচু হতে থাকে, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কিছুটা সজাগ হন এবং চোখের কোণ দিয়ে ডানে বামে দেখতে আরম্ভ করেন। হটাৎ দেখেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারির মধ্যে তাশরীফ এনেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারির মধ্যে দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. পিছু হটতে চাইলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, তুমি নিজের জায়গায় থাকো। পিছনে সরে আসার প্রয়োজন নেই। নামায পুরা করো।

কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। এ জন্যে উল্টা পায়ে পিছন দিকে সরে আসতে আরম্ভ করেন। এমনকি সারির মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে যান। হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখে জায়নামাযের উপর তাশরীফ নিয়ে যান। অবশিষ্ট নামায হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ান।

ইমামকে সতর্ক করার পদ্ধতি

নামায শেষ হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মুখোমুখি হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, এটা কোন্ পদ্ধতি যে, নামাযের মধ্যে কোনো ঘটনা দেখা দিলে তোমরা তালি বাজাতে আরম্ভ করো। এটা নামাযের মর্যাদার উপযোগী পদ্ধতি নয়। তালি বাজানো মহিলাদের জন্যে শরীয়তসম্মত। অর্থাৎ, এমনিতে মহিলাদের জামাত পছন্দনীয় নয়, তবে

মহিলারা যদি নামাযের মধ্যে শামিল হয় আর তারা ইমামকে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করতে চায়, তখন তাদের জন্যে হাতের উপর হাত মেরে তালি বাজানোর বিধান রয়েছে। তাদের জন্যে নামাযের মধ্যে মুখে 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা ভালো নয়। কারণ, এভাবে মহিলার আওয়াজ পুরুষের কানে চলে যাবে। শরীয়তে মহিলার আওয়াজেরও পর্দা রয়েছে। তাই তাদের জন্যে বিধান এই যে, নামাযের মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটলে হাতের উপর হাত মেরে ইমামকে মনোযোগী করবে। কিন্তু যদি পুরুষদের জামাতের মধ্যে কোনো ঘটনা দেখা দেয়, আর সে কারণে ইমামকে মনোযোগী করতে হয়, সে ক্ষেত্রে তাদের জন্যে পদ্ধতি হলো তারা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। যেমন ইমামের বসা উচিত ছিলো, মুক্তাদিরা দেখছে যে, ইমাম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তখন মুক্তাদীদের 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা উচিত। বা ইমামের দাঁড়ানো উচিত ছিলো, কিন্তু বসে গিয়েছে তখনও 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। কিংবা জোরে আওয়াজের নামাযে ইমাম আস্তে কেরাত পড়তে আরম্ভ করলে তখনও 'আলহামদুলিল্লাহ' ইত্যাদি বলে তাকে সতর্ক করবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, যদি নামাযের মধ্যে এমন কোনো ঘটনা দেখা দেয়, যার ফলে ইমামকে সতর্ক করতে হয়, তাহলে মুক্তাদী 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, তালি বাজানো উচিত নয়।

আবু কোহাফার বেটার এ সাধ্য ছিলো না

তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, হে আবু বকর! আমি তো আপনাকে ইশারা করেছিলাম যে, আপনি নামায চালু রাখুন, পিছনে সরে আসবেন না। এর পর কী কারণ ঘটলো যে, আপনি পিছনে সরে আসলেন এবং ইমামতি করতে দ্বিধা করলেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কী বিস্ময়কর উত্তর দিলেন! তিনি বললেন,

مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'হে আল্লাহর রাসূল! আবু কোহাফার বেটার সাধ্য নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমানে মানুষের ইমামতি করে।' আবু কোহাফা তাঁর বাবার নাম। অর্থাৎ, আমার সাধ্য নেই যে, আপনার উপস্থিতিতে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ইমামতি করি। যখন আপনি ছিলেন না,

তখন ছিলো ভিন্ন কথা। কিন্তু যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আর আমার সাধ্য ছিলো না যে, ইমামতি অব্যাহত রাখি। এ কারণে আমি পিছনে সরে এসেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার উপর আর কোনো আপত্তি করলেন না, বরং নীরবতা অবলম্বন করলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর মাকাম

এর দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর মাকাম জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এ পর্যায়ে গেঁথে দিয়েছিলেন যে, তিনি বলেন, এটা আমার সাধ্যের বাইরে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি সামনে খাড়া থাকবো। যদিও এ ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে ঘটেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে তিনি সামনে দাঁড়াননি। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে আছেন, তখন সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সাধ্যের বাইরে ছিলো, এজন্যে তিনি পিছনে সরে এসেছেন।

আদবের গুরুত্ব অধিক, নাকি আদেশের?

এখানে একটি মাসআলা ও আদব বর্ণনা করছি, যা একটি মাসনূন আদব। আপনারা এ প্রসিদ্ধ উক্তি শুনে থাকবেন, اَلْأَمْرُ فَوْقَ الْأَدَبِ অর্থাৎ, সম্মানের দাবি এই যে, বড়ো কেউ কোনো বিষয়ের হুকুম দিলে তার উপর আমল করা আদবের পরিপন্থী হলেও এবং তার উপর আমল না করা আদবের দাবি হলেও ছোটর কাজ হলো ঐ হুকুম তামিল করা। এটা অত্যন্ত নাজুক বিষয় এবং অনেক সময় এর উপর আমল করা কঠিনও হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বীনের উপর আমলকারী সকল বুযুর্গের সবসময় এ আমলই ছিলো যে, যখন বড়ো কেউ কোনো কাজের হুকুম দিয়েছে, তখন তারা আদবের পরিবর্তে হুকুম তামিলকে অগ্রগণ্য করেছেন।

বড়োর হুকুমের উপর আমল করবে

উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন একজন বুযুর্গ ব্যক্তি কোনো এক বিশেষ আসনের উপর বসা আছেন, এমন সময় ছোট কেউ তার নিকট এলো। তখন ঐ বুযুর্গ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাই তুমি আমার কাছে এসে বসো।

তখন তার কথা মানা উচিত। যদিও আদবের দাবি হলো কাছে না বসে দূরে বসা। তার নিকট গিয়ে আসনের উপর বসা আদবের পরিপন্থী। বড়োর একেবারে নিকটে গিয়ে বসতে মনে সংকোচ লাগলেও বড়ো যখন হুকুম দিয়ে বলেছেন যে, এখানে চলে আসো, তখন তার হুকুম তামিল করাই সম্মানের দাবি। কারণ, আদবের তুলনায় হুকুম তামিল করা অগ্রগণ্য।

দ্বীনের সারকথা 'ইত্তিবা'

আমি বার বার বলেছি যে, পুরো দ্বীনের সারকথা হলো ইত্তিবা। বড়োর হুকুম মানা। তার আনুগত্য করা। আল্লাহর হুকুমের ইত্তিবা। তাঁর রাসূলের হুকুমের ইত্তিবা। তাঁর রাসূলের ওয়ারিসদের ইত্তিবা। তারা যা বলছেন তার উপর আমল করো। যদিও বাহ্যিকভাবে তোমার কাছে তা আদবের পরিপন্থী মনে হয়।

হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের মজলিসে আমার উপস্থিতি

রবিবার দিন হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের মজলিস হতো। কারণ, সে সময় রবিবারে ছিলো সরকারি ছুটি। এটা শেষ মজলিসের ঘটনা। এর পরে হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের আর কোনো মজলিস হয়নি। পরবর্তী মজলিসের দিন আসার পূর্বেই হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের ইন্তিকাল হয়ে যায়। ওয়ালেদ ছাহেব অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হওয়ার ফলে মানুষ তাঁর কক্ষে সমবেত হতো। ওয়ালেদ ছাহেব চারপায়ার উপর থাকতেন। মানুষ সামনে, নিচে ও সোফার উপর বসতো। সেদিন অনেক মানুষ আসে এবং কামরা ভরে যায়। এমনকি কিছু লোক দাঁড়িয়েও থাকে। আমি কিছু বিলম্বে পৌঁছি। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব আমাকে দেখে বললেন যে, তুমি এখানে আমার নিকট চলে আসো। আমি কিছুটা সংকোচ করতে লাগলাম যে, মানুষ ডিঙ্গিয়ে যাবো এবং হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট বসবো! যদিও এ কথা আমার মাথায় ছিলো যে, বড়ো কোনো কথা বললে তা মানা উচিত। কিন্তু আমি কিছুটা ইতস্ত করতে লাগলাম। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব যখন আমার ইতস্ত ভাব দেখলেন, তখন পুনরায় বললেন, তুমি এখানে আসো, তোমাকে একটা ঘটনা শোনাবো। যাই হোক, কোনো রকমে আমি সেখানে পৌঁছলাম এবং হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের নিকট বসলাম।

হযরত থানভী রহ.-এর মজলিসে ওয়ালেদ ছাহেবের উপস্থিতি

ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, একবার হযরত থানভী রহ.-এর মজলিস হচ্ছিলো। সেখানেও এরকমই ঘটনা ঘটে যে, জায়গা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং ভরে যায়। আমি কিছুটা দেরিতে পৌছি। তখন হযরত থানভী রহ. বললেন, তুমি এখানে আমার নিকট চলে আসো। আমি কিছুটা ইতস্ত করতে লাগলাম যে, একেবারে হযরতের নিকট গিয়ে বসবো! তখন হযরত পুনরায় বললেন, তুমি এখানে আসো, তোমাকে একটি ঘটনা শোনাবো। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বলেন, তারপর আমি কোনো রকমে সেখানে পৌছলাম। হযরতের নিকটে গিয়ে বসলাম। তখন হযরত একটি ঘটনা শোনালেন।

আলমগীর ও দারাশিকোর মাঝে সিংহাসন লাভের ফয়সালা

ঘটনা এই শোনালেন যে, মোঘল সম্রাট আলমগীরের পিতার ইন্তিকালের পর তার স্থলাভিষিক্তের বিষয় সামনে আসে। তারা ছিলেন দুই ভাই। এক আলমগীর, আরেক দারাশিকো। পরস্পরে রেশা রেশি ছিলো। আলমগীরও তার বাবার স্থলাভিষিক্ত ও বাদশাহ হতে চাচ্ছিলেন। তার ভাই দারাশিকোও সিংহাসনের প্রার্থী ছিলেন। সে সময় একজন বুযুর্গ ছিলেন। উভয়ে চাইলেন ঐ বুযুর্গের নিকট গিয়ে নিজের পক্ষে দু'আ করাবেন। প্রথমে দারাশিকো ঐ বুযুর্গের যিয়ারত ও দু'আর জন্যে গেলেন। তখন ঐ বুযুর্গ আসনের উপর বসা ছিলেন। ঐ বুযুর্গ দারাশিকোকে বললেন, এখানে আমার নিকটে চলে আসো এবং আসনের উপর বসো। দারাশিকো বললেন, না হযরত! আমার সাধ্য নেই যে, আপনার নিকট আসনের উপর বসবো। আমি তো এখানে নিচেই ঠিক আছি। ঐ বুযুর্গ আবার বললেন, আমি তোমাকে ডাকছি, এখানে চলে আসো। কিন্তু তিনি মানলেন না। তার নিকট গেলেন না। সেখানেই বসে থাকলেন। ঐ বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা। তারপর ঐ বুযুর্গের যেই নসীহত করার ছিলো তা করলেন, তিনি ফিরে গেলেন।

তার চলে যাওয়ার কিছু সময় পর আলমগীর রহ. এলেন। তিনি নিচে বসতে চাইলে ঐ বুযুর্গ বললেন, তুমি এখানে আমার নিকট চলে আসো। তিনি অবিলম্বে উঠলেন এবং ঐ বুযুর্গের নিকট গিয়ে আসনের উপর বসলেন। তারপর তার যা নসীহত করার ছিলো তা করলেন। আলমগীর চলে গেলে ঐ

বুযুর্গ মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, ঐ দুই ভাই তো নিজেরা নিজেদের ফয়সালা করলো। দারাশিকোকে আমি আসন পেশ করেছিলাম, সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আর আলমগীরকে পেশ করলে সে তা গ্রহণ করেছে। এ জন্যে উভয়ের ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। এখন রাজসিংহাসন আলমগীরই লাভ করবে। সুতরাং তিনিই লাভ করেন। এ ঘটনা হযরত থানভী রহ. হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে শোনান।

টালবাহানা ও হুজ্জতগিরি করা উচিত নয়

এটা তো ছিলো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। মোটকথা, আদব হলো বড়ো যখন বলছে এই কাজ করো, তখন তার মধ্যে বেশি টালবাহানা ও হুজ্জতগিরি করা ঠিক নয়। তখন গিয়ে বসা সম্মানের দাবি। কারণ, বড়োর হুকুম তামিল করা আদবের উপর অগ্রগণ্য।

বুযুর্গদের জুতা বহন করা

অনেক সময় মানুষ কোনো বুযুর্গের জুতা বহন করতে চায়, তখন যদি ঐ বুযুর্গ জোর দিয়ে বলেন যে, এটা আমার পছন্দ নয়, তখনও সম্মানের দাবি এই যে, জুতা রেখে দিবে, ওঠাবে না। অনেক সময় মানুষ এ ব্যাপারে কাড়াকাড়ি শুরু করে, নাছোড় হয়ে যায়, এটা সম্মানের পরিপন্থী। এজন্যে উক্তি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, اَلْاَمْرُ فَوْقَ الْاَدَبِ 'হুকুম তামিল করা আদবের দাবির উপর অগ্রগণ্য।' বড়ো যা বলে তা মেনে নাও। হ্যাঁ, দুই-একবার বুযুর্গকে এ কথা বলায় সমস্যা নেই যে, হযরত আমাকে এ খেদমতের সুযোগ দিন। কিন্তু বড়ো যখন হুকুমই দিয়ে দিলো, তখন হুকুম তামিল করাই ওয়াজিব। তাই করা উচিত। সাধারণ অবস্থার নিয়ম এটাই। যে কাজের হুকুম দেওয়া হবে, সে অনুপাতে কাজ করবে। সাহাবায়ে কেরামের নিয়মও তাই ছিলো।

সাহাবায়ে কেরামের দুটি ঘটনা

কিন্তু এ ঘটনায় আপনারা দেখতে পেলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে বললেন, তুমি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক রাযি. পিছনে সরে আসলেন। আদবের চাহিদার উপর আমল করলেন। হুকুম মানলেন না। এ

ধরনের ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের পুরো যুগে মাত্র দুটি পাওয়া যায়। যার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম আদবের দাবিকে হুকুম তামিলের উপর অগ্রগণ্য রেখেছেন।

'আল্লাহর কসম মুছবো না'

এক তো হলো এই ঘটনা। আরেকটি ঘটনা, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মক্কার কাফেরদের মধ্যে যখন সন্ধিপত্র লেখানো হচ্ছিলো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি লেখো। তিনি বললেন, ঠিক আছে। যখন সন্ধির শর্তসমূহ লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন হযরত আলী রাযি. সন্ধিপত্রের উপর লিখলেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। তখন কাফেরদের পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি সন্ধির শর্ত পুরা করতে এসেছিলো, সে বললো, না আমি তো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে দেবো না। যেহেতু এ সন্ধিপত্র উভয় পক্ষ থেকে, তাই এর মধ্যে এমন বিষয় থাকা উচিত, যার উপর উভয় পক্ষ একমত। আমরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দ্বারা কাজ আরম্ভ করি না। আমরা তো 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লেখি। জাহেলিয়াতের যুগেও মানুষ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর পরিবর্তে 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লেখতো। অর্থাৎ, হে আল্লাহ আপনার নামে আমরা শুরু করছি। এ কারণে সে বললো, এটা মুছে দাও এবং 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লেখো। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে বললেন, আমাদের জন্যে এতোদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 'বিসমিকাল্লাহুম্মা'ও আল্লাহর নাম। ঠিক আছে ওটা মুছে এটা লিখে দাও। হযরত আলী রাযি. 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখে দিলেন। তারপর হযরত আলী রাযি. লিখতে আরম্ভ করলেন- এই চুক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মক্কার সর্দারদের মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। কাফেরদের পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি ছিলো, সে আবারো আপত্তি করলো যে, আপনারা মুহাম্মাদ শব্দের সঙ্গে 'রাসূলুল্লাহ' কেন লিখলেন? আমরা যদি আপনাকে রাসূলুল্লাহ মেনেই নেই তাহলে আর ঝগড়া কিসের? সব ঝগড়া তো এ বিষয়ের উপরেই যে, আমরা আপনাকে রাসূল মানি না। এজন্যে যেই চুক্তিপত্রে আপনি মুহাম্মাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহও লিখবেন, আমি তার উপর দস্তখত করবো না। আপনি শুধু লিখবেন- এই চুক্তিপত্র মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ও কুরাইশদের সর্দারদের মাঝে চূড়ান্ত হয়েছে। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে বললেন, ঠিক আছে,

কোনো ব্যাপার নয়, তুমি তো আমাকে আল্লাহর রাসূল মানো, মুহাম্মাদের সাথে রাসূলুল্লাহ শব্দ মুছে দাও এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখে দাও। হযরত আলী রাযি. প্রথম বিষয় তো মেনে নিয়েছিলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর স্থলে 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লিখে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কেটে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখে দাও, তখন হযরত আলী রাযি. অবিলম্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন,

وَاللّٰهِ لَا أَمْحُوْهُ

'খোদার কসম! আমি 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ মুছবো না।'

হযরত আলী রাযি. মুছতে অস্বীকার করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার আবেগ উপলব্ধি করলেন এবং বললেন, আচ্ছা তুমি না মুছলে আমাকে দাও। আমি নিজ হাতে মুছে দেবো। সুতরাং তিনি চুক্তিপত্র তার থেকে নিয়ে নিজ পবিত্র হাতে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ মুছে দিলেন।[২]

হুকুম মান্য করা যদি ক্ষমতার বাইরে চলে যায়

এখানেও একই ঘটনা ঘটে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে যে হুকুম দিয়েছিলেন, তিনি তা মানতে অস্বীকার করেন। এতে বাহ্যত মনে হয় যে, তিনি আদবকে হুকুমের উপর অগ্রগামী করেছেন। অথচ হুকুম আদবের উপর অগ্রগামী। এর স্বরূপ ভালো করে বুঝে যে, আসল নিয়ম তো ঐটাই যে, বড়ো যা বলবে, তা মানবে, তা পালন করবে। কিন্তু কতক সময় মানুষ কোনো অবস্থার সামনে এমনভাবে পরাভূত হয়ে যায় যে, তার জন্যে হুকুম তালিম করা ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। কেননা তার মাঝে এ কাজ করার শক্তিই থাকে না। তখন যদি সে ঐ কাজ থেকে সরে আসে, তাহলে তার উপর আপত্তি করা হবে না যে, সে বিরুদ্ধাচরণ করেছে, বরং তার উপর এই হুকুম লাগানো হবে যে,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না।'[৩]

---

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫২৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৩৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬২১

৩. বাকারাহ : ২৮৬

প্রথম ঘটনায় তো হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. নিজেই বলেছেন যে, এ কাজ আমার সাধ্যের বাইরে ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন আর আবু কোহাফার বেটা ইমামতি করবে। আর দ্বিতীয় ঘটনায় হযরত আলী রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে এতোই পরাভূত ছিলেন যে, মুহাম্মাদ নাম থেকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ মুছে দেওয়া তার সাধ্যের বাইরে ছিলো, এ কারণে তিনি মুছে দিতে অস্বীকার করেছেন।

'বন্ধু যে অবস্থায় রাখেন, সেটাই ভালো অবস্থা'

তবে আসল হুকুম ঐটাই যে, বন্ধু যে কথা বলবে তা মানবে, নিজের মত চালাবে না। তিনি যেভাবে বলেন, সেভাবেই আমল করবে। কবি বলেন,

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے
عشق تسلیم و رضا کے ماسوا کچھ بھی نہیں
وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں

'না বিচ্ছেদ ভালো, না মিলন,
বন্ধু যে অবস্থায় রাখেন, সেটাই ভালো।
সন্তোষ ও সমর্পণ ছাড়া প্রেম আর কিছু নয়,
বিশ্বস্ততায় তিনি খুশি না হলে বিশ্বস্ততা কিছুই নয়।'

তিনি যদি এমন কাজ করাতেই খুশি হন, যা বাহ্যিকভাবে আদবের খেলাফ, তখন ঐটাই উত্তম, যাতে তিনি সন্তুষ্ট, যার মধ্যে তা. সম্মতি।

সারকথা

মোটকথা, ইমাম নববী রহ. এখানে যে হাদীস এনেছেন, তা এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যে এনেছেন যে, মানুষের ঝগড়া মেটানো এবং তাদের মাঝে সন্ধি স্থাপনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতো গুরুত্ব ছিলো যে, নামাযের নির্ধারিত যে সময় ছিলো, তা থেকে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়, কিন্তু তারপরেও তিনি এ কাজে মশগুল থাকেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে পারস্পরিক ঝগড়া থেকে হেফাজত করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বড়োদেরকে সম্মান করুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ

'যখন তোমাদের নিকট কোনো সম্প্রদায়ের সম্মানিত মেহমান আসে তখন তোমরা তার সম্মান করবে।'[১]

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সম্প্রদায়ের সর্দার বা পদাধিকারী হয়ে থাকে এবং তাকে ঐ সম্প্রদায়ের সম্মানিত মনে করা হয়, সে যখন তোমাদের নিকট আসবে, তখন তোমরা তাকে সম্মান করবে।

সম্মানের একটি ধরন

শরীয়তে তো প্রত্যেক মুসলমানকেই সম্মান করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। যে কোনো মুসলমান এলে তাকে সম্মান করা এবং তার মর্যাদা রক্ষা করা তার হক। হাদীস শরীফে এতোটুকু পর্যন্ত এসেছে যে, আপনি যদি কোনো জায়গায় বসা থাকেন, আর কোনো মুসলমান আপনার সাথে দেখা করতে আসে, তাহলে তার আগমনের সুবাদে কমপক্ষে একটু নড়ে হলেও বসবেন।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১০, পৃঃ ২২১-২৩৪, আসরের নামাযের পর বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ,করাচী

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭০২

এমন যেন না হয় যে, একজন মুসলমান ভাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলো, কিন্তু আপনি নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়লেন না, মূর্তির ন্যায় বসে থাকলেন। এটা তার সম্মানের পরিপন্থী। এজন্যে কমপক্ষে নিজের জায়গা থেকে একটু নড়ে বসা উচিত। যাতে আগমনকারী ব্যক্তি অনুভব করে যে, আমি আসার ফলে সে আমাকে সম্মান করেছে।

সম্মানের জন্যে দাঁড়িয়ে যাওয়া

একটি পদ্ধতি হলো, অন্যের সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া। কোনো ব্যক্তি আপনার নিকট এলো আর আপনি তার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। শরীয়তে এর হুকুম এই যে, যে ব্যক্তি আগমন করলো সে যদি এ কথার প্রত্যাশা রাখে যে, মানুষ আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক তাহলে এমতাবস্থায় দাঁড়ানো ঠিক নয়। কারণ, এ বাসনা একথা চিহ্নিত করে যে তার মধ্যে অহংকার রয়েছে সে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এজন্যে সে চায় যে, অন্য মানুষ আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক। এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে শরীয়তে হুকুম এই যে, তার জন্যে দাঁড়াবে না। কিন্তু আগমনকারী ব্যক্তির মনে যদি এ বাসনা না থাকে যে, মানুষ আমার জন্যে দাঁড়াক, কিন্তু ঐ ব্যক্তির ইলম, পরহেযগারি বা পদের কারণে তার সম্মানার্থে আপনি দাঁড়িয়ে যান, তাহলে এতে কোনো দোষ নেই, কোনো গোনাহও নেই এবং দাঁড়ানো ওয়াজিবও নয়।

হাদীস দ্বারা দাঁড়ানোর প্রমাণ

খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক সময় সাহাবায়ে কেরামকে দাঁড়ানোর হুকুম দিয়েছেন। বনু কুরাইযার ফয়সালার জন্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত সা'দ ইবনে মুআয রাযি.-কে ডেকে পাঠান এবং তিনি আগমন করেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার লোকদেরকে বলেন,

قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ

'তোমাদের সর্দার আসছেন, তার জন্যে তোমরা দাঁড়িয়ে যাও।'[২]

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮১৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩১৪, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫৩৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১০৭৪২

বিধায় এমন ক্ষেত্রে দাঁড়ানো জায়েয। যদি না দাঁড়ায় তাতেও কোনো দোষ নেই। তবে হাদীসে এ বিষয়ে তাকিদ এসেছে যে, কারো আগমনে আপনি মূর্তির ন্যায় যেন বসে না থাকেন। নিজের জায়গা থেকে নড়াচড়া করবেন না এবং তার আগমনে খুশি প্রকাশ করবেন না, এমন যেন না হয়। তিনি বলেছেন, কমপক্ষে এতোটুকু তো করো যে, নিজের জায়গা থেকে একটু নড়ে বসো, যাতে আগমণকারী বুঝতে পারে যে, আমাকে সম্মান করেছে।

মুসলমানকে সম্মান করা, ঈমানকে সম্মান করা

একজন মুসলমানকে সম্মান করা মূলত তার ঈমানকে সম্মান করা, যা ঐ মুসলমানের অন্তরে রয়েছে। একজন মুসলমান যেহেতু কালেমায়ে তাইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র উপর ঈমান রাখে এবং তার অন্তরে ঈমান রয়েছে, তাই তার দাবি ও হক এই যে, ঐ মুসলমানকে সম্মান করতে হবে। যদিও বাহ্যিক অবস্থায় ঐ মুসলমানকে দুর্বল দেখছো, তার আমল এবং তার বাহ্যিক আকার-আকৃতি পুরোপুরি দ্বীন মোতাবেক নয়, কিন্তু তোমার তো জানা নেই যে, তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা যেই ঈমান দান করেছেন, তার মাকাম কী? আল্লাহ তা'আলার নিকট তার ঈমান কতোটুকু মাকবুল। শুধু বাহ্যিক আকার-আকৃতির দ্বারা তা অনুমান করা যাবে না। এজন্যে প্রত্যেক আগমনকারী মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার সুবাদে সম্মান করা উচিত।

এক যুবকের শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার আমি দারুল উলূমে আমার দফতরে বসা ছিলাম। এক যুবক আমার কাছে এলো। ঐ যুবকের মধ্যে মাথা থেকে পাতা পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে ইসলামী বেশ-ভূষার কিছুই চোখে পড়ছিলো না। পশ্চিমা পোষাকে সজ্জিত। তার বাহ্যিক আকার দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছিলো না যে, তার ভিতরেও দীনদারির কিছু না কিছু থাকতে পারে। আমার কাছে এসে বললো যে, আমি আপনার নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। আমি বললাম, কি সেই মাসআলা? সে বললো, মাসআলা এই যে, আমি একচুয়ারি (Actuary) (ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কতো প্রিমিয়াম হওয়া উচিত এবং কতো টাকার

ইন্সুরেন্স হওয়া উচিত, এ জাতীয় হিসাব রাখার জন্যে 'একচুয়ারি' রাখা হয়। তখন পুরো পাকিস্তানের কোথাও এই শিক্ষা দেওয়া হতো না) ঐ যুবক বললো, আমি এই বিদ্যা অর্জনের জন্যে ইংল্যান্ড সফর করি। সেখানে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করি। (সে সময়ে পুরো পাকিস্তানে এ বিষয়ে দু'-তিন জনের অধিক শাস্ত্রজ্ঞ ছিলো না। যে ব্যক্তি একচুয়ারি হয়, সে ইন্সুরেন্স কোম্পানি ছাড়া অন্য কোথাও কাজ করার উপযুক্ত থাকে না। যাই হোক ঐ যুবক বললো যে) আমি এখানে এসে একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকুরি নেই (পুরো পাকিস্তানে যেহেতু এ শাস্ত্রের দক্ষ লোক খুব কম, এজন্যে চাহিদাও ছিলো খুব বেশি। তার বেতন ও সুবিধাদি ছিলো অনেক।) আমার বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অনেক রয়েছে। এজন্যে আমি এ চাকুরি গ্রহণ করি। যখন এসব কিছু হয়ে গেলো- বিদ্যার্জন করলাম, চাকুরি নিলাম, তখন আমাকে একজন বললো যে, ইন্সুরেন্সের কাজ হারাম। এটা জায়েয নেই। এখন আমি আপনার কাছে সত্যায়ন করতে এসেছি যে, বাস্তবে এটা হালাল, না হারাম?

ইন্সুরেন্সের চাকুরিজীবি কী করবে

আমি তাকে বললাম যে, বর্তমানে ইন্সুরেন্সের যতোগুলো পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর কোনোটির মধ্যে রয়েছে সুদ, কোনোটির মধ্যে রয়েছে জুয়া, এজন্যে সে সবই হারাম। এ কারণে ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকুরি করাও জায়েয নেই। তবে আমাদের বড়োরা বলেন যে, কেউ যদি ব্যাংক বা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকুরি করে, তাহলে তার উচিত নিজের জন্যে অন্য কোনো হালাল ও জায়েয জীবিকার সন্ধান করা। এমন গুরুত্ব ও চেষ্টার সাথে সন্ধান করবে, যেমন একজন বেকার লোক করে থাকে। যখন অন্য কোনো হালাল উপায় পেয়ে যাবে, তখন এই হারাম মাধ্যম ছেড়ে দিবে। আমাদের বড়োরা এ কথা এজন্যে বলেন যে, জানা তো নেই কার কি অবস্থা। কেউ যদি সাথে সাথে হারাম উপায় ছেড়ে দেয় তাহলে আবার কোনো পেরেশানিতে পড়ে না যায়। তখন শয়তান এসে তাকে ফুসলাবে যে, দেখো! তুমি দ্বীনের উপর আমল করছিলে যার ফলে তোমার উপর এই বিপদ এসেছে। এজন্যে আমাদের বড়োরা বলেন, সাথে সাথে এই হারাম চাকুরি ছেড়ো না, বরং অন্যত্র চাকুরির খোঁজ করো। হালাল জীবিকার ব্যবস্থা হলে তখন এটা ছেড়ে দাও।

আমি পরামর্শ নিতে আসিনি

আমার এই উত্তর শুনে ঐ যুবক বললো যে, মাওলানা ছাহেব! আমি আপনার কাছে এ পরামর্শ নিতে আসিনি যে, চাকুরি ছাড়বো কি ছাড়বো না। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, এ কাজ হালাল না হরাম। আমি তাকে বললাম, হালাল-হারাম হওয়ার বিষয় আমি তোমাকে বলেছি। সাথে বুযুর্গদের পরামর্শের কথাও বলে দিয়েছি। ঐ যুবক বললো, আপনি আমাকে এই মশওয়ারা দিবেন না যে, চাকুরি ছাড়বো কি ছাড়বো না। আপনি পরিষ্কার ভাষায় আমাকে বলুন, এই চাকুরি হালাল কি না? আমি বললাম, হারাম। ঐ যুবক বললো, বলুন, এটা আল্লাহ হারাম করেছেন, না আপনি হারাম করেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ হারাম করেছেন। ঐ যুবক বললো, যে আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন, তিনি আমাকে রিযিক থেকে মাহরুম করবেন না। এ কারণে এখন আমি এখান থেকে আর ঐ অফিসে ফিরে যাবো না। আল্লাহ যখন হারাম করেছেন, তখন তিনি আমার উপর রিযিকের দরজা বন্ধ করবেন না। এজন্যে আমি আজ থেকে এটা ছেড়ে দিলাম।

বাহ্যিক রূপ দেখো না

এবার লক্ষ করুন, বাহ্যিক চেহারা-সুরুতে কোনোভাবেই বুঝা যাচ্ছিলো না যে, আল্লাহর এই বান্দার অন্তরে এমন পোক্ত ঈমান রয়েছে। আল্লাহর মহান সত্তার উপর তার এমন শক্ত আস্থা রয়েছে, তাওয়াক্কুল রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন পাকাপোক্ত তাওয়াক্কুল দান করেছেন। বাস্তবেই ঐ যুবক সেদিনই ঐ চাকুরি ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাকে খুব ভূষিত করেন। অন্য হালাল জীবিকা তাকে দান করেন। সে এখন আমেরিকাতে রয়েছে। ঐ যুবকের ঐ কথা আজ পর্যন্ত আমার অন্তরে অঙ্কিত রয়েছে। মোটকথা, কারো বাহ্যিক অবস্থা দেখে আমরা তার ব্যাপারে কি ফয়সালা করতে পারি? জানা তো নেই, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে ঈমানের কেমন প্রদীপ আলোকিত করেছেন! তাকে নিজের সত্তার উপর কেমন ভরসা ও কেমন তাওয়াক্কুল দান করেছেন! এজন্যে কোনো মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। যে ঈমানের অধিকারী, যাকে আল্লাহ তা'আলা 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'-এর ঈমান দান করেছেন, সে সম্মানের উপযুক্ত। এ কারণে প্রত্যেক

ঈমানদারকে সম্মান করার হুকুম দান করা হয়েছে। হযরত শেখ সাদী র.
বলেন,

ہر بیشہ گمان مبر کہ خالی است

شاید کہ پلنگ خفتہ باشد

'প্রত্যেক বনকে শূন্য ভেবো না,
জানা তো নেই, কেমন কেমন সিংহ ও চিতা
তার ভিতর ঘুমিয়ে আছে।'

আল্লাহ তা'আলা কাউকে যখন ঈমানের দৌলত দান করেন, তখন আমাদের কাজ হলো ঐ ঈমানওয়ালাকে মূল্যায়ন করা, তাকে সম্মান করা এবং ঐ ঈমানকে সম্মান করা, যা তার অন্তরে রয়েছে।

সম্মানিত কাফেরকে সম্মান করা

প্রত্যেক মুসলমানকে তো সম্মান করার হুকুম দেওয়া হয়েছেই, হাদীস শরীফে এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, আগমণকারী যদি কাফেরও হয় কিন্তু তাকে তার সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি মনে করা হয়, তাকে সম্মান করা হয়, তাকে মানুষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে, তাকে বড়ো বলে গণ্য করা, যদি কাফের ও অমুসলিমও হয়, তাহলে তার আগমণে তুমিও তাকে সম্মান করো। তাকে সম্মান করা ইসলামী আখলাকের একটা দাবি। এই সম্মান কুফরকে নয়। তার কুফরের প্রতি ঘৃণার আচরণ করা হবে, কিন্তু যেহেতু তাকে তার কওমের মধ্যে সম্মানিত মনে করা হয়, তাই সে যখন তোমার নিকট আসবে তার খাতিরে তাকে সম্মান করো। এমন যেন না হয় যে, তাকে ঘৃণা করার ফলে তুমি তার সঙ্গে এমন আচরণ করলে যে, সে তোমার প্রতি এবং তোমার ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হলো। এজন্যে তাকে সম্মান করো।

কাফেরদের সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করেও দেখিয়েছেন। তাঁর কাছে বড়ো বড়ো কাফের সর্দার আসতো। তারা যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসতো, তখন তাদের কখনো মনেই

না যে, আমার সঙ্গে অসম্মানের আচরণ করা হচ্ছে। তিনি তাদেরকে সম্মান করতেন। সসম্মানে বসাতেন। সসম্মানে তাদের সাথে কথা বলতেন। এটা হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত যে, একজন কাফেরও যদি আমাদের কাছে আসে, সে যেন অসম্মান বোধ না করে।

এক কাফের ব্যক্তির ঘটনা

হাদীস শরীফে এসেছে- একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে অবস্থান করছিলেন। সামনে থেকে এক ব্যক্তিকে আসতে দেখা গেলো। হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটেই ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! যে ব্যক্তি সামনে থেকে আসছে, সে তার গোত্রের খারাপ মানুষ। যখন ঐ ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসলো, তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করলেন। অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে তার সাথে কথা বললেন। যখন ঐ ব্যক্তি কথাবার্তা বলে চলে গেলো, তখন হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজেই তো বললেন, এ ব্যক্তি তার কবিলার খারাপ লোক। কিন্তু যখন সে আসলো, তখন আপনি তার সম্মান করলেন এবং তার সাথে খুব নরম আচরণ করলেন, এর কারণ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ মানুষ খুবই খারাপ, যার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে সম্মান করা হয়।[৩]

এ গীবত জায়েয

এ হাদীসে দুটি প্রশ্ন জাগে। প্রথম প্রশ্ন এই জাগে যে, যখন ঐ ব্যক্তি দূর থেকে আসছিলো, তখন আসার পূর্বেই তার অবর্তমানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর নিকট তার নিন্দা করলেন যে, এ ব্যক্তি তার কবিলার মধ্যে খারাপ মানুষ। বাহ্যত এটাকে গীবত মনে হয়। কারণ, এক ব্যক্তির অবর্তমানে তার দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে। এর উত্তর এই যে, মূলত এটা গীবত নয়। কারণ, কোনো ব্যক্তিকে অন্য কারো অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর নিয়তে যদি তার দোষ বর্ণনা করা হয়, তাহলে তা গীবত

---

৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৭২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৯৩, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯১৯, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৫৯

নয়। যেমন কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে সতর্ক করার জন্যে বললো যে, তুমি অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সতর্ক থেকো, সে যেনো তোমাকে ধোঁকা দিতে না পারে, বা সে যেনো তোমাকে কষ্ট দিতে না পারে। তাহলে এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। হারাম ও নাজায়েয নয়। বরং কতক অবস্থায় এটা বলা ওয়াজিব। উদাহরণস্বরূপ আপনার নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, অমুক ব্যক্তি অমুককে ধোঁকা দিবে, আর ধোঁকা দেওয়ার ফলে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির জানের বা মালের মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তখন আপনার উপর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলে দেওয়া ওয়াজিব যে, দেখো! অমুক ব্যক্তি তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়। যাতে সে এ থেকে নিরাপদে থাকে। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ কারণে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে বললেন যে, এ ব্যক্তি তার কবিলার খারাপ মানুষ, তখন তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এ ব্যক্তি যেন হযরত আশেয়া রাযি.-কে ধোঁকা দিতে না পারে, বা এ ব্যক্তির উপর ভরসা করে হযরত আয়েশা রাযি. বা অন্য কোনো মুসলমান এমন কোনো কাজ না করে, যার ফলে পরবর্তীতে তাকে আফসোস করতে হয়। এ কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-কে তার ব্যাপারে আগে থেকে বলে দেন।

খারাপ মানুষকে তিনি সম্মান করলেন কেন

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই জাগে যে, একদিকে তো তিনি তার দোষ বর্ণনা করলেন, অপরদিকে যখন সে এলো তখন তার খুব সম্মান করলেন, খুব আদর-যত্ন করলেন। এখানে ভিতর-বাইরের মধ্যে পার্থক্য হলো। সম্মুখে একরকম আচরণ, আর পিছনে আরেক রকেম। আসল কথা হলো, তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল। প্রত্যেকটি বিষয়ের তিনি সীমা বর্ণনা করেছেন। তাই সতর্ক করার জন্যে তিনি বলে দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি খারাপ মানুষ। কিন্তু যখন সে আমার কাছে মেহমান হয়ে এসেছে, তাই মেহমান হিসেবেও তার কিছু হক রয়েছে। তা এই যে, আমি তার সঙ্গে সম্মানের আচরণ করবো। তার সঙ্গে এমন আচরণ করবো, যা একজন মেহমানের সাথে করা উচিত। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন আচরণই করেছেন।

ঐ মানুষ অতিনিকৃষ্ট

এ হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর মধ্যে একটি হিকমত এও রয়েছে যে, খারাপ মানুষকে সম্মান করা না হলে হতে পারে সে তোমাকে কষ্ট

দিবে বা কোনো বিপদে ফেলবে বা এমন কোনো আচরণ সে করবে, যার ফলে তোমাকে ভবিষ্যতে আফসোস করতে হবে। এজন্যে কোনো খারাপ মানুষের সঙ্গে দেখা হলে তাকে সম্মান করাতেও কোনো দোষ নেই। তার অনিষ্ট থেকে নিজের জান-মাল-আব্রু বাঁচানোও মানুষের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন যে, ঐ মানুষ অতিনিকৃষ্ট, যার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে মানুষ তাকে সম্মান করে। মানুষ তাকে এজন্যে সম্মান করছে না যে, সে ভালো মানুষ, বরং এজন্যে সম্মান করছে যে, তাকে সম্মান করা না হলে সে কষ্ট দিবে। এমতাবস্থায়ও সম্মান করায় কোনো দোষ নেই। তবে শর্ত হলো, জায়েযের সীমারেখার মধ্যে থেকে সম্মান করতে হবে। তার কারণে কোনো গোনাহে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শের একেকটি অংশের মধ্যে না জানি আমার-আপনার জন্যে কতো অসংখ্য শিক্ষা রয়েছে। তিনি গীবতের সীমা বলে দিয়েছেন যে, এতোটুকু বিষয় গীবতের অন্তর্ভুক্ত, আর এতোটুকু বিষয় গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। মেহমানকে সম্মান করা কপটতা নয়। বরং হুকুম হলো আগমণকারী ব্যক্তি কাফের, ফাসেক, ফাজের যাই হোক না কেন, যখন সে তোমার নিকট মেহমান হয়ে আসবে, তখন তাকে সম্মান করবে, তাকে মর্যাদা দিবে, এটা কপটতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

স্যার সাইয়িদ আহমাদ খানের একটি ঘটনা

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. থেকে স্যার সাইয়িদের এ ঘটনা শুনেছি। এখন তো তিনি আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। এখন আল্লাহ ও তার ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তিনি ইসলামী আকীদার বিষয়ে যেই গড়বড় করেছেন, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু যেহেতু তিনি প্রথম যুগে বুযুর্গদের সোহবত উঠিয়েছিলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক আলেমও ছিলেন, এজন্যে তার আখলাক ছিলো ভালো। যাই হোক, হযরত ওয়ালেদ ছাহেব তার এ ঘটনা শুনিয়েছিলেন যে, একবার তিনি তার ঘরে বসা ছিলেন। সাথে অকৃত্রিম কিছু বন্ধুও ছিলো। সম্মুখে দূর থেকে একজন মানুষকে আসতে দেখলেন। আগমণকারী সাধারণ ভারতীয় পোষাক পরে আসছিলো। কিছুটা কাছে আসার পর লোকটা বাইরের একটি হাউজের নিকট দাঁড়িয়ে গেলো। তার হাতের মধ্যে একটা থলে ছিলো। ঐ

থলের মধ্য থেকে একটা আরবী জুব্বা বের করলো। আরবের লোকেরা রুমালের উপরে যেই দড়ি বাঁধে তা বের করলো। উভয়টা পরিধান করলো। তারপর কাছে আসতে থাকলো। স্যার সাইয়িদ ছাহেব দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি তার এক সাথীকে বললেন, যে ব্যক্তি আসছে, তাকে ফেরাড়ি মনে হচ্ছে। কারণ, এ ব্যক্তি এতোক্ষণ পর্যন্ত সহজ-সরল ভারতীয় পোষাক পরে আসছিলো। এখানে এসে তার বেশ পরিবর্তন করে আরবী পোষাক পরলো। এখন সে নিজেকে আরব বলে প্রকাশ করবে। তারপর পয়সা ইত্যাদি চাইবে।

কিছুক্ষণ পর ঐ ব্যক্তি তার নিকট এলো। এসে দরজায় করাঘাত করলো। স্যার সাইয়িদ ছাহেব গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। সসম্মানে ভিতরে নিয়ে আসলেন। স্যার সাইয়িদ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে তাশরীফ এনেছেন? সে উত্তর দিলো, আমি হযরত শাহ গোলাম আলী রহ.-এর কাছে বাইআত। হযরত শাহ গোলাম আলী রহ. উঁচু স্তরের সূফী বুযুর্গ ছিলেন। তারপর ঐ ব্যক্তি নিজের কিছু প্রয়োজনের কথা বললো যে, আমি এই প্রয়োজনে এসেছি। আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন। সুতরাং স্যার সাইয়িদ ছাহেব প্রথমে তাকে খুব আদর-যত্ন করলেন। তারপর যতো টাকার প্রয়োজন ছিলো তার চেয়ে বেশি এনে দিলেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে বিদায় করলেন।

তিনি তাকে আদর-যত্ন কেন করলেন

লোকটি চলে গেলে স্যার সাইয়িদ ছাহেবকে তার সঙ্গী বললো, আপনিও বিস্ময়কর মানুষ! আপনি স্বচক্ষে দেখলেন, সে তার বেশ পরিবর্তন করলো। তার সাধারণ পোষাক খুলে আরবীয় পোষাক পরলো। আপনি নিজেই বললেন যে, সে ফেরাড়ি। এসে ধোঁকা দিবে। পয়সা চাইবে, এতদসত্ত্বেও তাকে এতো আদর-যত্ন করলেন। এতোগুলো পয়সা দিলেন, এর কারণ কী?

স্যার সাইয়িদ ছাহেব উত্তর দিলেন, আসল কথা হলো, একদিকে তো সে মেহমান হয়ে এসেছিলো এজন্যে আমি তার আদর-আপ্যায়ন করলাম। আর পয়সা দেওয়ার বিষয়, তার ধোঁকার কারণে তাকে পয়সা দিতাম না, কিন্তু যেহেতু সে এতো বড়ো একজন বুযুর্গের নাম নিয়েছে, তাই আমার না করতে সাহস হয়নি। কারণ, হযরত শাহ গোলাম আলী রহ. এমন এক আল্লাহর ওলী, তাঁর সঙ্গে দূরের সম্পর্ক থাকলেও তাঁর সম্পর্ককে সম্মান করা আমার

দায়িত্ব। এই সম্পর্কের সম্মান করার ফলে হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করে দিবেন। এজন্যে আমি তাকে পয়সা দিয়েছি।

দ্বীনের সম্পর্কের সম্মান

এ ঘটনা আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ.-এর নিকট শুনেছি। তিনি এ ঘটনা তার শাইখ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর নিকট শুনেছেন। হযরত থানভী রহ. এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, একদিকে স্যার সাইয়িদ ছাহেব মেহমানকে সম্মান করেছেন, অপরদিকে বুযুর্গানে দ্বীনের সম্পর্কের সম্মান করেছেন। কারণ, আল্লাহর ওলীর সঙ্গে যদি কারো সামান্য সম্পর্কও থাকে, আর ঐ সম্পর্কের যদি সম্মান করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এর বদৌলতেও মেহেরবানী করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন। আমীন। যাই হোক, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলেছেন যে, যে কোনো সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি আসলে তাকে সম্মান করো।

সাধারণ সভায় সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করা

এখানে আরেকটি কথা বলছি, তা এই যে, সাধারণ সভা, মজলিস বা মসজিদের স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, মসজিদ, মজলিস বা সমাবেশে যে ব্যক্তি প্রথমে যেখানে এসে বসবে সে ঐ জায়গার অধিক হকদার। যেমন মসজিদের প্রথম কাতারে গিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমে বসে, সে তার অধিক হকদার। এখন অন্যের এ কথা বলার অধিকার নেই যে, ভাই তুমি এখান থেকে সরে যাও, আমি এখানে বসবো। বরং যে ব্যক্তি যেখানে জায়গা পাবে, সে সেখানেই বসবে। কিন্তু ঐ মজলিস, মসজিদ বা সমাবেশে যদি এমন কোনো ব্যক্তি আসে, যে ঐ সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি, তাহলে তাকে সম্মুখে বসানো এবং অন্যদের আগে তাকে জায়গা দেওয়াও এ হাদীসের অর্থের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বড়োদের আমল রয়েছে যে, কোনো মজলিসে সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসা আছে, এমন সময় কোনো সম্মানিত মেহমান এলে তাকে নিজেদের কাছে এনে বসান। যদি তাকে নিকটে বসানোর জন্যে অন্যদেরকে বলতে হয় যে, সামান্য পিছনে সরে যান, তাহলে এতেও সমস্যা নেই।

এটা হাদীসের উপরে আমল হচ্ছে

একথা এজন্যে বললাম যে, এ কর্মপদ্ধতির উপর আমাদের বড়োদের আমল রয়েছে। যে কারণে মানুষের অন্তরে প্রশ্ন জাগে যে, শরীয়তের হুকুম তো এই যে, যে ব্যক্তি আগে আসবে, সে যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসবে। কেউ যদি দেরিতে আসে আর পিছনে জায়গা পায় তাহলে তার উচিত পিছনেই বসা। কিন্তু বড়োরা অন্যদের হক নষ্ট করে দেরিতে আগমনকারী ব্যক্তিকে কেন সামনে ডেকে নেন? আসল কথা এই যে, সম্মুখে আহবানকারী বুযুর্গ মূলত এই হাদীসের উপর আমল করছেন যে,

إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ

'যখন তোমাদের নিকট কোনো সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি আসে, তখন তোমরা তাকে সম্মান করবে।'

বরং আমাদের বুযুর্গ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. (আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমীন।) এ বিষয়ে খুব লক্ষ রাখতেন। এমনকি বড়ো কোনো ব্যক্তি মসজিদে আসলে এবং সামনের কাতারের মানুষ তাকে জায়গা না দিলে তিনি এ ব্যাপারে মানুষদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করতেন যে, ভাই এটা কেমন আচরণ! তোমাদের উচিত নিজের জায়গা থেকে সরে গিয়ে সম্মানিত মানুষকে জায়গা দেওয়া। এটাকে অবিচার মনে করবে না, বরং এটাও এই হাদীসের উপর আমল করার একটি অংশ।

সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করা সওয়াবের কারণ

হযরত থানভী রহ. এ হাদীসের বিষয়ে একটি স্মরণ রাখার মতো কথা এই লিখেছেন যে, কোনো ব্যক্তি কাফের হোক বা ফাসেক, এ হাদীসের উপর আমল করার নিয়তে যদি তার আগমণে তাকে সম্মান করা হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ সওয়াব হবে। কারণ, এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম তামিল করা হলো। কিন্তু যদি এ নিয়তে তার সম্মান করা হয় যে, আমি যদি তাকে সম্মান করি তাহলে অমুক সময়ে সে আমার কাজে আসবে, বা অমুক সময় তার দ্বারা সুপারিশ করাবো, বা তার দ্বারা অমুক দুনিয়াবি স্বার্থ উদ্ধার করবো, যেন একজন ফাসেককে সম্মান করার উদ্দেশ্য জাগতিক লালসা, তার দ্বারা পয়সা হাসিল করা, বা নিজের কোনো পদ অর্জন করা, তাহলে এমতাবস্থায় এ সম্মান ঠিক নয়।

এ কারণে সম্মান করার সময় নিয়ত ঠিক থাকা উচিত। অর্থাৎ, এ নিয়ত থাকা উচিত যে, যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়েছেন, তাই তাঁর হুকুম তামিলের জন্যে সম্মান করছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বড়োদের থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ো না*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝[১]

সূরা হুজরাতে দুটি অংশ রয়েছে

বুযুর্গানে মুহ্তারাম ও বেরাদারানে আযীয! আমি আপনাদের সম্মুখে সূরা হুজরাতের প্রথম দিকের দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এ সূরা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান এবং তাঁর সঙ্গে আচরণের আদব সম্বলিত। অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মুসলমানদের কিরূপ আচরণ করা উচিত তার বর্ণনা। দ্বিতীয়াংশ মুসলমানদের পরস্পরে সামাজিকতা, সম্পর্কের বিধান ও আদব সম্বলিত।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৬, পৃঃ ২০৮-২২০, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. হুজরাত : ১-২

বনু তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমণ

এই সূরার প্রথমাংশ যেই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়, সেই ঘটনা এই ছিলো যে, বনু তামীম গোত্রের একদল লোক মুসলমান হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসেন। সে সময় বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল এ উদ্দেশ্যেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসছিলো এবং তাঁর থেকে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করছিলো। যখন কোনো প্রতিনিধি দল ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করতো, তখন তিনি তাদের মধ্যে থেকে একজনকে তাদের আমীর নির্ধারণ করতেন। যাতে পরবর্তীতে সেই আমীর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং তাঁর বিধানাবলী কবীলার লোকদের নিকট পৌছানোর কাজে সহযোগী হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর নিজেদের পক্ষ থেকে আমীর নির্ধারণ করা

যখন বনু তামীম কবীলার প্রতিনিধি দল এলো এবং ইসলামী শিক্ষা অর্জন করে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো, তখন তাদের মধ্যেও একজন আমীর নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দিলো। সাহাবায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসা ছিলেন। তিনি নিজেও উপবিষ্ট ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বনু তামীম গোত্রের জন্য কাউকে আমীর নির্ধারণ করার পূর্বেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত ওমর ফারুক রাযি. পরস্পরে পরামর্শ শুরু করলেন যে, বনু তামীমের পক্ষ থেকে কাকে আমীর বানানো উচিত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কা'কা ইবনে মা'বাদ রাযি.-কে আমীর বানানোর প্রস্তাব পেশ করেন, আর হযরত ওমর ফারুক রাযি. করেন আকরা' ইবনে হাবেস রাযি.-কে আমীর বানানোর প্রস্তাব। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রস্তাবের পক্ষে দলিল দিতে আরম্ভ করেন। এই কথাবার্তার মাঝে তাদের উভয়ের আওয়াজ উঁচু হয়ে যায়। অথচ সেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন। এসময় সূরায়ে হুজরাতের প্রথম আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।[২]

---

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ডঃ ৪, পৃঃ ২৬১

দুটি ভুল হয়ে যায়

এ আয়াতসমূহ হযরত আবু বকর রাযি. ও ওমর রাযি.-কে সতর্ক করে যে, এই বিশেষ ঘটনায় দুটি ভুল সংঘটিত হয়েছে। এক এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আলোচনা আরম্ভ করেননি যে, কাকে আমীর বানানো হবে। নিজেও এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেননি এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছেও পরামর্শ চাননি যে, বলো কাকে আমীর বানানো হবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণার পূর্বে এবং তাঁর পরামর্শ চাওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে, যা সঙ্গত ছিলো না; বরং ভুল ও আপত্তিযোগ্য ছিলো। দ্বিতীয় ভুল এই হয়েছে যে, কথাবার্তার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে তাদের উভয়ের আওয়াজ উঁচু হয়েছে। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে কেউ উঁচু আওয়াজে কথা বলা তার সম্মানের উপযোগী নয়। তাই ভবিষ্যতে এ থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রথম ভুলের ব্যাপারে সতর্কতা

যাই হোক, সূরায়ে হুজরাতে সর্বপ্রথম এই দুই ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো না।'

এটা এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ। এ আয়াতের প্রেক্ষাপট এই যে, এখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু তামীমের মধ্য থেকে কাউকে আমীর বানানোর বিষয়ে আলোচনা শুরু করেননি। না নিজে ঘোষণা করেছেন, না সাহাবায়ে কেরাম থেকে পরামর্শ চেয়েছেন। এর পূর্বে নিজেদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আলোচনা উঠানো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নামান্তর। এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এ কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত পথপ্রদর্শন করতে থাকবে

কুরআনে কারীমের এটা বিরল-বিস্ময়কর অলৌকিক উপস্থাপন যে, কতক সময় বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো একটি আয়াত অবতীর্ণ

হয়। কোনো একটি ঘটনা দেখা দিলো, তাতে মুসলমানদের শিক্ষা দেও উদ্দেশ্য ছিলো, কোনো হেদায়েত দান করা লক্ষ্য ছিলো, সে বিষয়ে আয়া নাযিল করা হয়, কিন্তু কুরআনে কারীম কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের পথপ্রদর্শনে জন্যে এসেছে। এজন্যে এমন শব্দে তা বর্ণনা করে যে, সে পথপ্রদর্শন ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগমণকারী সব মানুষের জন্যে একটি চিরস্থায়ী পথপ্রদর্শন হয়। সুতরাং এখানে এরূপ ব হয়নি যে, বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে কোনো একজন আমীর বানানোর বিষয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বল পূর্বেই তোমরা কেন কথা বলতে আরম্ভ করলে? এভাবে বলেননি। ব সাধারণভাবে হুকুম দিয়েছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে অগ্র হওয়ার চেষ্টা করো না। এই একটি বাক্য দ্বারা অনেক বিধান বের হয় কি বিধান বের হয়? আজকের মাহফিলে সেটাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া কথা বলা জায়েয নেই

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে অগ্র হওয়ার চেষ্টা করো না। এর একটি সরাসরি অর্থ তো এই হয় যে, যে বিষ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনো আলোচনা শুরু করেননি, বিষয়ে তাঁর হুকুম ও অনুমতি ছাড়া কথা বলা জায়েয নেই। এটা তো ছি একটা ঘটনা, কিন্তু ভবিষ্যতেও এধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। এজন্যে হু দিয়েছেন যে, যে বিষয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখ আলোচনা শুরু করেননি, সে বিষয়ে নিজের মতামত দেওয়া আরম্ভ করো ন

আলেমের পূর্বে কথা বলা জায়েয নেই

এ আয়াতের অধীনে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, যেহেতু কুরআ কারীম কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী হেদায়েত, এ কারণে যদিও হুযূর সাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বর্তমান নেই, কিন্তু তাঁর ওয়া ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা ইরশাদ করেছেন,

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ, ওলামায়ে কেরাম নবীগণের ওয়ারিস।[৩] এজন্যে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, একই হুকুম সেসব আলেমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যাদের কথা মানুষ শোনে এবং মানে। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীন ও শরীয়তের ইলম দান করেছেন, তাদের মজলিসে কোনো প্রশ্ন করা হলে তাদের উত্তরের প্রতীক্ষা না করে বিনা অনুমতিতে কোনো ব্যক্তির নিজের থেকে কথা বলা আলেমের সম্মান এবং মজলিসের আদবের পরিপন্থী, বরং বেয়াদবী। কিংবা এখনো পর্যন্ত কোনো বিষয়ে কথা বলার অনুমতি দেননি তার পূর্বে মানুষ নিজের থেকে পরস্পরে ঐ বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করা, এটাও মজলিসের আদবের খেলাফ ও বেয়াদবী। তবে যদি মজলিসের প্রধান ব্যক্তি পরামর্শ চান যে, অমুক বিষয়ে আপনাদের মত দিন, তখন স্বাধীনভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করবে। কিংবা কোনো বিষয়ে যদি কথা উঠাতে হয়, তাহলে মজলিসের প্রধান ব্যক্তির নিকট অনুমতি নিবে যে, এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করবো কি না? তিনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে নিঃসন্দেহে সে বিষয়ে কথা বলবে। কিন্তু অনুমতি ছাড়া সে বিষয়ে কথা বলবে না। কারণ, এর ফলে মজলিসের প্রধান ব্যক্তির চেয়ে অগ্রসর হওয়া হবে। এ আয়াতে যা নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতের একটি সরাসরি অর্থ এই।

পথ চলতে নবী বা আলেমগণের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া

এ আয়াত দ্বারা দ্বিতীয় বিধান এই বের হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর চেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বেয়াদবী। তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের দাবি হলো, যখন তাঁর সঙ্গে চলবে, তখন কিছুটা পিছে চলবে। আগে আগে চলবে না। এটাও এ আয়াতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত। এ বিধান সম্পর্কেও মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন যে, এটাও যেহেতু কিয়ামত পর্যন্তের জন্যে, তাই আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিসদের ব্যাপারেও একই বিধান। সুতরাং কেউ যদি নিজের বড়োর সঙ্গে উদাহরণস্বরূপ কোনো আলেম, শাইখ বা ওস্তাদের সঙ্গে পথ চলে, তাহলে তাদের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। হয় সাথে সাথে চলবে, না হয় কিছুটা পিছনে চলবে। সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বেয়াদবী। এ আয়াতে যার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এটা ছিলো দ্বিতীয় বিধান।

---

৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬০৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৫৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২১৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২০৭২৩

সুন্নাতের অনুসরণে সফলতা

তৃতীয় যেই হুকুম এ আয়াত থেকে বের হয় তা এই যে, তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি ও সফলতার ভিত্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে। তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করো। তাঁর থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো না। অর্থাৎ, তিনি যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন, হকদারের হক দিয়েছেন, নিজের নফসের হক আদায় করেছেন, নিজের পরিবার-পরিজনের হক আদায় করেছেন, সঙ্গী-সাথীদের হক আদায় করেছেন, বন্ধু-বান্ধবের হক আদায় করেছেন, সেভাবে তোমরাও হক আদায় করে জীবন অতিবাহিত করো। এমন যেন না হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আগে বাড়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কেবল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল করো।

তিন সাহাবীর ইবাদতের সংকল্প

এক হাদীসে এসেছে যে, কয়েকজন সাহাবী বসা ছিলেন। তারা পরস্পরে এই আলোচনা আরম্ভ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতো উঁচু মাকাম দান করেছেন যে, অন্য কোনো ব্যক্তি সে পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। তিনি যাবতীয় গোনাহ থেকে নিষ্পাপ। তাঁর কোনো গোনাহ হতে পারে না। আর যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ও তাহলে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে,

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বাপরের সব ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দিয়েছেন।[৪] এজন্যে তাঁর বেশি ইবাদত করার প্রয়োজন নেই। তাই তিনি রাতে ঘুমান এবং দিনে রোযা ছাড়েন। কিন্তু আমাদের তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো জান্নাতের সুসংবাদ লাভ হয়নি। তাই আমাদের তাঁর চেয়ে অধিক ইবাদত করা উচিত। এ আলোচনার পর তাদের মধ্যে থেকে একজন সাহাবী বললেন, আমি আজ থেকে রাতে ঘুমাবো না। সারারাত তাহাজ্জুদ পড়বো। দ্বিতীয় সাহাবী বললেন, আমি সারাজীবন রোযা রাখবো। কোনো দিন রোযা ছাড়বো না। তৃতীয় সাহাবী বললেন, আমি সারাজীবন

---

৪. ফাত্হ : ২

বিয়ে করবো না। যাতে আমি পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরিবর্তে ইবাদতে মগ্ন থাকতে পারি। ইবাদতের ব্যাপারে গাফেল না হই।

কোনো ব্যক্তি নবী থেকে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না

এবার আপনারা লক্ষ করুন! এই তিন সাহাবী যে সংকল্প করেছেন, তা ছিলো নেক কাজের সংকল্প। আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের সংকল্প। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, এসব সাহাবী এই সংকল্প করেছেন, তখন তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং বললেন,

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ بِهٖ

আল্লাহ তা'আলার যে পরিমাণ মারেফত আমার অর্জন হয়েছে, এ পরিমাণ মারেফত পৃথিবীর আর কারো অর্জন হয়নি। আল্লাহ তা'আলার যে পরিমাণ ভয় ও তাকওয়া তিনি আমাকে দান করেছেন, পৃথিবীর অন্য কারো সে পরিমাণ তাকওয়া লাভ হয়নি। এতদসত্ত্বেও আমি ঘুমাই এবং রাতে ওঠে নামাযও পড়ি। কোনো দিন রোযা রাখি, কোনো দিন রাখি না। আমি স্ত্রীদের বিয়ে করেছি। মনে রাখবে! এ সুন্নাতের মধ্যেই তোমাদের মুক্তি।

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

'কেউ যদি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত থাকবে না।'[৩৫]

এ হাদীস দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত উন্নতি ও সফলতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। কেউ যদি চায় যে, আমি নবীর থেকে সম্মুখে অগ্রসর হবো, মনে রাখবেন! তা কখনো হতে পারে না।

হক আদায় করা সুন্নাতের অনুসরণ

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে ইবাদত ফরয করেছেন এবং ইবাদতের প্রতি

---

[৩৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৬৭৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৮৭, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৩১৮৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬১৮৮

উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনিভাবে তোমাদের উপরে কিছু হকও আরোপ করেছেন। তোমাদের জানেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে, তোমাদের স্ত্রীরও তোমাদের উপর হক রয়েছে, তোমাদের চোখেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে, তোমাদের সঙ্গী-সাথীদেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে।[৬]

তোমরা যদি এসব হক আদায় করো, তাহলে সুন্নাতের অনুসরণ হবে। আর যদি দুনিয়াবিরাগীদের মতো বনে-জঙ্গলে গিয়ে বসে যাও, আর বলো যে, আমি দুনিয়াকে ত্যাগ করে এখানে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' করবো, তাহলে এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ হবে না। যাই হোক, এ আয়াতের তৃতীয় অর্থ এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো না, বরং যে কাজকে যে সীমার মধ্যে করার নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন, সে কাজকে ঐ সীমার মধ্যেই রাখো, তারচে' সম্মুখে অগ্রসর হয়ো না।

অনুসরণের নাম দ্বীন

মনে রাখবেন! নিজের ইচ্ছা ও নিজের আগ্রহ পুরা করার নাম দ্বীন নয়, বরং দ্বীন হলো অনুসরণের নাম। আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণের নাম দ্বীন। এজন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যখন যে হুকুম আসবে এবং তাঁর অনুসরণের যে দাবি হবে, সেটাই কল্যাণকর, সেটাই আনুগত্য। তার মধ্যে তোমাদের দুনিয়া আখেরাতের সফলতা। নিজের পক্ষ থেকে কোনো পথ নির্ধারণ করে চলতে আরম্ভ করা যে, আমি তো এটা করবো, এটা ঠিক নয়। তাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো না। কেউ যদি একথা চিন্তা করে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন তা করতে আমার লজ্জা বোধ হয়, তাহলে সে যেন দাবি করছে যে, আমার মর্যাদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উর্ধ্বে, আমি বড়ো মানুষ, এজন্যে আমি এ কাজ করি না। নাউযুবিল্লাহ। এটাও মূলত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সাহাবায়ে কেরামের ঘটনায় পাওয়া যায়।

---

৬. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৩৭

বৃষ্টির সময় ঘরে নামায পড়ার ছাড়

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন যে, যদি বৃষ্টি হয়, আর কাদা এতো বেশি হয় যে, মানুষের চলতে কষ্ট হয়, পদস্খলনের আশঙ্কা হয়, কাপড় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তখন শরীয়ত মসজিদের পরিবর্তে ঘরে নামায পড়ার ছাড় দিয়েছে।[১]

এখন আমরা শহরে বাস করি। যেখানে গলি ও সড়ক পাকা। এ কারণে বৃষ্টি হলে এতো কাদা হয় না যে, মানুষের চলা-ফেরা কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু যেখানে কাঁচা বাড়ি ও কাঁচা গলি রয়েছে, সেখানে আজও এ হুকুম বিদ্যমান যে, এমতাবস্থায় জামাত মাফ হয়ে যায়। ঘরে নামায পড়া জায়েয হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাদ রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। একবার তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। আযানের সময় হলো। সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। মুয়াযযিন আযান দিলো। তারপর তিনি মুয়াযযিনকে বললেন, ঘোষণা করে দাও,

اَلصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ

অর্থাৎ, সকলে নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ুন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও এ কথাই প্রমাণিত আছে যে, এমন ক্ষেত্রে এ ঘোষণা দেওয়া উচিত। এখন মানুষের জন্যে এটা ছিলো খুবই অপরিচিত ব্যাপার। সারাজীবন তো দেখে এসেছে যে, মসজিদ থেকে ঘোষণা হয়-

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

'নামাযের জন্যে এসো, কামিয়াবির জন্যে এসো।'

কিন্তু এখানে উল্টা ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে, নিজেদের ঘরে নামায পড়ো। সুতরাং লোকেরা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নিকট আপত্তি করলো যে, হযরত আপনি এ কি করছেন! আপনি মানুষদেরকে মসজিদে

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮১, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৯৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৫০৫০

আসতে নিষেধ করছেন। উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন,

نَعَمْ أَفْعَلُ ذٰلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي وَمِنْكَ

'হ্যাঁ, আমি এমন ঘোষণাই করাবো। কারণ, এ ঘোষণাও সেই সত্তা করিয়েছেন, যিনি আমার থেকে উত্তম এবং তোমাদের থেকেও উত্তম।'[৮]

তাই কোনো ব্যক্তি যদি বলে এমন ঘোষণা করা আমার কাছে খারাপ লাগে, এমন ঘোষণা করতে আমার লজ্জা বোধ হয়, তার অর্থ হবে এই যে, তুমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘোষণা দিয়েছেন, এ ছাড় দিয়েছেন, আর তুমি বলছো যে, এ ছাড় দেবো না। এরূপ ঘোষণা করা আমার কাছে খারাপ লাগে।

মোটকথা, দ্বীনের যে কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও তাঁর তা'লীম থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নিষেধাজ্ঞাও এ আয়াতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহকে ভয় করো

এরপর বলেন,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তা'আলা সব শোনেন, সব জানেন।'

যাই হোক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার তিনটি দৃষ্টান্ত তো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আরো কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা এখনো রয়ে গেছে। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ হায়াতে রাখলে আগামী জুমআ-তে আলোচনা করবো।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৮

ভ্রাতৃত্ব একটি ইসলামী বন্ধন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ[১]

আয়াতের অর্থ

যে আয়াত আমি এখন আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করলাম, এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, সমস্ত মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। তাই তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য বা ঝগড়া হলে তোমাদের উচিত তাদের মাঝে আপোস করানো এবং আপোসকামিতায় আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা আল্লাহর রহমতের হকদার হও।

ঝগড়া দ্বীনকে মুণ্ডন করে

কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে চিন্তা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া কোনো মূল্যেই পছন্দনীয় নয়। মুসলমানদের মাঝে লড়াই-ঝগড়া হোক, পরস্পরে টানাপোড়েন হোক

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ৬, পৃঃ ১৪০-১৬১, ৩১ শে জানুয়ারি ১৯৯২, জুমাবার, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. হুজরাত : ১০

বা মনোমালিন্য হোক, তা আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় নয়, বরং হুকুম হলো পারস্পারিক মনোমালিন্য ঝগড়া-বিবাদ, ঘৃণা ও শত্রুতা যে কোনোভাবে যথাসাধ্য বিলুপ্ত করো। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সেই জিনিসের কথা বলবো, যা নামায, রোযা ও সদকা থেকে উত্তম? তিনি ইরশাদ করলেন-

إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

'মানুষের মধ্যে আপোস করানো। কারণ পরস্পরে ঝগড়া মুণ্ডনকারী।'[২]

অর্থাৎ, মুসলমানদের পরস্পরে ঝগড়া দেখা দিলে, বিপর্যয় সৃষ্টি হলে, একে অপরের নাম নিতে না চাইলে, একে অপরের সাথে কথা বন্ধ করে দিলে, বরং পরস্পরে হাত ও মুখ দ্বারা ঝগড়া শুরু করলে এসব জিনিস মানুষের দ্বীনকে মুন্ডন করে দেয়। অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে দ্বীনের যেই জযবা আছে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের যেই প্রেরণা আছে, তা এর মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরিশেষে মানুষের দ্বীন বরবাদ হয়ে যায়। এজন্যে বলেছেন যে, পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচো।

অন্তরকে ধ্বংসকারী জিনিস

বুযুর্গগণ বলেছেন, পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করা এবং একে অপরের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা মানুষের অন্তরকে এতো বেশি ধ্বংস করে যে, এরচে' অধিক ধ্বংসকারী আর কিছু নেই। মানুষ নামাযও পড়ছে, রোযাও রাখছে, তাসবীহও পাঠ করছে, ওযীফা ও নফল নামাযও পাঠ করছে, এতো সব কিছুর সাথে সাথে সে ঝগড়া-বিবাদও করছে, তাহলে এ ঝগড়া-বিবাদ তার অন্তরকে বরবাদ করে দিবে। তাকে অন্তঃসার শূন্য করে ছাড়বে। কারণ এ ঝগড়ার ফলে মানুষের অন্তরে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। আর বিদ্বেষের বৈশিষ্ট্য হলো তা মানুষকে ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয় না। ফলে ঐ মানুষ অন্যের প্রতি কখনো হাত দ্বারা বাড়াবাড়ি করবে, কখনো মুখ দ্বারা সীমালঙ্ঘন করবে, কখনো অন্যের আর্থিক হক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

---

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৩৩, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৭৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৬২৩৬

আল্লাহর দরবারে আমল পেশ করা

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে সমস্ত মানুষের আমল আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয় এবং বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

আল্লাহর সামনে তো সবসময় বান্দার আমল আছেই। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির আমল সম্পর্কে অবগত। এমনকি অন্তরের ভেদ সম্পর্কেও জানেন যে, কার অন্তরে কোন সময় কোন চিন্তা জাগ্রত হচ্ছে। তাই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে এ হাদীসের অর্থ কি যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে আমল পেশ করা হয়।

মূলত আল্লাহ ত'আলা সবকিছুই জানেন, কিন্তু তিনি তাঁর রাজত্বের এই ব্যবস্থাপনা রেখেছেন যে, এ দুই দিন মানুষের আমল পেশ করা হয়, যাতে তার ভিত্তিতে তাদের জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা করা যায়।

ঐ ব্যক্তিকে আটকে দেওয়া হোক

মোটকথা, আমল পেশ করার পর যখন কোনো মানুষ সম্পর্কে জানা যায় যে, এ ব্যক্তি এ সপ্তাহে ঈমানের হালতে ছিলো এবং সে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমি আজকে তাঁর জন্যে ক্ষমা ঘোষণা করলাম। অর্থাৎ, এ ব্যক্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না, বরং কোনো এক সময় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কারণে তার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হোক। কিন্তু একই সাথে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে,

إِلَّا امْرَأً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

'কিন্তু যেই দুই ব্যক্তির মাঝে পরস্পরে বিদ্বেষ রয়েছে তাকে আটকিয়ে দেওয়া হোক। তাদের জান্নাতী হওয়ার ফয়সালা আমি এখনই করছি না, যতোক্ষণ না তাদের মাঝে পরস্পরে সন্ধি স্থাপন হয়।'[৩]

---

৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৫২, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৭০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৬৯২, মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, হাদীস নং ১৪১৪

বিদ্বেষ থেকে কুফরীর আশঙ্কা

প্রশ্ন হলো, এ ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা কেন আটকিয়ে দেওয়া হলো? আসল কথা হলো, যে ব্যক্তি গোনাহ করবে আইন অনুসারে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে তারপর জান্নাতে যাবে, কিন্তু অন্য যতো গোনাহ আছে সেগুলো সম্পর্কে এ আশঙ্কা নেই যে, ঐ গোনাহ তাকে কুফরী ও শিরকে লিপ্ত করবে। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যেহেতু ঈমানদার তাই তার জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা এখনই দিয়ে দাও। তার যতো গোনাহ আছে, সেগুলো থেকে যদি সে তওবা করে তাহলে মাফ হয়ে যাবে, আর যদি তওবা না করে তাহলে বেশির চে' বেশি গোনাহের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে। কিন্তু শক্রতা ও বিদ্বেষ এমন গোনাহ, যার সম্পর্কে আশঙ্কা রয়েছে যে, এই গোনাহ তাকে কুফর ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত করে দিবে এবং তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্যে তার জান্নাতী হওয়ার ফয়সালা ঐ সময় পর্যন্তের জন্যে আটকিয়ে দাও, যতোক্ষণ পর্যন্ত এরা পরস্পরে সন্ধি স্থাপন না করে। এর দ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, মুসলমানদের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কি পরিমাণ অপছন্দনীয়।

শবে বরাতেও মাফ হবে না

শবে বরাত সম্পর্কে এ হাদীস আপনারা শুনে থাকবেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এ রাতে আল্লাহ তা'আলার রহমত মানুষের দিকে ধাবিত হয়। এ রাতে আল্লাহ তা'আলা কাল্‌ব গোত্রের ছাগল পালের দেহে যে পরিমাণ পশম রয়েছে, সে পরিমাণ মানুষকে মাফ করেন। কিন্তু দুই ব্যক্তি এমন রয়েছে, তাদেরকে এ রাতেও মাফ করা হয় না। এক ঐ ব্যক্তি, যার অন্তরে অন্য মুসলমানের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও শক্রতা রয়েছে। যে রাতে আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরজা উন্মুক্ত থাকে, রহমতের বাতাস চলতে থাকে, তখনও ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে তার কাপড়ের অংশ গিরার নিচে ঝুলিয়ে দেয়, তাকেও ক্ষমা হবে না।[৪]

---

৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৩৮০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৩৫৩

'বুগয্'-এর হাকীকত

'বুগয্'-এর হাকীকত হলো, অন্যের অকল্যাণ চিন্তা করা। যে কোনোভাবে তার ক্ষতি হোক, বা তার বদনাম হোক, মানুষ তাকে খারাপ মনে করুক, অসুখে পড়ুক, তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাক, কষ্টে পতিত হোক, অন্তরে অন্য ব্যক্তির অকল্যাণ কামনা সৃষ্টি হওয়াকে 'বুগয' বলে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি মাজলুম হয়, অন্য কেউ তার উপর জুলুম করেছে। বলাবাহুল্য যে, মাজলুমের অন্তরে জালেমের বিরুদ্ধে আবেগ সৃষ্টি হয়। তার উদ্দেশ্য হয় নিজের থেকে তার জুলুম প্রতিহত করা। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা জালেম থেকে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করার এবং নিজের থেকে জুলুমকে প্রতিহত করার অনুমতি দিয়েছেন। তখন মাজলুম জালেমের ঐ জুলুমকে খারাপ মনে করবে, কিন্তু তখনও জালেম ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। তার অকল্যাণ চিন্তা করবে না। তাহলে মাজলুমের এ কাজ 'বুগযে'র অন্তর্ভুক্ত হবে না।

হিংসা ও বিদ্বেষের উত্তম চিকিৎসা

বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় হিংসা থেকে। অন্তরে প্রথমে অন্যের প্রতি হিংসা সৃষ্টি হয় যে, সে আগে বেড়ে গিয়েছে, আমি পিছে রয়ে গিয়েছি। তার আগে বাড়ার কারণে অন্তরে জ্বালা-পোড়া শুরু হয়। সংকোচন শুরু হয়। অন্তরে এ বাসনা জাগে যে, যে কোনোভাবে আমি তার ক্ষতি করবো। কিন্তু ক্ষতি করা তার ক্ষমতাভুক্ত না হওয়ার ফলে মনে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তার পরিণতিতে মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এজন্যে বিদ্বেষ থেকে বাঁচার প্রথম পথ এই যে, নিজের অন্তর থেকে প্রথমে হিংসা দূর করবে। বুযুর্গগণ হিংসা দূর করার পদ্ধতি এই বলেছেন যে, তার জন্যে দু'আ করবে- হে আল্লাহ! তাকে আরো বেশি উন্নতি দান করুন। তার জন্যে দু'আ করার সময় অন্তরে অনেক বেশি কষ্ট হবে। কারণ, অন্তর তো তার অবনতি চাচ্ছে, বরং তার ক্ষতি কামনা করছে, কিন্তু মুখে সে দু'আ করছে যে, হে আল্লাহ! তাকে আরো উন্নতি দান করুন। মনে যতো কষ্টই হোক, কিন্তু জোর করে তার জন্যে দু'আ করবে। হিংসা দূর হওয়ার এটা উত্তম চিকিৎসা। হিংসা দূর হলে ইনশাআল্লাহ বিদ্বেষও দূর হবে। এজন্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অন্তরে অনুসন্ধান করবে, যার সম্পর্কেই মনে হবে যে, তার ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ রয়েছে, তাকে পাঁচওয়াক্ত নামাযের দু'আর মধ্যে শামিল করে নিবে। এটা হিংসা-বিদ্বেষের উত্তম চিকিৎসা।

শত্রুর প্রতি দয়া করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ

লক্ষ করুন! মক্কার মুশরিকরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর জুলুম-অত্যাচার ও কষ্ট-নিপীড়নে কোনোরূপ ত্রুটি করেনি। এমনকি তার রক্তপিপাসু হয়েছে। ঘোষণা করে দিয়েছে, যে ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে আনবে, তাকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। উহুদ যুদ্ধের সময় তার উপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। এমনকি তাঁর নূরানী চেহারা আহত হয়। তাঁর পবিত্র দাত শহীদ হয়। কিন্তু তাঁর মুখে তখন এই দু'আ ছিলো-

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

হে আল্লাহ! আমার কওমকে হেদায়েত দান করুন। তারা জানে না, এরা অজ্ঞ-মূর্খ। আমার কথা বুঝতে পারছে না এবং এ কারণে আমার উপর জুলুম করছে।[৫]

চিন্তা করুন! তারা ছিলো জালেম। তাদের জুলুমের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিলো না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর অন্তরে কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষের কোনো চিন্তা জাগেনি। তাই এটাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরাট সুন্নাত। তাঁর আদর্শ হলো, অকল্যাণের বদলা অকল্যাণের মাধ্যমে দিবে না, বরং তাদের জন্যে দু'আ করবে। এটাই হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করার উত্তম চিকিৎসা।

যাই হোক, আমি বলছিলাম যে, পারস্পরিক ঝগড়া অবশেষে অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ঝগড়া যখন লম্বা হয়, তখন অন্তরে অবশ্যই বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। আর যখন বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় তখন অন্তর জগত ধ্বংস হয়ে যায়। অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ কারণে হুকুম এই যে, পরস্পরে ঝগড়া থেকে বাঁচো। বিতর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকো।

ঝগড়া ইলমের নূর নষ্ট করে দেয়

এমনকি ইমাম মালেক রহ. বলেন যে, এক ঝগড়া তো হয় দৈহিক, যার মধ্যে হাতাহাতি হয়। আরেক ঝগড়া হয় শিক্ষিত মানুষ ও আলেমদের মাঝে

৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৪৭, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪০১৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৪২৯

তাকে বলে 'মুজাদালা', 'মুনাযারা' ও 'মুবাহাসা'। এক আলেম একটা কথা তুলে ধরলো, আরেকজন তার বিপরীত বললো। সে একটি দলিল দিলো, অপরজন তার দলিল খন্ডন করলো। প্রশ্ন-উত্তর ও খন্ডনের এক অন্তহীন ধারা শুরু হলো। এটাকেও বুযুর্গগণ কখনো পছন্দ করেননি। এর ফলে অন্তরের নূর দূর হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম মালেক বিন আনাস রহ. বলেন,

اَلْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ فِي الْعِلْمِ يَذْهَبُ بِنُورِ الْعِلْمِ

ইলমী ঝগড়া ইলমের নূরকে দূর করে দেয়।[৬]

লক্ষ করুন! এক তো হলো 'মুযাকারা', যেমন এক আলেম একটি মাসআলা তুলে ধরলো, অন্য আলেম বললো যে, এ মাসআলার মধ্যে আমার এই প্রশ্ন রয়েছে। এবার উভয়ে বসে বোঝাপড়ার মাধ্যমে এ মাসআলার সমাধান করতে লাগলো, একে বলে 'মুযাকারা'- এটা খুবই ভালো কাজ। কিন্তু এভাবে ঝগড়া করা যে, এক আলেম অপরের বিরুদ্ধে কোনো মাসআলার বিষয়ে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিলো, লিফলেট বা পুস্তিকা প্রকাশ করলো। অপরজন তার বিরুদ্ধে কিতাব ছাপিয়ে দিলো। এভাবে ধারা চলতে থাকলো। এক আলেম অন্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিলো, দ্বিতীয় জন এর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিলো। এভাবে কেবলই বিরোধিতার উদ্দেশ্যে বিরোধিতা চলতে থাকলো, একে 'মুজাদালা' ও ঝগড়া বলে। যাকে আমাদের বুযুর্গগণ ও ইমামগণ মোটেই পছন্দ করেননি।

হযরত থানভী রহ.-এর বাকশক্তি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব রহ.-কে আল্লাহ তা'আলা এমন বাকশক্তি দান করেছিলেন যে, কোনো ব্যক্তি যে কোনো বিষয়ে বাহাস করতে এলে তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে তাকে নিরুত্তর করে দিতেন। আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. ঘটনা শুনিয়েছিলেন যে, একবার হযরত থানভী রহ. অসুস্থ ছিলেন, বিছানায় শোয়া ছিলেন, তখন তিনি ইরশাদ করেন,

'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার রহমতের উপর ভরসা করে বলছি যে, সারা দুনিয়ার সকল বুদ্ধিমান একত্র হয়ে এলে এবং ইসলামের যে কোনো সাধারণ মাসআলার উপর কোনো আপত্তি করলে এ অধম ইনশাআল্লাহ দুই

---

৬. তারতীবুল মাদারিক ও তাকরীবুল মাসালিক

মিনিটের মধ্যে তাদেরকে নিরুত্তর করতে সক্ষম। তারপর বলেন, আমি তো একজন সাধারণ তালিবে ইলম, আলেমদের শান তো অনেক উর্ধ্বে।'

সুতরাং বাস্তবেই হযরত থানভী রহ.-এর নিকট কেউ কোনো বিষয়ে কথা বললে সে কয়েক মিনিটের অধিক অগ্রসর হতে পারতো না।

'মুনাযারা' দ্বারা সাধারণত উপকার হয় না

হযরত থানভী রহ. নিজেই বলেন যে, আমি যখন দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দরসে নিযামীর নেসাব শেষ করি, তখন আমার বাতেল ফেরকার সঙ্গে 'মুনাযারা' করার আগ্রহ ছিলো। সুতরাং কখনো শিয়াদের সঙ্গে 'মুনাযারা' হতো, কখনো গাইরে মুকাল্লিদদের সঙ্গে, কখনো বেরেলবীদের সঙ্গে, কখনো হিন্দুদের সঙ্গে এবং কখনো শিখদের সঙ্গে 'মুনাযারা' হতো। নতুন নতুন পাশ করেছি, এজন্যে খুব আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে এসব 'মুনাযারা' করতে থাকি। কিন্তু পরবর্তীতে আমি 'মুনাযারা' থেকে তওবা করি। কারণ, আমার অভিজ্ঞতা হলো যে, এর দ্বারা উপকার হয় না, বরং নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এজন্যে আমি তা ছেড়ে দেই।

মোটকথা, আমাদের বড়োরা যখন হক ও বাতিলের মধ্যেও 'মুনাযারা' করা পছন্দ করেননি, তখন নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার ভিত্তিতে বা জাগতিক বিষয়ের ভিত্তিতে 'মুনাযারা' ও ঝগড়া-বিবাদ করাকে কি করে পছন্দ করবেন? ঝগড়া আমাদের অন্তরকে খারাপ করে দেয়।

জান্নাতের মধ্যে ঘরের দায়িত্ব

একহাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ

'আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মাঝে ঘর দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি, যে হকের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া ছেড়ে দেয়।'[৭]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হকের উপর থাকা সত্ত্বেও এ কথা চিন্তা করে যে, আমি হকের বিষয়ে অধিক দাবি খাড়া করলে ঝগড়া হবে, তাই এই হক ছেড়ে দিচ্ছি, যাতে ঝগড়া মিটে যায়। তার জন্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৭. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯১৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৫০

ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, আমি তাকে জান্নাতের মাঝখানে ঘর দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি।

এর দ্বারা অনুমান করুন যে, ঝগড়া মেটানোর ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতো ফিকির ছিলো। যাতে পরস্পরে ঝগড়া মিটে যায়। হ্যাঁ, ব্যাপার যদি অনেক বেড়ে যায়, সহ্যের অতিরিক্ত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় মাজলুমের জন্যে জালেমকে প্রতিহত করারও অনুমতি রয়েছে। তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করাও জায়েয। তবে যথাসাধ্য বিবাদ নিরসনের চেষ্টা করা উচিত।

ঝগড়ার ফল

আজ আমাদের সমাজ ঝগড়ায় ভরে গিয়েছে। এর বেবরকতী ও অন্ধকার পুরো সমাজে এ পরিমাণ ছেয়ে গিয়েছে যে, ইবাদতের নূর অনুভূত হয় না। ছোট ছোট বিষয়ে ঝগড়া চলছে। কোথাও পরিবারে পরিবারে ঝগড়া, কোথাও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, কোথাও বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া, কোথাও ভাই-বেরাদারের মধ্যে ঝগড়া, কোথাও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ঝগড়া, এমনকি ওলামায়ে কেরামের মাঝে পরস্পরে ঝগড়া হচ্ছে, দ্বীনদারদের মাঝে ঝগড়া হচ্ছে, পরিণতিতে দ্বীনের নূর বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ঝগড়া কীভাবে দূর হবে

এখন প্রশ্ন হলো, এ ঝগড়া মিটবে কীভাবে? হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ আলী ছাহেব রহ.-এর একটি মালফূয আপনাদেরকে শুনাচ্ছি, যা অতি বড়ো সোনালী মূলনীতি। এই মূলনীতির উপর যদি মানুষ আমল করে, তাহলে আশা করা যায় পঁচাত্তর শতাংশ ঝগড়া তাৎক্ষণিকভাবে মিটে যাবে। হযরত বলেন,

'একটি কাজ এই করো যে, দুনিয়াদারদের থেকে আশা করা ছেড়ে দাও। যখন আশা ছেড়ে দিবে, তখন ইনশাআল্লাহ অন্তরে কখনো ঝগড়া ও বিদ্বেষের চিন্তা জাগবে না।'

অন্যদের প্রতি যেসব অভিযোগ-আপত্তি জন্মায়, যেমন অমুক ব্যক্তির এমন করা উচিত ছিলো সে তা করেনি, আমার যেভাবে সম্মান করা উচিত ছিলো সেভাবে সম্মান করেনি, যেভাবে আমার আদর-আপ্যায়ন করা দরকার ছিলো তা করেনি, বা অমুকের প্রতি আমি অমুক দয়া করেছিলাম সে তার

বদলা দেয়নি ইত্যাদি। এসব অভিযোগ এজন্যে জন্মায় যে, অন্যের প্রতি আশা-প্রত্যাশা পোষণ করেছে। যখন সে আশা পুরা হয়নি, তখন পরিণতিতে অন্তরে গিট লেগেছে যে, সে আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করেনি। অন্তরে অভিযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল বলেছেন যে, কারো প্রতি তোমার কোনো অভিযোগ সৃষ্টি হলে তুমি তাকে গিয়ে বলো যে, তোমার প্রতি আমার এ অভিযোগ রয়েছে। তোমার এ কাজ আমার ভালো লাগেনি আমার পছন্দ হয়নি, আমার খারাপ লেগেছে। একথা বলে নিজের মনকে পরিষ্কার করে নাও। বর্তমানে কথা বলে মন ছাপ করার রীতি শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন ঐ বিষয় অন্তরে পোষণ করে বসে থাকে। পরবর্তীতে যখন আরেক ব্যাপার দেখা দেয় তখন আরেকটি গিট লাগে। সুতরাং আস্তে আস্তে এ গিট অন্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিণতিতে তা বিদ্বেষের আকার ধারণ করে। বিদ্বেষের ফলে পরস্পরে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

আশা রেখো না, ঝগড়া শেষ হয়ে যাবে

এজন্যে হযরত থানভী রহ. বলেন, এভাবে ঝগড়ার শিকড় কেটে দাও যে, কারো থেকে কোনো আশাই রেখো না। মানুষের প্রতি কেন আশা পোষণ করছো যে, অমুক এই দিবে, অমুক এই কাজ করবে, সব আশা কেবল আল্লাহ তা'আলার প্রতি রাখো, যিনি খালেক ও মালেক। বরং দুনিয়ার মানুষের প্রতি কেবল অকল্যাণের আশা রাখো যে, তাদের থেকে সবসময় অকল্যাণই পাওয়া যাবে। অকল্যাণের আশা করার পর যদি ভালো কিছু কখনো পাও তাহলে আল্লাহর শোক আদায় করো যে, হে আল্লাহ! আপনার মেহেরবানী, আপনার দয়া। আর যদি অকল্যাণ পাও তাহলে চিন্তা করো যে, আমার তো পূর্ব থেকেই অকল্যাণের আশা ছিলো। তাহলে এর ফলে অন্তরে অভিযোগ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না। তখন শত্রুতাও সৃষ্টি হবে না, ঝগড়াও হবে না। তাই কারো থেকে কোনো আশাই রেখো না।

বিনিময় গ্রহণের নিয়ত করো না

এমনিভাবে হযরত থানভী রহ. আরেকটি মূলনীতি এই বলেছেন যে, তুমি যখন অন্য কারো সঙ্গে কোনো সদাচরণ করবে, তখন শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্যে করবে। যেমন কাউকে সাহায্য করলে বা কারো জন্যে সুপারিশ করলে বা কারো সঙ্গে সদব্যবহার করলে বা কাউকে সম্মান করলে, তখন

একথা চিন্তা করো যে, আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্যে এ আচরণ করছি। নিজের আখেরাত গড়ার জন্যে এ কাজ করছি। এ নিয়তে যখন সদাচরণ করবে তখন তার বিনিময়ের আশাই থাকবে না। এবার মনে করুন! আপনি এক ব্যক্তির সঙ্গে সদাচরণ করলেন, কিন্তু সে আপনার সঙ্গে সদাচরণের বদলায় সদাচরণ করলো না। কখনোই আপনার দয়াকে স্বীকার করলো না। এমতাবস্থায় আপনার অন্তরে অবশ্যই এ চিন্তা জাগবে যে, আমি তার সঙ্গে সদাচরণ করলাম আর সে আমার সঙ্গে উল্টা অসৎ ব্যবহার করলো। কিন্তু আপনি যদি তার সঙ্গে শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে সদাচরণ করে থাকেন, তাহলে এমতাবস্থায় তার অসদাচরণে আপনার অভিযোগ সৃষ্টি হবে না। কারণ, আপনার উদ্দেশ্য ছিলো কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। এই দুই মূলনীতির উপর যদি আমরা সকলে আমল করি, তাহলে পারস্পরিক সকল ঝগড়া মিটে যাবে এবং এ হাদীসের উপরও আমল হবে, যা এখন আমি আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। যার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হকের উপর থেকে বিবাদ ত্যাগ করবে, আমি তাকে জান্নাতের মাঝখানে ঘর দেওয়ার দায়িত্ব নিবো।

হযরত মুফতী ছাহেব রহ.-এর বিরাট কুরবানী

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-কে সারা জীবন এ হাদীসের উপর আমল করতে দেখেছি। বিবাদ নিরসনের জন্যে তিনি বড়ো থেকে বড়ো হক ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। তাঁর এমন একটি ঘটনা শুনাচ্ছি, বর্তমানে মানুষের যার উপর বিশ্বাস করা কঠিন মনে হয়। এই দারুল উলূম, যা এখন কৌরঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত, প্রথমে নানকওয়াড়ায় ছোট্ট একটি ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কাজ বেড়ে গেলে ঐ জায়গা দারুল উলূমের জন্যে সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। বিস্তৃত জায়গার প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সাহায্য লাভ হয় যে, একেবারে শহরের মাঝখানে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক বড়ো ও বিস্তৃত জায়গা পাওয়া যায়। যেখানে বর্তমানে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ ওসমানী রহ.-এর মাযারও সেখানে রয়েছে। এই বিস্তৃত জায়গা দারুল উলূম করাচীর নামে এলোট হয়। জায়গার কাগজ হাতে চলে আসে। জায়গা দখলে চলে আসে। একটি কক্ষও বানিয়ে দেওয়া হয়। টেলিফোনের সংযোগও দেওয়া হয়। তারপর দারুল উলূমের ভিত্তিপ্রস্তর রাখার সময় একটা

সমাবেশও করা হয়। যার মধ্যে পুরো পাকিস্তানের বড়ো বড়ো আলেম তাশরীফ আনেন। ঐ সমাবেশের সময় কিছু লোক ঝগড়া শুরু করে যে, এই জায়গা দারুল উলূমের পাওয়া উচিত ছিলো না, বরং অমুকের পাওয়া উচিত ছিলো। ঘটনাক্রমে ঝগড়ার মধ্যে তারা এমন কিছু বড়ো ব্যক্তিত্বকেও শামিল করে নেয়, যারা ছিলেন হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের জন্যে সম্মানের পাত্র। ওয়ালেদ ছাহেব তো প্রথমে যে কোনোভাবে ঝগড়া মিটাতে চাইলেন, কিন্তু ঝগড়া শেষ হলো না। ওয়ালেদ ছাহেব চিন্তা করলেন, যে মাদরাসার সূচনাই হচ্ছে ঝগড়ার মাধ্যমে, তার মধ্যে কী বরকত হবে? সুতরাং হযরত ওয়ালেদ ছাহেব তার এই ফয়সালা শুনিয়ে দিলেন যে, আমি এ জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি।

আমি এর মধ্যে বরকত দেখছি না

দারুল উলূমের ব্যবস্থাপনা পরিষদ এ সিদ্ধান্ত শুনে হযরত ওয়ালেদ ছাহেবকে বললেন, হযরত! এ আপনি কেমন ফয়সালা করছেন? এতো বড়ো জায়গা তাও শহরের মাঝখানে এমন জায়গা পাওয়া তো কঠিন। এ জায়গা আপনি পেয়েছেন, তা আপনার দখলেও আছে, আপনি এমন জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন! হযরত ওয়ালেদ ছাহেব উত্তরে বললেন যে, আমি ব্যবস্থাপনা পরিষদকে এ জায়গা ছাড়তে বাধ্য করবো না। কারণ, ব্যবস্থাপনা পরিষদ মূলত এই জায়গার মালিক হয়ে গিয়েছে। আপনারা চাইলে এখানে মাদরাসা করুন। আমি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো না। কারণ, যে মাদরাসার ভিত্তি ঝগড়ার উপর রাখা হচ্ছে, ঐ মাদরাসার মধ্যে আমি বরকত দেখছি না। তারপর হাদীস শোনালেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হকের উপর থেকে ঝগড়া ছেড়ে দিবে তাকে জান্নাতের মাঝখানে ঘর দেওয়ার জন্যে আমি দায়িত্ব নিবো। আপনারা বলছেন যে, শহরের মাঝখানে এমন জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, আমি তাকে জান্নাতের মাঝখানে ঘর দেওয়াবো। একথা বলে ঐ জায়গা ছেড়ে দেন। বর্তমান যুগে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন যে, এমন ঝগড়ার কারণে কোনো ব্যক্তি এতো বড়ো জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উপর যার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, সেই এ কাজ করতে পারে। এরপর আল্লাহ তা'আলা এমন মেহেরবানী করলেন যে, কয়েক মাস পরেই ঐ জমির থেকে কয়েকগুণ বড়ো জমি দান করলেন। যেখানে বর্তমানে দারুল উলূম

প্রতিষ্ঠিত। এটা তো আমি আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করলাম। অন্যথায় হযরত ওয়ালেদ ছাহেবকে আমি সারাজীবন এ হাদীসের উপর যথাসাধ্য আমল করতে দেখেছি। হ্যাঁ, তবে যদি অন্য ব্যক্তি ঝগড়ার মধ্যে আটকিয়েই ফেলে, প্রতিহত করা ছাড়া কোনো উপায় না থাকে, তবে সে ভিন্ন কথা। আমরা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বসে যাই যে, অমুক সময় অমুক ব্যক্তি এ কথা বলেছিলো, অমুক এই করেছিলো, এখন সবসময়ের জন্যে তা অন্তরে বসিয়ে নেই। ঝগড়া দাঁড়িয়ে যায়। আজ আমাদের পুরো সমাজকে এই জিনিস ধ্বংস করছে। ঝগড়া মানুষের দ্বীনকে মুণ্ডন করে। মানুষের অন্তরকে বরবাদ করে। এজন্যে আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরে ঝগড়া মিটিয়ে দিন। যদি দুই মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া দেখেন, তাহলে তাদের মধ্যে আপোস করার পুরোপুরি চেষ্টা করুন।

আপোস করানো ছদকা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানবদেহে যতো গিরা আছে, প্রত্যেক গিরার পক্ষ থেকে প্রতি দিন একটা করে সদকা করা মানুষের দায়িত্বে ওয়াজিব। কারণ, প্রত্যেক গিরা একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। আর প্রত্যেক নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। একজন মানুষের দেহের মধ্যে ৩৬০টি গিরা রয়েছে। এজন্যে প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে প্রতিদিন ৩৬০টি সদকা করা ওয়াজিব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই সদকাকে এতো সহজ করে দিয়েছেন যে, মানুষের ছোট ছোট আমলকে সদকা বলে গণ্য করেছেন। যাতে করে যে কোনোভাবে ৩৬০ সংখ্যা পুরা হয়ে যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুই মানুষের মাঝে ঝগড়া ও মনোমালিন্য ছিলো, তুমি তাদের মাঝে আপোস করিয়ে দিলে এই আপোস করানো একটা সদকা। এমনিভাবে একজন মানুষ

তার ঘোড়া বা বাহনে আরোহণ করতে চাচ্ছিলো, কিন্তু কোনো কারণে সে আরোহণ করতে পারছিলো না, তুমি তাকে আরোহণ করতে সাহায্য করলে এই সাহায্য করাও একটা সদকা, বা এক ব্যক্তি তার বাহনে মালপত্র বোঝাই করতে চাচ্ছে, কিন্তু সে বোঝাই করতে পারছে না, তুমি তাকে সাহায্য করলে, তার বাহনে উঠিয়ে দিলে, এটাও একটা সদকা। এমনিভাবে কাউকে কোনো ভালো কথা বললে- যেমন কোনো বেদনাগ্রস্থ লোককে তুমি সান্ত্বনামূলক কথা বললে বা এমন কোনো কথা কাউকে বললে, যার দ্বারা ঐ মুসলমানের অন্তর খুশি হলো, এটাও সদকা। এমনিভাবে যখন তুমি মসজিদে যাও তখন মসজিদের দিকে যতোগুলো পা ফেলো, তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ সদকা বলে গণ্য হয়। এমনিভাবে পথে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস পড়ে আছে, যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তুমি রাস্তা থেকে তা সরিয়ে ফেললে, এটাও একটা সদকা।[৮]

যাই হোক, এ হাদীসের মধ্যে সর্বপ্রথম যেই জিনিসকে সদকা বলে গণ্য করা হয়েছে, তা হলো দু'জন মুসলমানের মধ্যে আপোস করানো। এর দ্বারা জানা গেলো যে, আপোস করানো সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ।

ইসলামের কারিশমা

وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا[৯]

হযরত উম্মে কুলসুম একজন মহিলা সাহাবী। তিনি উকবা ইবনে আবী মুয়াইতের মেয়ে। উকবা ইবনে আবী মুয়াইত ছিলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানের দুশমন। চরম পর্যায়ের মুশরিক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে আবু জেহেল ও উমাইয়া ইবনে আবু খলফের মতো কট্টর মুশরিক যারা ছিলো, এও তাদের অন্যতম ছিলো।

---

৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫০৮ ও ২৭৬৭, সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৬৭৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৭৩৬

৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৯৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭১৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৬০১১

এ এমন এক ব্যক্তি ছিলো, যার জন্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ-দু'আ করেছিলেন। তিনি বদ-দু'আ করেছিলেন যে,

اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ

'হে আল্লাহ! আপনার হিংস্র প্রাণীসমূহের মধ্যে থেকে কোনো এক হিংস্র প্রাণী এর উপর চাপিয়ে দিন।'[১০]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বদ-দু'আ কবুল হয়েছিলো। এক সিংহের আক্রমণে তার মৃত্যু হয়। বাপ তো ছিলো ইসলামের এমন শত্রু, কিন্তু মেয়ে হযরত উম্মে কুলসুম রাযি.-কে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দৌলত দান করেন, তিনি সাহাবী হন।

এমন ব্যক্তি মিথ্যুক নয়

যাই হোক, হযরত উম্মে কুলসুম বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্যে ভালো কোনো কথা এদিক থেকে সেদিক লাগায় বা একজনের কথা অপরজনের নিকট এমনভাবে পৌঁছায় যে, তার অন্তরে মূল্যবোধ জাগে এবং ঘৃণা দূর হয়, এমন ব্যক্তি মিথ্যুক নয়।

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি এমন কথা বলছে, যা বাহ্যত সত্য নয়। কিন্তু একথা সে এজন্যে বলছে, যাতে তার অন্তর থেকে অন্য মুসলমানের খারাবী বের হয়ে যায়। পরস্পরের অন্তরের মলীনতা দূর হয়ে যায়। ঘৃণা শেষ হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে যদি সে এমন কথা বলে তাহলে সে মিথ্যুকদের মধ্যে গণ্য হবে না।

স্পষ্ট মিথ্যা জায়েয নেই

ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় মিথ্যা বলা জায়েয নেই। তবে যদি এমন অস্পষ্ট কথা বলে, যার বাহ্যিক অর্থ তো ঘটনার বিপরীত, কিন্তু মনে মনে এমন অর্থ উদ্দেশ্য নেয়, যা ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, দুই লোকের মধ্যে ঘৃণা ও বিবাদ চলছে। এ ওর নাম শুনতে রাজি না, ও এর নাম শুনতে রাজি না। এখন এক ব্যক্তি তাদের একজনের নিকট গেলো, আর সে অন্য জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করলো

১০. ফাতহুল বারী - খণ্ডঃ ৪, পৃঃ ৩৯

যে, সে তো আমার এমন দুশমন। তখন এ ব্যক্তি বললো যে, তুমি তো তার নিন্দা করছো, অথচ সে তোমার কল্যাণকামী। কারণ, আমি নিজে তাকে তোমার জন্যে দু'আ করতে শুনেছি।

এখানে লক্ষ করার বিষয় হলো, সে সরাসরি দু'আ করতে শোনেনি, কিন্তু মনে মনে সে উদ্দেশ্য নিয়েছে যে, সে তাকে এভাবে দু'আ করতে শুনেছে যে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

হে আল্লাহ! সমস্ত মুমিনকে আপনি মাফ করে দিন।

সুতরাং এও যেহেতু একজন মুসলমান, তাই এ দু'আর মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত আছে। এখন সামনের ব্যক্তি তো মনে করবে যে, আমার নাম নিয়ে দু'আ করেছে। এমন কথা বলা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং ইনশাআল্লাহ এর জন্যেও সওয়াব পাবে।

মুখ দিয়ে ভালো কথা বের করো

যখন আল্লাহ তা'আলার কোনো বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দুই মুসলমান ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এমন কথা ঢেলে দেন, যার দ্বারা তার অন্তর থেকে অন্যের ঘৃণা দূর হয়ে যায়। তাই এমন কথা বলো না যে, তাদের মাঝে ঘৃণার আগুন তো আগে থেকেই প্রজ্বলিত ছিলো, এখন তুমি গিয়ে এমন কথা শুনালে, যা আগুনের মধ্যে তেল দেওয়ার কাজ করলো। যার ফলে ঘৃণা দূর হওয়ার পরিবর্তে আগুন আরো জ্বলে উঠলো। এটা অত্যন্ত ছোটলোকী কাজ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটা খুবই অপছন্দ।

সন্ধি করানোর গুরুত্ব

হযরত শেখ সাদী রহ.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি আপনারা শুনে থাকবেন যে,

دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز

'যে মিথ্যার দ্বারা দুই মুসলমানের মধ্যে সন্ধি স্থাপন উদ্দেশ্য হয়, তা এমন সত্য থেকে ভালো, যার দ্বারা ফেৎনা সৃষ্টি হয়।'

কিন্তু এর দ্বারা স্পষ্ট মিথ্যা বলা উদ্দেশ্য নয়। বরং দুই অর্থবিশিষ্ট কথা বলা উদ্দেশ্য। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ ধরনের মিথ্

বলার অনুমতি দিয়েছেন, এতেই আপনি অনুমান করুন যে, দুই মুসলমানের মাঝে বিবাদ নিরসনের গুরুত্ব কতো বেশি।

এক সাহাবীর ঘটনা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ছিলেন। ইতিমধ্যে বাহির থেকে দুই ব্যক্তির ঝগড়ার আওয়াজ শুনলেন। ঝগড়া ছিলো এই বিষয়ে যে, তাদের একজন অপরজনের নিকট থেকে ধার নিয়েছিলো। পাওনাদার দেনাদারের কাছে দেনার দাবি করছিলো। দেনাদার বলছিলো যে, এখন আমি পুরা ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না, তুমি কিছু ঋণ নাও, আর কিছু ছেড়ে দাও। এই ঝগড়ার মাঝে তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে যায়। ঝগড়ার মাঝে ঋণদাতা এ কথা বলে কসম খায় যে, খোদার কসম! আমি ঋণ কমাবো না। ইতিমধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘরের বাইরে চলে আসেন। বাইরে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঐ ব্যক্তি কোথায়, যে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে যে, আমি নেক কাজ করবো না? তখন সে ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং বললো যে, আমি হে আল্লাহর রাসূল। সাথে সাথে একথাও বললো যে, এ ব্যক্তি যে পরিমাণ ইচ্ছা ঋণের টাকা কম দিক, আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি।[১১]

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

এই ছিলো সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা। মাত্র আবেগে উত্তেজিত ছিলো। আওয়াজ উঁচু হচ্ছিলো। সে কম করতে বলছিলো, এ কম করতে প্রস্তুত

১১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫০৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯১১, মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, হাদীস নং ১১৩৩

ছিলো না। না কমানোর জন্যে কসমও খেয়েছিলো যে, আমি কম করবো না। এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঐ সাহাবীকে ঋণ কমানোর নির্দেশও দেননি, পরামর্শও দেননি। শুধু বলেছেন, ঐ ব্যক্তি কোথায়, যে এই কসম খাচ্ছে যে, আমি নেক কাজ করবো না? একথা শোনার সাথে সাথে তিনি নরম হয়ে যান। সব উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঝগড়া মিটে যায়। কারণ এই ছিলো যে, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে এ পরিমাণ অনুগত ছিলেন যে, রসূলের মুখে এ কথা শোনার পর আর সামনে বাড়ার সাধ্য ছিলো না। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় এই আবেগের কিছু অংশ আমাদেরকে দান করুন, সমস্ত মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক বিরোধ ও ঝগড়া মিটিয়ে দিন এবং সমস্ত মুসলমানকে পরস্পরের হক আদায় করার তওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অন্যকে কষ্ট দিবেন না*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

সে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয়

হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'মুসলমান সে, যার জিব ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।'[1]

অর্থাৎ, তার মুখ দ্বারাও কেউ কষ্ট পায়না এবং তার হাত দ্বারাও কেউ কষ্ট পায় না। এ হাদীসে যেন মুসলমানের পরিচয় বলা হয়েছে যে, মুসলমান বলাই হয় তাকে, যার মধ্যে এই গুণ পাওয়া যায়। এজন্যে যে মুসলমানের হাত ও মুখ থেকে অন্য লোক নিরাপদ নয়, মূলত সে মুসলমান বলার উপযুক্তই নয়। যেমন এক ব্যক্তি নামায পড়ে না। এখন কোনো মুফতী এ কারণে তার উপর কুফরীর ফতওয়া দিবে না যে, এ ব্যক্তি যেহেতু নামায

---

* ইসলাহি খুতুবাত, খণ্ডঃ ৮, পৃঃ ১০২-১৩৩, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৫১, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৯১০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১২২

পড়ে না তাই সে কাফের হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমান বলার উপযুক্ত নয়। কারণ, সে আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধানরে সম্পাদন করছে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তির হাত ও মুখ দ্বারা অন্য মানুষ কষ্ট পায় তার উপর যদিও মুফতী কুফরীর ফতওয়া দিবে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমান বলার যোগ্য নয়। কারণ, সে মুসলমানের কাজ করছে না। এ হাদীসের উদ্দেশ্য এই।

মুআশারাতের অর্থ

ইসলামের পাঁচটি শাখা রয়েছে-

এক. আকায়েদ

দুই. ইবাদাত

তিন. মুআমালাত

চার. আখলাক

পাঁচ. মুআশারাত

এ হাদীস মূলত ইসলামের পাঁচশাখার অন্যতম শাখা মুআশারাতের ভিত্তি মুআশারাতের অর্থ এই যে, এ দুনিয়ায় কোনো মানুষই একা থাকে না এবং একা থাকার হুকুম দেওয়াও হয়নি। দুনিয়াতে বাস করতে কারো না কারো সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়। পরিবারের লোকদের সাথে সম্পর্ক, বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক, প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক, বাজারওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক, যে জায়গায় কাজ করে সেখানের লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়। অন্যের সাথে সম্পর্ক রাখতে তাদের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করা উচিত, তাকে মুআশারাতের বিধান বলা হয়। এটাও দ্বীনের বড়ো পাঁচ শাখার একটা শাখা। কিন্তু আমাদের নির্বুদ্ধিতা ও আমলহীনতার কারণে দ্বীনের এ শাখা একেবারে দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছে। একে দ্বীনের অংশই মনে করা হয় না। এ বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব বিধান দিয়েছেন, সেদিকে মনোযোগ যায় না।

মুআশারাতের বিধানের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলাও মুআশারাতের বিধান বর্ণনার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মুআশারাতের একটি মাসআলা এই যে, যখন অন্য কোনো ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করবে, তখন ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বে তার

থেকে অনুমতি নাও যে, আমি ভিতরে আসতে পারি কি? এই অনুমতি নেওয়াকে আরবী ভাষায় 'ইসতীযান' (استئذان) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা 'ইসতীযানে'র বিধান বর্ণনা করার জন্যে কুরআনে কারীমের পরিপূর্ণ দুটি রুকূ' অবতীর্ণ করেছেন। পক্ষান্তরে কুরআনে কারীমে নামায পড়ার হুকুম প্রায় বাষট্টি জায়গায় এসেছে, কিন্তু নামায কীভাবে পড়তে হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে কারীম বলেনি। বরং তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'ইসতীযানে'র বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে কারীম নিজে দিয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনার উপর ছেড়ে দেয়নি। তাছাড়া কুরআনে কারীমে সূরায়ে হুজুরাতের বড়ো একটা অংশ মুআশারাতের বিধানসম্বলিত। একদিকে মুআশারাতের বিধানের এতো গুরুত্ব, অপরদিকে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমরা এসমস্ত বিধানের উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছি। এসব বিধানের প্রতি আমরা লক্ষ রাখি না।

হযরত থানভী রহ.-এর মুআশারাতের বিধান পুনর্জীবিত করা

আল্লাহ তা'আলা হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব রহ.-এর দ্বারা এ যুগে দ্বীনের তাজদীদের কাজ নিয়েছেন। দ্বীনের যেসব বিধান মানুষ ছেড়ে দিয়েছিলো এবং দ্বীন থেকে তা দূরে করে দিয়েছিলো তিনি সেগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। মানুষের নিকট সেগুলোর বিধান বর্ণনা করেছেন। নিজের খানকায় সেগুলোর আমলী তারবিয়াতের ইহতিমাম করেছেন। সাধারণত মানুষ বুঝতো যে, খানকা বলা হয়, যার কক্ষসমূহে বসে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' করা হয়। যিকির, তাসবীহ ও ইবাদাতে মশগুল থাকা হয়। আর কিছু নয়। কিন্তু হযরত থানভী রহ. তাঁর খানকায় যিকির, তাসবীহ ও নফল ইবাদতের উপর এতো অধিক জোর দেননি, যতো অধিক জোর দিয়েছেন মুআশারাতের এই মাসআলার উপর যে, নিজের দ্বারা অন্য কোনো মানুষ যেন কষ্ট না পায়। হযরত থানভী রহ. বলতেন যে, যেসব মুরীদ নিজেদের ইসলাহের জন্যে আসে, তাদের কারো সম্পর্কে যদি আমি জানতে পারি যে, তাকে যেসব আমল দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সে ত্রুটি করে। উদাহরণস্বরূপ, দশ তাসবীহের জায়গায় পাঁচ

তাসবীহ পাঠ করে। তাহলে এজন্যে কষ্ট তো হয় যে, তাকে একটি আমল দেওয়া হয়েছে তার উপর সে আমল করে না। কিন্তু যখন কারো সম্পর্কে জানতে পারি যে, সে মুআশারাতের বিধানসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি বিধান অমান্য করেছে, সে অন্য মুসলমানকে কষ্ট দিয়েছে, তখন তার প্রতি আমার ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

প্রথমে মানুষ হও

এমনিভাবে হযরত থানভী রহ.-এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে যে, তুমি সূফী হতে চাইলে বা আবেদ-যাহেদ হতে চাইলে তার জন্যে অনেক খানকা খোলা আছে, সেখানে চলে যাও, আর যদি মানুষ হতে চাও, তাহলে এখানে আসো। কারণ, এখানে তো মানুষ বানানো হয়। মুসলমান হওয়া, আলেম হওয়া এবং সূফী হওয়া তো পরের বিষয়। উচ্চস্তরের ব্যাপার। আগে মানুষ হও। পশুর কাতার থেকে বের হয়ে আসো। ইসলামী মুআশারাতের আদব না জানা এবং তার উপর আমল না করা পর্যন্ত একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না।

পশু তিন প্রকার

ইমাম গাযালী রহ. 'ইহইয়াউল উলূমে' লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তিন ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করেছেন।

এক. এক ধরনের প্রাণী সেগুলো, যেগুলো মানুষের উপকার করে। খুব কমই তাদের দ্বারা ক্ষতি হয়। যেমন গরু, ছাগল ইত্যাদি। এসব পশু দুধ দিয়ে তোমাদের উপকার করে। দুধ দেওয়া বন্ধ করলে তাকে জবাই করে তোমরা গোশত খাও। তোমাদের উপকারের জন্যে এভাবে তারা নিজেদের জান দিয়ে দেয়। এসব প্রাণী ক্ষতি করে না।

দুই. দ্বিতীয় প্রকারের প্রাণী সেগুলো, যেগুলো কেবলই কষ্ট দেয়। বাহ্যত সেগুলোর কোনো উপকার নেই। যেমন সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র প্রাণী ইত্যাদি। এগুলো কষ্টদায়ক প্রাণী। কোনো মানুষকে পেলে এরা কষ্ট দেয়, দংশন করে।

তিন. তৃতীয় প্রকারের প্রাণী সেগুলো, যেগুলো না কষ্ট দেয়, না উপকার করে। যেমন বনে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ। শিয়াল, গেদোড় ইত্যাদি। এগুলোর দ্বারা মানুষ বিশেষ কোনো উপকারও লাভ করে না, আবার বিশেষ কোনো ক্ষতিও হয় না।

এই তিন শ্রেণির প্রাণীর বর্ণনা দিয়ে ইমাম গাযালী রহ. মানুষকে লক্ষ করে বলেন, হে মানুষ! তুমি আশরাফুল মাখলুকাত। সমস্ত প্রাণীর উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। তুমি যদি মানুষ হতে না চাও, বরং পশু হতে চাও তাহলে কমপক্ষে প্রথম প্রকারের পশু হও। যেগুলো অন্যের উপকার তো করে কিন্তু ক্ষতি করে না। যেমন গরু, বকরী ইত্যাদি। আর যদি তার থেকেও নিচে নামতে চাও তাহলে তৃতীয় শ্রেণির প্রাণী হও, যেগুলো না ক্ষতি করে, না উপকার। আর যদি তুমি অন্যের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি করতে আরম্ভ করো, তাহলে সাপ, বিচ্ছু ও হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আমি মানুষ দেখেছি

যাই হোক, মুসলমান অমুসলমানের কথা পরে, আলেম অনালেম এবং আবেদ-অনাবেদের কথা তো অনেক পরে। প্রথম বিষয় তো হলো মানুষকে মানুষ হতে হবে। মানুষ হওয়ার জন্যে ইসলামী মুআশারাত অনেক জরুরী। যাতে তার দ্বারা অন্য কেউ সামান্যও কষ্ট না পায়। তার হাত দ্বারা, মুখ দ্বারা ও কাজ দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না। একবার হযরত থানভী রহ. নিতান্ত বিনয়ের সাথে বললেন যে, পাকা ও পুরা একশ' ভাগ মানুষ তো আমিও হতে পারিনি, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মানুষ দেখেছি যে, মানুষ কেমন হয়। কোনো বলদ এসে আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না যে, আমি মানুষ। তাই কখনো যদি মানুষ হতে চাই, তাহলে মানুষই হবো, মানুষের ধোঁকায় বলদ হবো না।

অন্যকে কষ্ট থেকে বাঁচাও

দেখুন! নফল নামায, মুস্তাহাব আমল, যিকির-আযকার ও তাসবীহের বিষয় এরকম যে, যদি করো তাহলে ইনশাআল্লাহ আখেরাতে তার সওয়াব পাবে, আর যদি না করো আখেরাতে ধরা হবে না যে, অমুক নফল কেন পড়োনি? যিকির-আযকার কেন করোনি? তবে এসব আমলের ফযীলত রয়েছে। অবশ্যই করা উচিত। করলে আখেরাতে সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু না করলে ধরা হবে না। অপরদিকে তোমার দ্বারা যদি অন্য কেউ কষ্ট পায় তাহলে এটা কবীরা গোনাহ হলো। এখন আখেরাতে ধরা হবে যে, এমন কাজ কেন করেছিলে? এ কারণেই কোনো সময়ে যদি নফলের মধ্যে আর ইসলামী মুআশারাতের বিধানের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়, হয় নফল নামায পড়ো, না হয় মুআশারাতের হুকুমের উপর আমল করে অন্যকে কষ্ট থেকে

বাঁচাও, এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান এই যে, নফল ছেড়ে দাও এবং শরীয়তের ঐ বিধানের উপর আমল করো।

জামাতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব

দেখুন! পুরুষদেরকে মসজিদে জামাতের সাথে ফরয নামায আদায়ের কঠোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার মন চায় যে, একদিন এমন করি যে, যখন জামাতের সময় হয় তখন কাউকে ইমাম বানিয়ে নিজে বাইরে যাই এবং ঘরে ঘরে গিয়ে দেখি কোন কোন লোক মসজিদে আসেনি। ঘরে বসে আছে তারপর তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই। কারণ, তারা আল্লাহর এই ফরয হুকুম আদায়ে ত্রুটি করছে। এ হাদীস দ্বারা জামাতের সাথে নামায পড়ার কতো তাকিদ তা জানা গেলো। সুতরাং কতক ফকীহ জামাতের সাথে নামায পড়াকে সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ বলেছেন, কিন্তু অন্য কতক ফকীহ ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। জামাতের সাথে নামায আদায় করলে পরিপূর্ণরূপে আদায় হবে, আর একা আদায় করলে ত্রুটিপূর্ণভাবে আদায় হবে। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আমল দ্বারা এর গুরুত্ব ও তাকিদ এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, অন্তিম রোগকালীন যখন তাঁর জন্যে চলাফেরা কঠিন ছিলো এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে ইমাম বানিয়েছিলেন, তখনও দুই ব্যক্তির উপর ভর দিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্যে মসজিদে তাশরীফ এনেছেন। এতে করে জামাতের সাথে নামায পড়ার কঠোর তাকিদ জানা যায়।

এমন ব্যক্তির জন্যে মসজিদে আসা জায়েয নেই

অপরদিকে সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো মানুষ যদি এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হয়, যা মানুষের ঘৃণার কারণ, যার কারণে দুর্গন্ধ আসে, এমন ব্যক্তির জন্যে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়া জায়েয নেই। জামাতের সাথে নামায পড়ার হুকুম তার থেকে রহিত হয়ে যায় ; তাই নয়, বরং জামাতের সাথে নামায পড়া তার জন্যে নাজায়েয হয়ে যায়। যদি জামাতের সাথে নামায পড়ে তাহলে গোনাহগার হবে। কারণ, সে মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়লে তার পাশে যারা দাঁড়াবে দুর্গন্ধের কারণে তাদের কষ্ট হবে। লক্ষ করুন! জামাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে শুধু মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে বাদ দেওয়া হয়েছে।

হাজরে আসওয়াদ চুমা দেওয়ার সময় কষ্ট দেওয়া

হাজরে আসওয়াদের ফযীলত ও গুরুত্ব কোন মুসলমান জানে না? হাদীস শরীফে এসেছে- হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া এমন, যেমন কিনা আল্লাহ তা'আলার সাথে মুসাফাহা করা। হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া মানুষের গোনাহসমূহকে ঝেড়ে ফেলে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম চুমা দিয়েছেন, এটা এর মর্যাদার বিষয়। অপরদিকে বলেছেন যে, হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়ার জন্যে যদি অন্যকে ধাক্কা দিতে হয়, এর ফলে অন্যে কষ্ট পাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়া জায়েয নেই, বরং গোনাহ। আপনারা লক্ষ করুন! অন্যকে সামান্যতম কষ্ট দেওয়া থেকেও বাঁচার ব্যাপারে শরীয়ত কি পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছে! এতো ফযীলতপূর্ণ জিনিসকে শুধুমাত্র এজন্যে বাদ দেওয়া হচ্ছে, যেন আমার দ্বারা অন্য কেউ কষ্ট না পায়। তাহলে নফল ও মুস্তাহাব দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া কি করে জায়েয হতে পারে?

উঁচু আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করা

উদাহরণস্বরূপ, কুরআন পাকের তিলাওয়াত করা একটা ইবাদত। এটা এতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে, এক হরফে দশ নেকী লেখা হয়। তিলাওয়াতের সময় যেন নেকীর ভান্ডার জমা হয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, সমস্ত যিকির ও তাসবীহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত। উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করা উত্তম। আস্তে আওয়াজের তুলনায় উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করলে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু তিলাওয়াতের কারণে যদি কারো ঘুম বা বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে তাহলে উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করা জায়েয নেই।

তাহাজ্জুদের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উঠার ধরন

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সময় উঠতেন। সারাজীবনে কখনো তাহাজ্জুদ নামায ছাড়েননি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন, তাহাজ্জুদের নামাযকে আমাদের উপর ওয়াজিব করেননি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে তাহাজ্জুদের

নামায ওয়াজিব ছিলো। তিনি কখনো তাহাজ্জুদের নামায কাযা করেননি। কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে যে, তিনি যখন তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে উঠতেন, তখন আস্তে উঠতেন এবং আস্তে দরজা খুলতেন, যেন তাঁর এ আমলের কারণে তাঁর স্ত্রীর চোখ খুলে না যায়। তার ঘুম নষ্ট না হয়।[২]

পুরো কুরআন ও হাদীস এ বিষয়ে পরিপূর্ণ যে, আমার দ্বারা যেন অন্যে কষ্ট না পায়। পদে পদে শরীয়ত এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে।

মানুষের চলার পথে নামায পড়া

নামায পড়ার জন্যে মানুষের চলার পথে দাঁড়ানো জায়েয নেই। কতক মানুষ এ ব্যাপারে মোটেই লক্ষ করে না। পুরো মসজিদ খালি পড়ে আছে, কিন্তু পিছনের কাতারে গিয়ে নামাযের জন্যে দাঁড়িয়েছে। নিয়ত বেঁধেছে। এর ফল এই হয় যে, অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে লম্বা চক্কর দিয়ে তার পিছন দিয়ে যেতে হবে, না হয় নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গোনাহে লিপ্ত হতে হবে। এভাবে নামায পড়া জায়েয নেই, গোনাহ।

'মুসলিমে'র মধ্যে 'সালামতী' অন্তর্ভুক্ত

যাই হোক, হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'মুসলমান সেই, যার হাত ও মুখ থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে।'[৩]

'মুসলিম' (مسلم) শব্দের মূল ধাতু 'সীন' (سين), 'লাম' (لام), 'মীম' (ميم) এবং 'সালামতী' (سلامتی) শব্দও এ ধাতু এবং এসব অক্ষর দিয়েই গঠিত। এর দ্বারা যেন এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'মুসলমান' শব্দের মধ্যে 'সালামতী' তথা 'শান্তি' অন্তর্ভুক্ত।

'আসসালামু আলাইকুমে'র অর্থ

অন্যান্য ধর্মের লোক যখন পরস্পরে সাক্ষাত করে তখন কেউ 'হ্যালো' বলে, কেউ 'গুড নাইট' আর কেউ 'গুড মর্নিং' বলে, কেউ 'নিহাস্তে' এবং কেউ 'আদাব' বলে। বিভিন্ন জাতি সাক্ষাতের সময় অন্যকে সম্বোধন করার

---

২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬১৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৪৬৭১

৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৫১, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৯১০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১২২

জন্যে বিভিন্ন শব্দ নির্বাচন করে রেখেছে। কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, যখন অন্যের সঙ্গে সাক্ষাত করবে তখন বলবে 'আসসালামু আলাইকুম'। যার অর্থ হলো, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। একদিকে তো এর মধ্যে শান্তির জন্যে দু'আ রয়েছে, পক্ষান্তরে অন্যান্য শব্দের মধ্যে কোনো দু'আ নেই। এ কারণে শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তির এসব শব্দ দ্বারা কোনো উপকার হয় না। কিন্তু আপনি যখন 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বললেন, তখন আপনি সম্বোধিত ব্যক্তিকে তিনটি দু'আ দিলেন। অর্থাৎ, তোমার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। একবারের সালামও যদি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় তাহলে সারাজীবনের জন্যে তা যথেষ্ট। এই সালামের মাধ্যমে দ্বিতীয় শিক্ষা এই দেওয়া হয়েছে যে, দুই ব্যক্তির সাক্ষাতের সময় যে জিনিস সর্বাধিক কাম্য, তাহলো এর পক্ষ থেকে ওর জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা। এর দ্বারা যেন ওর কোনো কষ্ট না হয়। একজন মুসলমান সাক্ষাতের সময় সর্বপ্রথম এই পয়গাম দিয়ে থাকে যে, আমি তোমার জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তারূপে এসেছি। আমি তোমার জন্যে আযাব ও কষ্টরূপে আসিনি।

মুখ দ্বারা কষ্ট না দেওয়ার অর্থ

এ হাদীসে দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি হলো لسانه, আর অপরটি হলো يده। অর্থাৎ, অন্য মুসলমান দুই জিনিস থেকে নিরাপদ থাকবে। এক তার মুখ থেকে, আরেক তার হাত থেকে। মুখ থেকে নিরাপদ থাকার অর্থ এই যে, এমন কোনো কথা সে বলবে না, যার দ্বারা শ্রোতার অন্তর ভেঙ্গে যায়, সে কষ্ট পায়, তার মনে দুঃখ হয়। অন্য মুসলমানকে যদি কোনো বিষয়ে আপত্তি করতেই হয়, তাহলেও এমন শব্দ ব্যবহার করবে, যার দ্বারা তার মনে মোটেই কষ্ট হবে না, বা হলেও সর্বনিম্ন পর্যায়ের হবে। উদাহরণস্বরূপ বলবে যে, আপনার অমুক বিষয় আমার ভালো লাগেনি, বা আপনি অমুক বিষয়টি চিন্তা করে দেখবেন তা সংশোধনযোগ্য, তা শরীয়তসম্মত নয়। কিন্তু এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করা, যার দ্বারা তাকে বকা দেওয়া হয়, যেমন গালি দিলো বা 'তিরস্কার' করলো, এটা ঠিক নয়।

'তিরস্কার' করার অর্থ এই যে, সরাসরি কোনো কথা বললো না ঠিক, কিন্তু এমনভাবে ঘুরিয়ে কথা বললো যে, তার অন্তরকে আহত করলো। এভাবে তিরস্কার করা, যা অন্তরকে আহত করে, এ সম্পর্কে এক আরব কবির কবিতা আছে যে-

جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامٌ

وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

'বর্শার আঘাত সেরে উঠে, কিন্তু জিবের আঘাত সারে না।'

এজন্যে কারো কোনো কথা যদি আপনার অপছন্দ হয়, তাহলে আপনি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিন আপনার অমুক কথা আমার পছন্দ নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল কথা বলো।'[৪]

ঘুরানো-প্যাঁচানো কথা কাম্য ও পছন্দনীয় নয়। আজকাল কথার আঘাত একটি শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, এমন কথা বলবে, যা শুনে প্রতিপক্ষ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। তাকে সরাসরি বলবে না, কিন্তু তাকে জড়িয়ে বলবে। এমন কথা যারা বলে, মানুষ তাদের প্রশংসা করে যে, এ লোক অত্যন্ত দক্ষ রচয়িতা। অতি সূক্ষ্মভাবে রসাত্মক আক্রমণ করতে পারে।

সূক্ষ্ম আক্রমণের একটি বিস্ময়কর ঘটনা

এক ব্যক্তি শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ.-এর একটি কিতাবের উত্তরে প্রবন্ধ লেখে। সে প্রবন্ধে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর উপর কুফরের ফতওয়া আরোপ করে। নাউযুবিল্লাহ। হযরতের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত এর উত্তরে ফার্সী ভাষায় দু'টি চরণ রচনা করেন। যা সাহিত্যের মানে বর্তমান যুগের রসাত্মক আক্রমণের উঁচু পর্যায়ের কবিতা ছিলো। কবিতাটি ছিলো এই-

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست

چراغ کذب را نبود فروغے

৪. আহযাব : ৭০

مسلمانت بخوانم در جوابش

دروغے را جزا باشد دروغے

অর্থাৎ, তুমি আমাকে কাফের বলে থাকলে এতে আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ মিথ্যার বাতি জ্বলে না। তুমি আমাকে কাফের বলেছো তার উত্তরে আমি তোমাকে মুসলমান বলছি, কারণ মিথ্যার বদলা মিথ্যাই হয়ে থাকে।

অর্থাৎ, তুমি আমাকে কাফের বলে মিথ্যা বলেছো, এর উত্তরে আমি তোমাকে মুসলমান বলে মিথ্যা বলছি। অর্থাৎ, বাস্তবে তুমি মুসলমান নও। এ উত্তর কোনো সাহিত্যিক ও ভাষারুচিসম্পন্ন কবিকে শুনানো হলে সে খুব সাধুবাদ জানাবে এবং পছন্দ করবে। কারণ, এ উত্তর অন্তরে বিঁধে যায়। কারণ, দ্বিতীয় কবিতার প্রথম চরণে বলেছে যে, 'আমি তোমাকে মুসলমান বলছি' কিন্তু দ্বিতীয় চরণ কথাটিকে একেবারে উল্টিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, মিথ্যার বদলে তো মিথ্যাই হয়। তুমি আমাকে কাফের বলে মিথ্যা বলেছো, আর আমি তোমাকে মুসলমান বলে মিথ্যা বলছি। যাই হোক, এ কবিতা লিখে হযরতের ভক্ত হযরতের খেদমতে নিয়ে এলো। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. কবিতা শুনে বললেন যে, তুমি তো মারাত্মক কবিতা বলেছো। বিঁধে যাওয়ার মতো উত্তর দিয়েছো। কিন্তু তুমি তো ঘুরিয়ে তাকে কাফেরই বললে। অন্যদেরকে কাফের বলা আমাদের পন্থা নয়। কবিতাটি প্রতিপক্ষের নিকট পাঠালেন না।

তারপর হযরত নিজে ঐ কবিতা শুধরিয়ে দিলেন এবং আরেক লাইন বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন,

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست

چراغے کذب را نبود فروغے

مسلمانت بخوانم در جوابش

دہم شکر بجائے تلخ دوغے

اگر تو مومنی فبہا والا

دروغے را جزا باشد دروغے

অর্থাৎ, তুমি আমাকে কাফের বলেছো, এতে আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ মিথ্যার বাতি জ্বলে না। এর উত্তরে আমি তোমাকে মুসলমান বলছি এবং তিতা ঔষধের বিনিময়ে মিষ্টি খাওয়াচ্ছি। তুমি যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে তো খুব ভালো, আর যদি তা না হয়ে থাকো, তাহলে মিথ্যার বদলা মিথ্যাই হয়ে থাকে।

এবার লক্ষ করুন! যেই বিরুদ্ধবাদী তাঁর উপর কুফরীর ফতওয়া লাগাচ্ছে, জাহান্নামী হওয়ার ফতওয়া দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও তিনি তিরস্কারমূলক এমন কথা বলা পছন্দ করেননি, যা সীমালঙ্ঘন করেছে। কারণ, এই তিরস্কার তো দুনিয়াতে থেকে যাবে, কিন্তু যেই শব্দ মুখ থেকে বের হচ্ছে, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট রেকর্ড হয়ে থাকবে। কিয়ামতের দিন তার সম্পর্কে উত্তর দিতে হবে যে, অমুকের ব্যাপারে এ শব্দ তুমি কীভাবে ব্যবহার করেছিলে? এজন্যে সীমাবহির্ভূত এ ধরনের তিরস্কার কখনই পছন্দনীয় নয়। তাই যখনই কারো সাথে কিছু বলার থাকবে, পরিষ্কার ও সরল ভাষায় বলা উচিত। তাকে জড়িয়ে তিরস্কার করে কথা বলা উচিত নয়।

জিব দ্বারা দংশন করার একটি ঘটনা

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. বলতেন যে, কতক মানুষের জিবে দংশন থাকে। এরা কারো সাথে কথা বললেই দংশন করে। খোঁটা দেয়। তিরস্কার করে। আপত্তি করে কথা বলে। অথচ এভাবে কথা বলার ফলে অন্তরে গিট পড়ে যায়। তারপর একটি ঘটনা শোনালেন যে, এক ব্যক্তি তার কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে গেলো। গিয়ে দেখলো তাদের বউ খুব রাগান্বিত অবস্থায় আছে। শাশুড়িকে গাল-মন্দ করছে। শাশুড়িও পাশে বসা ছিলো। লোকটি তার শাশুড়িকে জিজ্ঞাসা করলো- কি হয়েছে? সে এতো রাগ হচ্ছে কেন? উত্তরে শাশুড়ি বললো, এমন কিছুই হয়নি, আমি শুধু দুটি কথা বলেছি, এই ভুলের জন্যে আমাকে ধরা হয়েছে। আর সে নেচে নেচে গেয়ে ফিরছে, রাগ হচ্ছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো- সেই কথা দুটি কি ছিলো? শাশুড়ি বললো, আমি শুধু এতোটুকু বলেছিলাম যে, তোমার বাপ গোলাম, আর তোমার মা বান্দি। তারপর থেকে সে নেচে বেড়াচ্ছে।

দেখুন! সে শুধু দুটি কথা বলেছিলো। কিন্তু দুটি কথা এমন ছিলো যা মানুষের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়। এজন্যে তিরস্কারের আঙ্গিকে কথা বলা

পরিবারকে ধ্বংস করে। অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এ থেকে বাঁচা উচিত। সবসময় পরিষ্কার ও সরল কথা বলা উচিত।

প্রথমে চিন্তা করো, তারপরে কথা বলো

জিব ব্যবহারের পূর্বে একটু চিন্তা করে নাও। যে কথা আমি বলতে যাচ্ছি, তার পরিণতি কী হবে? অন্যের উপরে এর কী প্রভাব পড়বে? আরো চিন্তা করো যে, যে কথা আমি অন্যকে বলতে যাচ্ছি, অন্য কেউ যদি আমাকে এ কথা বলে, তাহলে আমার উপরে এর কী প্রভাব পড়বে? আমার ভালো লাগবে, না খারাপ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন এবং মূলনীতি বলেছেন যে-

أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ

'অন্যের জন্যে তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্যে পছন্দ করো।'[১]

আমরা যে দুই ধরনের মাপ বানিয়ে রেখেছি, নিজের জন্যে এক ধরনের মাপ, আর অন্যের জন্যে অন্য রকমের মাপ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিলোপ সাধন করেছেন। এই মানদন্ড যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করে দেন, তাহলে সব ধরনের ঝগড়া বিবাদ ও ফেৎনা-ফাসাদ মিটে যাবে।

জিব একটি মহান নেয়ামত

জিব আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটি মহান নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিনামূল্যে এ নেয়ামত দান করেছেন। আমাদেরকে এর মূল্য পরিশোধ করতে হয়নি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সরকারি এ মেশিন চলতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ না করুন যদি এ নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তখন এর কদর বুঝে আসবে যে, এটা কতো বড়ো নেয়ামত! যদি প্যারালাইসিসে জিব বন্ধ হয়ে যায়, আর অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, কথা বলতে চায়, মনের কথা অন্যকে জানাতে চায়, কিন্তু জিব চলে না, তখন বুঝে আসবে যে, এ বাকশক্তি কতো বড়ো নেয়ামত! কিন্তু আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ জিবকে কেচির মতো চালিয়ে যাচ্ছি। এ কথা চিন্তা করি না যে, জিব দ্বারা কি

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২০৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭৭৪৮

কথা বের হচ্ছে? এ পদ্ধতি ঠিক নয়। বরং সঠিক পদ্ধতি হলো, আগে পরিমাপ করো, তারপরে কথা বলো। এই পদ্ধতির উপর যদি আমরা আমল করি, তাহলে এই জিব- যা আমাদের জন্যে জাহান্নামে যাওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করছে- ইনশাআল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার উপকরণ সৃষ্টিকারী এবং আখেরাতের ভান্ডার সঞ্চয়কারী হবে।

চিন্তা করে কথা বলার অভ্যাস গড়ুন

এক হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষকে সর্বাধিক অধঃমুখী জাহান্নামে পতিতকারী হলো জিব। অর্থাৎ, জাহান্নামে অধঃমুখে পতিত হওয়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ জিব।[৬]

এ কারণে যখনই এই জিবকে ব্যবহার করবে, তার পূর্বে একটু চিন্তা করে নিবে। কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এর অর্থ এই যে, একটা কথা বলার পূর্বে প্রথমে পাঁচ মিনিট চিন্তা করে তারপর বলতে হবে। তাহলে তো অনেক সময় ব্যয় হয়ে যাবে। আসল কথা এই যে, প্রথম প্রথম যদি মানুষ চিন্তা করে করে কথা বলার অভ্যাস গড়ে, তাহলে ধীরে ধীরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন চিন্তা করতে সময় লাগে না। একমুহূর্তে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে, একথা বলবো কি বলবো না? তারপর আল্লাহ তা'আলা জিবের মধ্যেই মানদন্ড সৃষ্টি করে দেন। ফলে জিব দ্বারা কেবল হক কথাই বের হয়। ভুল কথা বা এমন কথা মুখ দ্বারা বের হয় না, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। অন্যকে কষ্ট দেয়। তবে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা শর্ত যে, এ সরকারি মেশিনকে আদবের সাথে ব্যবহার করতে হবে।

হযরত থানভী রহ.-এর একটি ঘটনা

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব রহ.-এর একজন খাদেম ছিলেন। তাকে 'ভাই নিয়ায' বলে ডাকা হতো। খুব অভিমানী খাদেম। এজন্যে আগন্তুকরাও তাকে মহব্বত করতো। খানকার মধ্যে সব জিনিসের একটি শৃঙ্খলা ও সময় ছিলো। এজন্যে আগন্তুকদের ধরপাকড়ও করতো। এ কাজ করো না, এ কাজ এভাবে করো ইত্যাদি। এক ব্যক্তি

---

৬. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৪১, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৬৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১০০৮

হযরতের কাছে অভিযোগ করে যে, আপনার এই খাদেম খুব মাথায় চড়েছে। অনেক মানুষের উপর রাগ হয় ও ধমক দেয়। এ কথা শুনে হযরতের রাগ হলো। তাকে ডাকালেন এবং ধমক দিলেন যে, কেন ভাই নিয়ায! তোমার এ কি আচরণ! সবাইকে তুমি ধমকাতে থাকো। তোমাকে ধমকানোর অধিকার কে দিলো? উত্তরে ভাই নিয়ায বললেন, হযরত আল্লাহকে ভয় করুন! মিথ্যা বলবেন না। তার উদ্দেশ্য হযরতকে বলা নয়, বরং উদ্দেশ্য ছিলো- যারা আপনার কাছে অভিযোগ করছে তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মিথ্যা না বলা। ভাই নিয়াযের মুখে হযরত যখন এ কথা শুনলেন, তখন সাথে সাথে মাথা নত করে দিলেন এবং 'আসতাগফিরুল্লাহ' 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। দর্শকরা অবাক যে, এ কি হলো! সাধারণ এক খাদেম হযরতকে এমন কথা বললো আর হযরত তাকে কিছু না বলে 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলতে বলতে চলে গেলেন! পরবর্তীতে হযরত নিজে বলেন যে, আসলে আমারই ভুল হয়েছিলো। একদিকের কথা শুনে আমি শাসন করতে আরম্ভ করেছিলাম। আমার উচিত ছিলো প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করা। আপনার সম্পর্কে মানুষ এ অভিযোগ করছে, আপনি কি বলেন? অভিযোগ ঠিক, না ভুল? অপরপক্ষের কথা না শুনে শাসন করা শরীয়তবিরোধী। একাজ যেহেতু শরীয়তবিরোধী ছিলো, এজন্যে আমি ইস্তিগফার করতে করতে সেখান থেকে চলে গিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলা হক ও বাতেল পরিমাপ কথার মানদন্ড সৃষ্টি করে দেন, তার অবস্থা এই হয় যে, তার কোনো কথা সীমালঙ্ঘন করে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর বুঝ দান করুন। আমীন।

অমুসলিমদেরকেও কষ্ট দেওয়া জায়েয নেই

এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুসলসমান সেই, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে। এর দ্বারা অনেক সময় মানুষ বুঝে যে, এ হাদীসে শুধু মুসলমানদেরকে কষ্ট না দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অমুসলিমকে কষ্ট দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা এ হাদীসের মধ্যে নেই। এ কথা ঠিক নয়। কারণ, হাদীসের মধ্যে মুসলমানের উল্লেখ এ কারণে করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান যে পরিবেশে বসবাস করে, সেখানে সাধারণত মুসলমানদের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে হয়। এজন্যে হাদীসের মধ্যে বিশেষভাবে মুসলমানদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় এ হুকুম মুসলমান ও অমুসলমান সকলের

জন্যে সমান। নিজের দ্বারা কোনো অমুসলমানকেও 'নিরাপত্তা অবস্থায়' কষ্ট দেওয়া জায়েয নেই। তবে কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ চলাকালে কাফেরদের শান-শওকত ভাঙ্গার এটা একটা মাধ্যম। এ সময় কষ্ট দেওয়া জায়েয। কিন্তু যেসব কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে না, তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার হুকুমও এটাই।

নাজায়েয হওয়ার দলিল

এর দলিল এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের শাসনকালে মিসরে থাকতেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ছাড়া পুরো জাতি কুফর ও গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত ছিলো। তখন এই ঘটনা ঘটে যে, এক ইসরাঈলী ও কিবতীর মধ্যে ঝগড়া হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কিবতীকে একটা ঘুষি মারেন, ফলে সে মারা যায়। সেই কিবতী কাফের হওয়া সত্ত্বেও হযরত মূসা আলাইহি সালাম তার মৃত্যুকে নিজের জন্যে গোনাহ সাব্যস্ত করে বলেন,

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

অর্থাৎ, আমার দ্বারা তাদের একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যে কারণে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমি যদি তাদের কাছে যাই তাহলে তারা আমাকে হত্যা করবে।[৭] হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ঐ কাফেরের হত্যাকে গোনাহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন জাগে যে, সে তো কাফের ছিলো, আর কাফেরকে হত্যা করা জিহাদের একটি অংশ, তারপরেও তিনি এটাকে গোনাহ আখ্যা দিলেন কেন এবং এর উপর ইসতিগফার করলেন কেন? এর উত্তর এই যে, ঐ কিবতী যদিও কাফের ছিলো, কিন্তু অবস্থা ছিলো নিরাপত্তার। যদি মুসলমান ও কাফের একসঙ্গে বসবাস করে আর নিরাপত্তার অবস্থা হয়, সে অবস্থায় জাগতিক দিক থেকে কাফেরেরও সেই অধিকার রয়েছে, যেই অধিকার রয়েছে একজন মুসলমানের। অর্থাৎ, যেভাবে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নেই, একইভাবে কাফেরকেও কষ্ট দেওয়া জায়েয নেই। কারণ, এটা মানুষের হক। আর মানুষের প্রথম ফরয হলো তাকে মানুষ হতে হবে। মুসলমান হওয়া ও সূফী হওয়া তো পরের বিষয়। প্রথম কাজ হলো মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। আর মনুষ্যত্বের দাবি হলো, নিজের দ্বারা কাউকে কষ্ট দিবে না। এক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমান সকলে সমান।

---

৭. শু'আরা ঃ ১৪

ওয়াদাখেলাফী করা মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার শামিল

কতক কাজ এমন আছে, যাকে মানুষ জিব দ্বারা কষ্ট দেওয়ার মধ্যে গণ্য করে না, অথচ তা মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন ওয়াদাখেলাফী করা। আপনি কারো নিকট ওয়াদা করেছেন যে, অমুক সময় আপনার নিকট আসবো বা অমুক সময় আপনার কাজ করে দেবো। কিন্তু যথাসময়ে ওয়াদা পূরা করলেন না, যার ফলে সে কষ্ট পেলো। এ ক্ষেত্রে একদিকে তো ওয়াদাখেলাফীর গোনাহ হলো, অপরদিকে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার গোনাহও হলো। এটা মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় সালাম করা

কতক সময় মানুষ বুঝতেও পারে না যে, আমি মুখ দ্বারা কষ্ট দিচ্ছি। বরং সে মনে করে যে, আমি তো সওয়াবের কাজ করছি। অথচ বাস্তবে সে গোনাহের কাজ করছে। এর মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দিচ্ছে। যেমন সালাম করা অনেক বড়ো সওয়াবের কাজ। কিন্তু শরীয়ত অন্যকে কষ্ট না দেওয়ার প্রতি এ পরিমাণ লক্ষ রেখেছে যে, সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিধান দিয়েছে যে, সবসময় সালাম দেওয়া জায়েয নেই। বরং কতক সময় সালাম দিলে সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে। কারণ, সালাম দিয়ে তুমি অন্যকে কষ্ট দিয়েছো। যেমন একব্যক্তি কুরআনে কারীম তিলাওয়াতে মগ্ন, তাকে সালাম করা জায়েয নেই। কারণ, একদিকে তো তোমার সালামের কারণে তার তিলাওয়াতের মধ্যে বিঘ্ন ঘটবে, অপরদিকে তিলাওয়াত ছেড়ে তোমার দিকে মনোযোগী হতে তার কষ্ট হবে, এমতাবস্থায় সালাম করা মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে মানুষ মসজিদে বসে যিকিরে মগ্ন থাকলে মসজিদে প্রবেশ করার সময় তাদেরকে সালাম দেওয়া জায়েয নেই। কারণ, তারা আল্লাহর স্মরণে মশগুল। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের মুখে যিকির চলছে। তোমার সালামের কারণে তাদের যিকিরের মধ্যে বিঘ্ন ঘটবে। এদিকে মনোযোগ দেওয়ায় তার কষ্ট হবে।

মজলিস চলাকালে সালাম দেওয়া

ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যে, এক ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে কোনো দীর্ঘ কথা বলছে, অন্যরা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে, তা যদি দুনিয়াবি কথাও হয় এমতাবস্থাতেও ঐ মজলিসে গিয়ে সালাম দেওয়া জায়েয নেই।

কারণ, তারা কথা শোনায় ব্যস্ত ছিলো। আপনি সালাম দিয়ে তাদের কথায় বিঘ্ন ঘটালেন। যার ফলে কথার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। একারণে এ সময় সালাম দেওয়া জায়েয নেই। তাই হুকুম হলো, যদি তুমি কোনো মজলিসে অংশ গ্রহণের জন্যে যাও আর সেখানে কথা শুরু হয়ে থাকে, তাহলে সালাম না দিয়ে বসে পড়ো। তখন সালাম দেওয়া কষ্ট দেওয়ার সমার্থক। এতে অনুমান করুন যে, শরীয়ত এ ব্যাপারে কি পরিমাণ স্পর্শকাতর যে, আমার দ্বারা যেন অন্য কেউ সামান্যতম কষ্টও না পায়।

আহারকারীকে সালাম দেওয়া

এক ব্যক্তি খানা খাওয়ায় রত আছে। যদি আশঙ্কা হয় যে, আপনার সালামের ফলে তার অস্বস্তি হবে, তাহলে সে সময় তাকে সালাম দেওয়া হারাম তো নয়, তবে মাকরূহ অবশ্যই। লক্ষ করুন! সে খানা খাচ্ছে, না ইবাদত করছে, না যিকির করছে। তাকে আপনি সালাম দিলে তার উপর তো পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে না, কিন্তু সালাম দেওয়ার ফলে তার অস্বস্তি হওয়ার ও খারাপ লাগার আশঙ্কা রয়েছে, এ জন্যে সে সময় সালাম করবেন না। এমনিভাবে এক ব্যক্তি তার কাজের জন্যে দ্রুত যাচ্ছে। আপনি বুঝতে পারলেন যে, এখন সে খুব ব্যতিব্যস্ত আছে। আপনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাকে সালাম করলেন, মুসাফাহার জন্যে হাত এগিয়ে দিলেন, এটা আপনি ভালো কাজ করলেন না। এ কারণে যে, তার দ্রুততার কারণে আপনার বোঝা উচিত ছিলো যে, এ লোক ব্যস্ত। এটা সালাম দেওয়া ও মুসাফাহা করার উপযুক্ত সময় নয়। এমন সময় তাকে সালাম দিবেন না, বরং তাকে যেতে দিন। এসব বিষয় মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

টেলিফোনে লম্বা কথা বলা

আমার ওয়ালেদ ছাহেব বলতেন যে, এখন কষ্ট দেওয়ার আরেকটি যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, তাহলো টেলিফোন। এর মাধ্যমে যতো ইচ্ছা অন্যকে কষ্ট দাও। আপনি কাউকে টেলিফোন করে লম্বা আলোচনা শুরু করলেন। এদিকে খেয়াল করলেন না যে, সে লোক কোনো কাজে ব্যস্ত আছে কি না। তার কাছে সময় আছে কি না। আমার ওয়ালেদ মাজেদ মাআরেফুল কুরআনে লিখেছেন যে, টেলিফোন করার অন্যতম আদব হলো, কারো সাথে লম্বা কথা বলতে হলে প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও- আমার একটু লম্বা কথা বলতে

হবে, চার-পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। আপনি এখন অবসর থাকলে এখনই বলবো, আর অবসর না থাকলে উপযুক্ত কোনো সময়ের কথা বলে দিন, তখন কথা বলবো। সূরায়ে নূরের তাফসীরের মধ্যে এসব আদব লেখা আছে। সেখানে দেখুন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. নিজেও এর উপর আমল করতেন।

বাইরে লাউড স্পিকারে বক্তব্য দেওয়া

উদাহরণস্বরূপ, মসজিদের মধ্যে কিছু লোকের সঙ্গে আপনার কথা বলতে হবে। তাদের পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছানোর জন্যে মসজিদের ভিতরের লাউড স্পিকারও যথেষ্ট। কিন্তু আপনি বাইরের লাউড স্পিকারও খুলে দিলেন। যার ফলে পুরো এলাকার এবং পুরো মহল্লার মানুষ পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছছে। এখন মহল্লার কোনো মানুষ নিজের ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করতে চায়, বা যিকির করতে চায়, বা ঘুমাতে চায়, বা অসুস্থ মানুষ বিশ্রাম করতে চায়, কিন্তু আপনি জোর করে পুরো মহল্লার লোকের উপর আপনার ওয়ায চাপিয়ে দিলেন। এটাও মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর যুগের একটি ঘটনা

হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর যুগে এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে ওয়ায করতো। হযরত আয়েশা রাযি.-এর কামরা মসজিদে নববীর একেবারে সংলগ্ন ছিলো। যদিও সে যুগে লাউড স্পিকার ছিলো না, কিন্তু ঐ লোক খুব উঁচু আওয়াজে ওয়ায করতো। তার আওয়াজ হযরত আয়েশা রাযি.-এর কামরার ভিতর পৌঁছতো। তিনি নিজের ইবাদত, তিলাওয়াত, যিকির বা অন্য কাজে মশগুল থাকতেন। ঐ ব্যক্তির আওয়াজে তাঁর কষ্ট হতো। হযরত আয়েশা রাযি. হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর নিকট সংবাদ পাঠান যে, এক ব্যক্তি আমার কামরার নিকট এসে এভাবে ওয়ায করে। এতে আমার কষ্ট হয়। আপনি তাকে বলে দিন- অন্য কোথাও গিয়ে ওয়ায করুক, না হয় আস্তে আওয়াজে ওয়ায করুক। হযরত ওমর ফারুক রাযি. তাকে ডেকে বুঝালেন যে, আপনার আওয়াজে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি.-এর কষ্ট হয়। আপনি এখানে ওয়ায করা বন্ধ করে দিন। সুতরাং সে থেমে গেলো। কিন্তু লোকটির ওয়াযের প্রতি আগ্রহ ছিলো। কিছুদিন পর আবারও ওয়ায করতে

শুরু করলো। হযরত ওমর ফারুক রাযি. জানতে পারলেন যে, সে পুনরায় ওয়ায করতে শুরু করেছে। তিনি পুনরায় তাকে ডাকলেন এবং বললেন যে, এবার আমি আপনাকে শেষবারের মতো নিষেধ করলাম। এর পর যদি আমি জানতে পারি যে, আপনি এখানে ওয়ায করেন, তাহলে এই ছড়ি আপনার উপর ভাঙ্গবো। অর্থাৎ, এ পরিমাণ প্রহার করবো যে, আপনার উপর এই ছড়ি ভেঙ্গে যাবে।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা

বর্তমানে আমরা এর প্রতি মোটেই লক্ষ করি না। মসজিদে ওয়ায হচ্ছে। পুরো আওয়াজে লাউড স্পিকার ছাড়া আছে। পুরো মহল্লার লোককে কষ্টে ফেলা হয়েছে। মহল্লায় কেউ ঘুমাতে পারে না। কোনো ব্যক্তি গিয়ে নিষেধ করলে তাকে তিরস্কার করা হয় যে, সে দ্বীনের কাজে বাধা দিচ্ছে। অথচ এই ওয়াযের মাধ্যমে শরীয়তের বিধানকে পদদলিত করা হচ্ছে। অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। আলেমের আদবসমূহের মধ্যে এ কথাও লেখা আছে যে,

يَنْبَغِيْ لِلْعَالِمِ اَنْ لَّا يَعْدُوَ صَوْتُهُ مَجْلِسَهُ

'আলেমের আওয়াজ তার মজলিস থেকে যেন দূরে না যায়।'[৮]

এসব বিষয় জিব দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এই জিব আল্লাহ তা'আলা এজন্যে দিয়েছেন যে, এটা আল্লাহর যিকির করবে, সত্য কথা বলবে। এই জিব এজন্যে দেওয়া হয়েছে যে, এর মাধ্যমে তোমরা মানুষের অন্তরে প্রলেপ দিবে। এই জিব এজন্যে দেওয়া হয়নি যে, এর মাধ্যমে তোমরা মানুষকে কষ্ট দিবে।

ঐ মহিলা জাহান্নামী

হাদীস শরীফে আছে, একবার একমহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, ঐ মহিলা সারাদিন রোযা রাখে এবং সারারাত ইবাদত করে, কিন্তু সে প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়, ঐ মহিলা কেমন? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ মহিলা জাহান্নামী, সে জাহান্নামে যাবে।[৯]

---

৮. আল জামে' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে', লিল খাতীবিল বাগদাদী, খণ্ড: ৩, পৃঃ ১৪৪, উক্তিটি হযরত আতা রহ.-এর দিকে সম্পৃক্ত

৯. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ৯২৯৮

এ হাদীস বর্ণনা করার পর এর ব্যাখ্যায় হযরত থানভী রহ. বলেন, এ হাদীসে মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়ার নিন্দা করা হয়েছে এবং মুআমালা যে ইবাদতের উপর অগ্রগণ্য, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ, মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার ঠিক করা ইবাদতের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারপর বলেন, মুআমালাতের বিষয় কার্যত এ পরিমাণ পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে যে, বর্তমানে কেউ অন্যকে এ কথা বুঝায়ও না এবং শিখায়ও না যে, এটাও দ্বীনের একটা অংশ।

হাত দ্বারা কষ্ট দিবে না

এ হাদীসে দ্বিতীয় যে জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো হাত। অর্থাৎ, তোমারদের হাত দ্বারা কেউ যেন কষ্ট না পায়। হাত দ্বারা কষ্ট দেওয়ার কিছু পদ্ধতি তো আছে স্পষ্ট, যেমন কাউকে মারলো। যে কেউ দেখে বলবে যে, সে হাত দ্বারা কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু হাত দ্বারা কষ্ট দেওয়ার এমন অনেক পদ্ধতি আছে, মানুষ যাকে কষ্ট দেওয়া বলে গণ্য করে না। হাদীস শরীফে হাতের কথা উল্লেখ করে হাত দ্বারা সংঘটিত কর্মসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, বেশির ভাগ কাজ মানুষ হাত দ্বারা সম্পাদন করে থাকে। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম হাতের মধ্যে সমস্ত কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যদিও সে কাজে হাতকে সরাসরি জড়িত দেখা যায় না।

কোনো জিনিসকে অনুপোযুক্ত জায়গায় রাখা

উদাহরণস্বরূপ, একটি যৌথ বাড়িতে আপনি অন্যদের সাথে বসবাস করেন। ঐ বাড়িতে যৌথ ব্যবহারের জিনিস রাখার একটি নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। যেমন তোয়ালে রাখার একটি নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। আপনি তোয়ালে ব্যবহার করে তা অন্য জায়গায় ফেলে রাখলেন। ফলে অন্য ব্যক্তি অযু করে এসে ঐ জায়গায় তোয়ালে তালাশ করে পেলো না। এখন সে তোয়ালে খোঁজ করছে। তার কষ্ট হচ্ছে। এই যে কষ্ট সে পেলো, এটা আপনার হাতের কর্মের ফল। আপনি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তোয়ালে নিয়ে অন্যত্র ফেলে রেখেছেন, এতে কষ্ট দেওয়া হলো, যা এ হাদীসের ভিত্তিতে হারাম। তোয়ালে দিয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। অন্যথায় যৌথ বদনা হোক, সাবান হোক, গ্লাস হোক, ঝাড়ু হোক ইত্যাদি, এগুলো নির্দিষ্ট জায়গা থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় রাখা হাত দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এটা কবীরা গোনাহ

আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. আমাদেরকে এই ছোট ছোট বিষয় শিখিয়েছেন। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরাও এসব আচরণ করতাম। একটা জিনিস তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তুলে নিয়ে ব্যবহার করতাম এবং অন্যত্র ফেলে রাখতাম। প্রয়োজনের সময় সারা বাড়ি তালাশ করা হতো। একদিন আমাদের সকলকে বললেন, তোমরা যে কাজ করো- একটা জিনিস তুলে নিয়ে অন্যত্র ফেলে রাখো, এটা অসদাচরণ তো বটেই, একই সাথে এটা কবীরা গোনাহও। কারণ, এর দ্বারা মুসলমান কষ্ট পায়, আর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া কবীরা গোনাহ। সেদিন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এটাও দ্বীনের বিধান এবং এটাও কবীরা গোনাহ। অন্যথায় এর পূর্বে এর অনুভূতিও ছিলো না। এ সব বিষয় হাত দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

প্রিয়জন ও পরিবার-পরিজনকে কষ্ট দেওয়া

এ বিষয়টিও বুঝুন যে, যৌথ বসবাসের জন্যে পর মানুষ হওয়া জরুরি নয়। নিজেদের নিকটাত্মীয়, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন সব এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা নিজেদের নিকটাত্মীয়দের কষ্ট পাওয়ার বিষয় উপলব্ধি করি না। বরং চিন্তা করি যে, আমার এ কাজ দ্বারা স্ত্রী কষ্ট পেলে পাক। সে তো আমার স্ত্রী। বা নিজের সন্তান বা ভাই-বোন কষ্ট পাচ্ছে তো পাক, আমারই তো সন্তান, আমারই তো ভাই-বোন। সে তোমার ভাই বা বোন হয়ে কী অপরাধ করেছে? এই মহিলা তোমার স্ত্রী হয়ে বা এরা তোমার সন্তান হয়েছে তো কী অপরাধ করেছে? যে তুমি তাদেরকে কষ্ট দিচ্ছো। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সময় শুধু এ কথা চিন্তা করে সব কাজ আস্তে করতেন, যেন হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘুম ভেঙ্গে না যায়। যেভাবে অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম, একইভাবে নিজের পরিবার-পরিজন, নিজের ভাই-বোন এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও কষ্ট দেওয়া হরাম।

খাওয়ার সময় না জানিয়ে অনুপস্থিত থাকা

উদাহরণস্বরূপ, আপনি পরিবারের লোকদেরকে বলে গেলেন যে, অমুক সময় এসে খানা খাবো। কিন্তু তারপর না জানিয়ে কোথাও চলে গেলেন এবং সেখানেই খানা খেলেন এবং সেখানে কয়েক ঘণ্টা সময় পার করে দিলেন। সময় মতো বাড়িতে এলেন না। বাড়িতে আপনার স্ত্রী খানা নিয়ে আপনার

জন্যে অপেক্ষা করছে। পেরেশান হচ্ছে যে, কি হলো? এখনো আসছে না কেন? খানা নিয়ে বসে আছে। আপনার এ কাজ কবীরা গোনাহ। এ কারণে যে, আপনি এ কাজের মাধ্যমে এমন এক ব্যক্তিকে কষ্ট দিলেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আপনার যদি অন্য জায়গায় যেতে হয় তো আপনি তাকে জানিয়ে মুক্ত করে দিতেন। তাকে অপেক্ষা ও পেরেশানীতে লিপ্ত না করতেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা এ বিষয়ে লক্ষ করি না। চিন্তা করি যে, সে তো আমারই স্ত্রী। আমার অধীন। অপেক্ষা করছে করুক। অথচ এটা কবীরা গোনাহ, হারাম। মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

রাস্তাকে ময়লা করা হারাম

কিংবা উদাহরণস্বরূপ সড়কের উপর দিয়ে যাওয়ার পথে আপনি সেখানে ছিলকা বা ময়লা ফেলে দিলেন। এখন এ কারণে কারো পা পিছলে গেলো বা কেউ কষ্ট পেলো, তাহলে কিয়ামতের দিন আপনাকে পাকড়াও করা হবে। আর যদি এর দ্বারা কেউ কষ্ট নাও পায়, কিন্তু আপনি ময়লা তো ফেললেন। এই ময়লা ফেলার কারণে আপনার গোনাহ হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে- সফরকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে কোথাও পেশাব করার প্রয়োজন হলে পেশাব করার জন্যে তিনি উপযুক্ত জায়গা এ পরিমাণ খোঁজ করতেন, যেমন একজন মানুষ বাড়ি বানানোর জন্যে উপযুক্ত জায়গা খোঁজ করে। কেন এমন করতেন? যেন তা মানুষের চলাচলের পথ না হয়, আর ময়লার কারণে মানুষের কষ্ট না হয়।

অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলা, আর সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা থেকে ময়লা ও কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা।[১০]

যেমন পথে কাঁটা বা ছিলকা পড়ে আছে, আপনি তা তুলে দূরে ফেলে দিলেন, যেন পথিকদের কষ্ট না হয়। এটা ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা। পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা যেহেতু ঈমানের শাখা, তাই পথে কষ্টদায়ক

---

১০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫১, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৯১৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৫৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৯৯৩

জিনিস ফেলা হবে কুফরের শাখা, ঈমানের শাখা হবে না। এ সব বিষয় এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

মানসিক কষ্টে লিপ্ত করা হারাম

হযরত থানভী রহ. বলেন যে, এ হাদীসে জিব ও হাত দ্বারা বাহ্যিক আমলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি জিব বা হাত দ্বারা এমন কোনো কাজ করেন, যার দ্বারা অন্যের মানসিক কষ্ট হয় তাহলে তাও এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কারো থেকে ঋণ নিলেন এবং তার সাথে ওয়াদা করলেন যে, এতো দিনের মধ্যে পরিশোধ করবো। আপনি যদি যথাসময়ে পরিশোধ করতে সক্ষম না হন তাহলে তাকে জানিয়ে দিন যে, আমি এখন পরিশোধ করতে পারছি না। এতোদিন পরে পরিশোধ করবো। এর পরেও পরিশোধ করতে না পারলে আবারও জানিয়ে দিন। কিন্তু তাকে ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। সে মানসিক অস্বস্তির মধ্যে থাকবে। সে বেচারা অপেক্ষায় আছে যে, আপনি আজকে ঋণ পরিশোধ করবেন, বা কাল দিয়ে দিবেন। কিন্তু আপনি না তাকে জানালেন, না ঋণ পরিশোধ করলেন। এভাবে আপনি তাকে মানসিক কষ্টে ফেললেন। সে এখন আর কোনো প্লান তৈরি করতে পারবে না। কোনো প্রোগ্রাম বানাতে পারবে না। কারণ তার জানাই নেই যে, সে ঋণ ফিরে পাবে কি না? পেলে কবে পাবে? আপনার এই কর্মপদ্ধতিও নাজায়েয ও হারাম।

চাকরদের উপর মানসিক বোঝা ফেলা

এমনকি হযরত থানভী রহ. বলেন যে, আপনার একজন চাকর আছে। আপনি একসঙ্গে তাকে চারটি কাজ বলে দিলেন। প্রথমে এ কাজ করবে, তারপর এ কাজ করবে, তারপর এ কাজ করবে, তারপর এ কাজ করবে। এভাবে চারটি কাজ মনে রাখার বোঝা আপনি তার মাথার উপর চাপিয়ে দিলেন। যদি ভীষণ প্রয়োজন না হয় তাহলে একসঙ্গে চার কাজের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বরং তাকে প্রথমে একটি কাজ বলুন। সে প্রথম কাজটি সেরে ফেললে এবার দ্বিতীয়টি বলুন। এটা শেষ করলে তারপর তৃতীয় কাজের কথা বলুন। তিনি নিজে নিজের কর্মপদ্ধতি বলেন যে, আমি আমার চাকরকে এক সময়ে একটি কাজের কথা বলি। তার দ্বারা যে দ্বিতীয় কাজটি করা হবে, তা মনে রাখার বোঝা নিজের মাথায় রাখি।

চাকরের মাথার উপর চাপাই না। যাতে সে মানসিক চাপে না পড়ে। সে একটি কাজ করে শেষ করলে তখন দ্বিতীয় কাজের কথা বলি। এর দ্বারা অনুমান করুন যে, হযরতের দৃষ্টি কতো সুদূরপ্রসারী ছিলো!

নামাযরত ব্যক্তির জন্যে কোথায় অপেক্ষা করা উচিত

কিংবা এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, তার সাথে আপনার কিছু কাজ আছে। এখন আপনি তার একেবারে নিকটে গিয়ে বসলেন। তার মাথায় এই চিন্তা চাপিয়ে দিলেন যে, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। তুমি জলদি নামায শেষ করো। আমি তোমার সাঙ্গে দেখা করবো। কাজ করাবো। সুতরাং আপনি নিকটে বসার কারণে তার নামাযের মধ্যে বিঘ্ন ঘটছে। তার মস্তিষ্কে চাপ পড়ছে যে, এ ব্যক্তি আমার অপেক্ষায় আছে, তার অপেক্ষার সমাধান করা উচিত। তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে তার সঙ্গে দেখা করা উচিত। অথচ এটা আদবের অন্তর্ভুক্ত যে, আপনার যদি নামায রত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হয়, তাহলে আপনি দূরে বসে তার অবসর হওয়ার অপেক্ষা করবেন। সে নিজের থেকে অবসর হলে তখন দেখা করবেন। কিন্তু তার একেবারে কাছে বসে তার উপর এই প্রভাব বিস্তার করা যে, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি, এজন্যে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করো- এটা আদবের খেলাফ। এসব বিষয় অন্যকে মানসিক কষ্টে ফেলার অন্তর্ভুক্ত। আলহামদুলিল্লাহ! যে সকল বুযুর্গকে আমরা দেখেছি এবং যাঁদের থেকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীন শেখার তাওফীক দান করেছেন, তাঁদের উপর দ্বীনের সমস্ত শাখাকে আল্লাহ তা'আলা সমান রেখেছিলেন। এমন ছিলো না যে, দ্বীনের এক বা দুই শাখার উপর আমল আছে, আর অবশিষ্ট সব শাখা দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে। সেগুলোর ব্যাপারে উদাসীনতা রয়েছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

'হে ঈমানদারগণ! ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত হও।'[১১]

এমন যেন না হয় যে, নামায-রোযা ইত্যাদি ইবাদত তো করলে, কিন্তু মুআশারাত, মুআমালাত ও আখলাকের বিষয়ে দ্বীনের বিধি-বিধানের পারোয়া করলে না। অথচ এ সব কিছু দ্বীনের অংশ।

---

১১. বাকারাহ ঃ ২০৮

'আদাবুল মুআশারাত' পাঠ করুন

হযরত থানভী রহ.-এর ছোট্ট একটি পুস্তিকা রয়েছে 'আদাবুল মুআশারাত'। তাতে তিনি মুআশারাতের আদবসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। পুস্তিকাটি প্রত্যেক মুসলমানের পড়া উচিত। পুস্তিকার ভূমিকায় হযরত থানভী রহ. লিখেছেন যে, আমি এই কিতাবের মধ্যে মুআশারাতের সমস্ত আদব লিখতে পারিনি। বিক্ষিপ্তভাবে যেসব আদবের কথা মাথায় এসেছে সেগুলো এখানে সংকলন করেছি। তোমরা এসব আদব পড়লে আপনাআপনি তোমাদের মন-মগজ এদিকে ধাবিত হবে যে, এ বিষয়টি যখন আদবের অন্তর্ভুক্ত, তখন অমুক জায়গায়ও আমার এমন করা উচিত। ধীরে ধীরে আপনাআপনি তোমার মাথায় ঐ সমস্ত আদবের কথা আসতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তোমার মাথাকে খুলে দিবেন। মুআশারাতের একটি আদব এই যে, এমন জায়গায় গাড়ি খাড়া করবে, যেন এর কারণে অন্যদের পথ বন্ধ হয়ে না যায়। অন্যের কষ্ট না হয়। এটাও দ্বীনের একটা অংশ। আজ আমরা এসব বিষয় ভুলে গিয়েছি। এর ফলে আমরা শুধু গোনাহগারই হচ্ছি না, বরং দ্বীনের ভুল প্রতিনিধিত্ব করছি। সুতরাং আমাদেরকে দেখে বাইরের মানুষ বলবে যে, এরা নামায তো পড়ে, কিন্তু খুব ময়লা ছড়ায়। অন্যদেরকে কষ্ট দেয়। এতে করে ইসলামের কেমন চেহারা সামনে আসবে! তারা এসব জিনিসের কারণে ইসলামের দিকে আকর্ষণ অনুভব করবে, নাকি ইসলাম থেকে দূরে পালাবে? আল্লাহ রক্ষা করুন। আমরা দ্বীনের একটা ভালো নমুনা পেশ করে মানুষের জন্যে আকর্ষণের কারণ না হয়ে দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতার কারণ হচ্ছি। মুআশারাতের এই অধ্যায়কে আমরা বিশেষভাবে ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদের সকলকে এ ত্রুটি থেকে অতি দ্রুত মুক্তি দান করুন। আমাদের বুঝ সঠিক করে দিন। আমাদেরকে দ্বীনের সকল শাখার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মুসলমান হয়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমান সেই, যার জিব ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে। এবং মুমিন সেই, যার ব্যাপারে মানুষ নিজেদের জান মালের কোনো আশঙ্কা বোধ করে না।[১]

এ হাদীসে সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমানের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে দ্বীনের একটি বিস্তৃত শাখার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানুষ অজ্ঞতার কারণে যাকে দ্বীনের শাখা বলে মনে করে না। কতক মানুষ ধারণা করে যে, দ্বীন শুধুমাত্র আকীদা-বিশ্বাস, নামায-রোযা ও বিশেষ কিছু ইবাদতের নাম। এসব ইবাদত সম্পাদনের পর মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে স্বাধীন ও মুক্ত। অথচ বাস্তবতা এই যে, ইসলাম যেখানে আমাদেরকে নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের তা'লীম দিয়েছে, সেখানে জীবনের প্রত্যেক শাখায় এমন সব বিষয়ও শিক্ষা দিয়েছে, যেগুলোর উপর আমল করে আমরা নিজেদের সমাজকে জান্নাতের নমুনা বানাতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শিক্ষাসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র এক-চতুর্থাংশ আকীদা ও ইবাদত সম্বলিত। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ মুআমালা, আখলাক ও

---

* ইসলাহী তাকরীরে পৃঃ ৮৯-৯২, ফরদ কি ইসলাহ পৃঃ ৯৩-৯৫

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫২১, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৯১০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১২২

মুআশারাতের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বীনের এসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখার অন্যতম হলো মুআশারাত। যার মধ্যে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে চলা-ফেরা ও সামাজিক জীবন যাপনের আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এইমাত্র যে হাদীসটি আপনাদেরকে শুনানো হলো তার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের সামাজিক শিক্ষার অত্যন্ত সারগর্ভ সারাংশ বর্ণনা করেছেন। কারণ, ইসলাম মুআশারাতের সাথে সম্পৃক্ত যতো বিধান দিয়েছে, তার শেষ লক্ষ্য হলো নিজের দ্বারা কোনো মুসলমান, বরং কোনো মানুষ যেন কোনো প্রকার কষ্ট না পায়। ইসলামী জীবনের এই মূলনীতিকে অত্যাধিক জোরালোভাবে মন-মগজে বদ্ধমূল করার জন্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সেই, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা ইসলামের এমন এক মৌলিক নিদর্শন, যার দ্বারা একজন মুসলমানকে চেনা যায়। তাই যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয়, সে আইনের ভাষায় ও শব্দগতভাবে মুসলমান হলেও একজন খাঁটি মুসলমানের প্রকৃত গুণ ও মৌলিক নিদর্শনাবলী থেকে অনেক দূরে।

এ হাদীসের প্রথম বাক্যে তো বলা হয়েছে যে, মুসলমান সেই, যার হাত ও জিব থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে। তবে এর পরবর্তী বাক্যেই বলা হয়েছে যে, তার দিক থেকে মানুষের জান-মালের কোনো আশঙ্কাই থাকে না। তাছাড়া সহীহ ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় এ শব্দমালা এসেছে যে-

مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

'যার হাত ও মুখ থেকে সমস্ত মানুষ নিরাপদে থাকে।'[২]

যার দ্বারা জানা গেলো যে, মুসলমানের কাজ হলো সে কোনো মানুষকেই কষ্ট দিবে না। ঐ মানুষ মুসলিম হোক বা অমুসলিম। একারণে কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরী, তেমনিভাবে কোনো অমুসলিমকেও বিনা কারণে পেরেশাণ করা বা কষ্ট দেওয়া হারাম।

এ হাদীসে হাত ও জিবের উল্লেখ শুধু এজন্যে করা হয়েছে যে, সাধারণত এসবের মাধ্যমেই কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। অন্যথায় হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে কোনোভাবেই কোনো ধরনের কষ্ট দেওয়া যাবে না। না হাত দ্বারা, না জিব দ্বারা, না অন্য কোনো পন্থায়।

২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭০৬৪, শোয়াবুল ঈমান, হাদীস নং ১১১২৩

হাত দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অর্থ তো স্পষ্ট যে, অন্যায়ভাবে মারপিট করা, ঝগড়া-বিবাদ করা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জিব দ্বারা কষ্ট দেওয়ার মধ্যে অসংখ্য গোনাহ চলে আসে। যেমন মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, গীবত, কুটনামী, গালিগালাজ বা যে কোনো এমন কথা বলা, যার দ্বারা অন্য মানুষ মনে কষ্ট পায়, বা শারীরিক ও মানসিক কষ্টে আক্রান্ত হয়। এছাড়াও অন্যকে কষ্ট দেওয়ার যতো পদ্ধতি চিন্তা করা যায়, তার সবগুলোকে এ হাদীসে তেমনই হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে, যেমন চুরি, ডাকাতি, মদপান ও অন্যান্য কবীরা গোনাহ হারাম। ইসলাম তার প্রত্যেক বিধানের মধ্যে অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। উদাহরণস্বরূপ হুকুম দিয়েছে যে, জুমার দিন যখন মসজিদে যাবে তখন মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। যেখানে জায়গা পাবে বসে যাবে। জুমার জন্যে যখন যাবে তখন গোসল করে যাবে। দুর্গন্ধযুক্ত কোনো জিনিস খেয়ে যাবে না। যাতে পাশে উপবেশনকারী ব্যক্তির কষ্ট না হয়। নামাযের মধ্যে এমন কোনো জায়গায় দাঁড়াবে না, যার ফলে অন্যদের চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাজ্জুদের জন্যে জাগতেন তখন প্রত্যেক কাজ এতো ধীরে করতেন, যেন কারো ঘুম ভেঙ্গে না যায়।[৩]

কারণ, নিজের নফল ইবাদতের জন্যে অন্যকে কষ্ট দেওয়া ইসলামের প্রকৃতির পরিপূর্ণ পরিপন্থী।

অন্যকে কষ্ট দেওয়ার কতক পদ্ধতি তো একেবারে স্পষ্ট। যেমন মারপিট করা, গালিগালাজ করা ইত্যাদি। কিন্তু কতক পদ্ধতি এমন রয়েছে, যেগুলো আমরা নিছক উদাসীনতা ও অবহেলার কারণে করে বসি। যেমন সড়কের উপর ফলের ছিলকা ফেলার সময় কারো চিন্তায় এ কথা জাগে না যে, আমি গোনাহের কাজ করছি। অথচ ঐ ছিলকার কারণে কোনো মানুষ পিছলে পড়ে গেলে তার কষ্টের পুরো গোনাহ ঐ ব্যক্তির হবে, যে অনুপোযুক্ত জায়গায় ছিলকা ফেলেছে। এর দ্বারা যতো মানুষ কষ্ট পাবে, সবগুলোর গোনাহ তার আমলনামায় লেখা হবে।

এমনিভাবে জনসাধারণের চলাচলের পথে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, অনুপোযুক্ত জায়গায় বাহন দাঁড় করানো, বিনা প্রয়োজনে লাউড স্পিকার ব্যবহার করে মানুষের আরাম-বিশ্রামের ব্যাঘাত করা- যার দ্বারা মানুষের খুব

---

[৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬১৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৪৬৭১

কষ্ট হয়- এগুলো শুধু অভদ্রতাই নয়, বরং এ হাদীসের আলোকে গোনাহের কাজও। এ কারণে এ হাদীসের শিক্ষা এই যে, মুসলমানের প্রত্যেক কাজে এ কথা চিন্তা করা উচিত যে, এর দ্বারা অন্য কোনো ব্যক্তির শারীরিক হ মানসিক কষ্ট হবে না তো। যার দ্বারা কেউ কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা থেকে পরিপূর্ণরূপে দূরে থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মধ্যে ভারসাম্য*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا وَ اَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا[1]

বন্ধুত্ব করার সোনালী মূলনীতি

হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। সনদের দিক থেকে সহীহ হাদীস। বড়ো বিস্ময়কর হাদীস এটি। এর মধ্যে অতি বিস্ময়কর শিক্ষা দান করা হয়েছে। আমাদের পুরো জীবনের জন্যে এতে সোনালী মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিজের বন্ধুকে ধীরে ধীরে মহব্বত করো। অর্থাৎ, ভারসাম্যের সাথে মহব্বত করো। কারণ, হতে পারে তোমার সেই বন্ধু একদিন তোমার শত্রুতে পরিণত হবে এবং তোমার কাছে অপছন্দনীয় হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তির সাথে তোমার শত্রুতা রয়েছে,

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১০, পৃঃ ৮৪-৯৬, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২০

তার সাথেও ধীরে ধীরে শত্রুতা পোষণ করো। কারণ, সে একদিন তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।

এ হাদীসের মধ্যে এই বিস্ময়কর শিক্ষা দান করা হয়েছে যে, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্বও করবে ভারসাম্যের সাথে, আর যার সাথে শত্রুতা থাকবে তার সাথে শত্রুতাও করবে ভারসাম্যের সাথে। মনে রাখবে! দুনিয়ার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থায়িত্ব লাভ করে না এবং দুনিয়ার শত্রুতা ও বিদ্বেষও চিরস্থায়ী হয় না। হতে পারে, এক সময় ঐ বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হবে এবং এটাও হতে পারে যে, একসময় শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত হবে। এজন্যে ভারসাম্য হাতছাড়া করো না।

আমাদের বন্ধুত্বের অবস্থা

এ হাদীসের মধ্যে বিশেষভাবে ঐ সব লোককে সোনালী শিক্ষা দান করা হয়েছে, যাদের অবস্থা এই হয়ে থাকে যে, যখন তাদের কারো সাথে বন্ধুত্ব হয়, কারো সাথে সম্পর্ক হয় এবং ভালোবাসা হয়, তখন ঐ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় নির্দ্বিধায় আগে বাড়তে থাকে। কোনো সীমারেখার পরোয়া তারা করে না। যার সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে কোনো দোষ চোখে পড়ে না। দিন-রাত তার সাথে পানাহার চলছে, ওঠা-বসা চলছে, চলাফেরা চলছে, সব কাজ তার সাথে হচ্ছে। দিন-রাত তার বন্ধুত্ব ও সাহচর্য লাভ হচ্ছে। তার প্রশংসা গাওয়া হচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ জানা গেলো যে, বন্ধুত্ব ভেঙ্গে গিয়েছে এবং এমনভাবেই ভেঙ্গেছে যে, একে অপরের মুখ দেখতেও রাজি না। একে অপরের নাম শুনতেও রাজি না। এখন আর তার মধ্যে কোনো ভালো গুণ দেখা যায় না। বরং এখন তার নিন্দাবাদ শুরু হয়েছে। এই প্রান্তিকতা ও ভারসাম্যহীনতা শরীয়তে কাঙ্খিত নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভালোবাসাও করো ভারসাম্যের সাথে, আর শত্রুতাও করো ভারসাম্যের সাথে। কোনো কিছুতেই সীমা অতিক্রম কোরো না।

বন্ধুত্বের একমাত্র উপযুক্ত সত্তা

মনে রাখবে! প্রথমত বন্ধুত্ব যেই জিনিসের নাম, তা দুনিয়ার কোনো মাখলুকের মধ্যে প্রকৃত ও সঠিক অর্থে নাই। প্রকৃত বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার উপযুক্ত তো হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা। অন্তরে যাকে জায়গা

দেওয়া হবে, যার ভালোবাসা অন্তরে বদ্ধমূল হবে, সেতো একমাত্র তাঁরই সত্তা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের দেহের মধ্যে যেই অন্তর বানিয়েছেন, তা কেবল নিজের জন্যেই বানিয়েছেন। এটা তাঁরই তাজাল্লির জায়গা। তাঁর জন্যেই এটা বানিয়েছেন। এখন এই অন্তরের মধ্যে অন্য কাউকে এমনভাবে বসানো যে, সে অন্তরের উপরে আধিপত্য বিস্তার করবে, তা কোনো মুমিনের জন্য সমীচীন নয়। কারণ বন্ধুত্বের যোগ্য একজনই।

হযরত আবু বরক রাযি. একজন খাঁটি দোস্ত

এ পৃথিবীতে কেউ যদি কারো খাঁটি বন্ধু হতে পারতো, তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে হযরত আবু বরক সিদ্দীক রাযি.-এর চেয়ে অধিক বড়ো আর কে হতে পারতো? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যেভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন, দুনিয়াতে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। অন্য কোনো ব্যক্তি দাবিই করতে পারে না যে, আমি তাঁর মতো বন্ধুত্ব করতে সক্ষম। প্রত্যেক ধাপে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি খাঁটি প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম দিন যখন তিনি 'আমানন্না' (اٰمَنَّا) ও 'সদদাকনা' (صَدَّقْنَا) বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন, তখন থেকে সারা জীবনে কখনো সেই বিশ্বাস ও ঈমানের মধ্যে অণু পরিমাণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি।

গারে সাওরের ঘটনা

গারে সাওরে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। কুরআনে কারীমে [illegible] বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে,

إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

'তারা দুজন যখন গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি নিজের সাথীকে বলছিলেন আপনি চিন্তা করবেন না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গে আছেন।[২]

---

২. তাওবা : ৪০

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. গুহা সাফ করা এবং গুহার ভিতরে সাপ-বিচ্ছু ও বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের যেসব গর্ত রয়েছে সেগুলো বন্ধ করার জন্যে গুহায় আগে প্রবেশ করেন। তিনি কাপড় কেটে ছিদ্রসমূহ বন্ধ করেন। কাপড় শেষ হয়ে গেলে পায়ের গোড়ালি দ্বারা অবশিষ্ট ছিদ্র বন্ধ করেন।[৩]

হিজরতের একটি ঘটনা

হাদীস শরীফে এসেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করছিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. তাঁর চেহারা মুবারকে ক্ষুধার আলামত দেখতে পান। তিনি এক জায়গা থেকে দুধ এনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করেন, অথচ তখন তিনি নিজেও ক্ষুধার্ত ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. পরবর্তীতে এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে দুধ পান করেন যে, আমি পরিতৃপ্ত হয়ে যাই। অর্থাৎ, দুধ তো পান করেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু পরিতৃপ্ত হন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.। একারণে বন্ধুত্ব, আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের যেই পর্যায় হযরত আবু বকর রাযি. দেখিয়েছেন, তা দুনিয়াতে অন্য কেউ দেখাতে পারবে না।[৪]

বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত

কিন্তু এতদসত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا

'আমি যদি এ দুনিয়াতে কাউকে খাঁটি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম।'[৫]

অর্থাৎ, তাঁকেও বন্ধু বানাননি। কারণ, এ দুনিয়াতে প্রকৃত অর্থে বন্ধু হওয়ার যোগ্য কেউ নয়। বন্ধুত্ব কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যেই

৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খণ্ডঃ ৩, পৃঃ ১৮০, কানযুল উম্মাল খণ্ডঃ ৮, পৃঃ ৩৩৫

৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৪৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩২৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩

৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩৯০, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৮৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৯০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৩৯৯

অবধারিত। এমন বন্ধুত্ব, যা মানুষের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করবে, সে যা বলবে তাই করবে, মানুষের অন্তর তার অনুগামী হয়ে যাবে, এমন বন্ধুত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে শোভনীয় নয়।

বন্ধুত্ব আল্লাহর বন্ধুত্বের অনুগামী হওয়া উচিত

দুনিয়াতে যেই বন্ধুত্ব হবে, তা হবে আল্লাহর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের অনুগামী। তাই বন্ধুর কথায় গোনাহের কাজ করা যাবে না। বন্ধুত্ব পালন করতে গিয়ে নাফরমানি করা যাবে না। প্রথম কথা তো এই যে, এ দুনিয়ার সমস্ত বন্ধুত্ব আল্লাহ তা'আলার বন্ধুত্বের ও ভালোবাসার অনুগামী হওয়া উচিত।

নিষ্ঠাবান বন্ধুদের বিলুপ্তি

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, এই দুনিয়ায় এমন বন্ধু পাওয়া যায় কোথায়, যার বন্ধুত্ব আল্লাহর বন্ধুত্বের অনুগামী হবে? অনেক তত্ত্ব-তালাশ করেও এমন বন্ধু পাওয়া যায় না, যাকে সঠিক অর্থে বন্ধু বলা যায়। যার বন্ধুত্ব আল্লাহর বন্ধুত্বের অনুগামী হবে এবং কঠিন পরীক্ষার সময় পোক্ত প্রমাণিত হবে, এমন বন্ধু পাওয়া ভার। ভাগ্যবানেরাই এমন বন্ধু পেয়ে থাকেন। আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর সামনে যখন আমার বড়ো ভাইগণ তাদের বন্ধুদের কথা আলোচনা করতেন, তখন ওয়ালেদ ছাহেব তাদেরকে বলতেন যে, দুনিয়াতে তোমাদের অনেক বন্ধু। আমার ষাট বছর বয়স হয়ে গেলো কোনো বন্ধু খুঁজে পেলাম না। সারা জীবনে মাত্র দেড়জন বন্ধু পেয়েছি। একজন পুরা, আরেকজন অর্ধেক। কিন্তু তোমরা অনেক বন্ধু পেয়ে থাকো। বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে পরিপূর্ণ প্রমাণিত হয় এবং কঠিন পরীক্ষার সময়ও পাকা ও খাঁটি প্রমাণিত হয়, এমন বন্ধু খুব কম পাওয়া যায়।

যাই হোক, আল্লাহ তা'আলার অনুগামী হিসেবেও যদি কাউকে বন্ধু বানাও, তাহলে সেই বন্ধুত্বের মধ্যেও এ বিষয় গুরুত্বারোপ করবে, যেন বন্ধুত্বের সীমা অতিক্রম করে না যায়। বন্ধুত্ব যেন একটি সীমার মধ্যে থাকে। এমন যেন না হয় যে, যখন বন্ধুত্ব হয়েছে তখন সকাল-সন্ধ্যায় সবসময় তার সাথেই উঠা-বসা, তার সাথেই পানাহার, নিজের গোপন কথাও তার কাছে প্রকাশ করছো, নিজের সব বিষয় তার কাছে বলে যাচ্ছো। কাল যদি বন্ধুত্ব

শেষ হয়ে যায় তখন যেহেতু তোমার সব গোপন কথা তার কাছে প্রকাশ করেছো, এবার সে তোমার সব গোপন বিষয় সব জায়গায় বলতে থাকবে। যা তোমার জন্যে ক্ষতির কারণ হবে। এজন্যে বন্ধুত্ব ভারসাম্যের সাথে হওয়া উচিত। সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

শত্রুতার মধ্যে ভারসাম্য

এমনিভাবে কারো সাথে শত্রুতা থাকলে এবং সম্পর্ক ভালো না থাকলে সবসময় যেন তার দোষ বের করা না হয়। তার সব কাজে খুঁত তালাশ করা না হয়। আরে ভাই কোনো মানুষ খারাপ হয়ে থাকলে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ভালো গুণও তো রেখেছেন। এমন যেন না হয় যে, শত্রুতার কারণে তার ভালো গুণগুলোকেও তুমি দৃষ্টির আড়াল করে চলছো। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا

'কোনো জাতির সাথে শত্রুতা তোমাদেরকে যেন তাদের প্রতি অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে।'[৬]

নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে তোমার শত্রুতা আছে, কিন্তু এই শত্রুতার অর্থ এই নয় যে, এখন তার কোনো গুণই তুমি স্বীকার করবে না। বরং সে যদি কোনো ভালো কাজ করে তাহলে তা স্বীকার করা উচিত। কিন্তু যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী সাধারণত আমাদের দৃষ্টির সামনে থাকে না, এ কারণে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও সীমা অতিক্রম হয় এবং বিদ্বেষ ও শত্রুতার ক্ষেত্রেও সীমা লঙ্ঘন হয়।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গীবত

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সম্পর্কে কোন মুসলমান জানে না যে, সে অসংখ্য অত্যাচার করেছিলো। বহু আলেমকে শহীদ করেছে এবং বহু হাফেযকে হত্যা করেছে। এমনকি সে কাবা শরীফের উপরে আক্রমণ করেছে। এসব খারাপ কাজ সে করেছে। যে মুসলমানই তার এসব বিষয় পড়ে তার অন্তরেই তার ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু একবার এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে

৬. মায়েদা ঃ ৮

ওমর রাযি.-এর সামনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দোষ চর্চা শুরু করে তার গীবত করে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. সাথে সাথে ধরে বসেন এবং বলেন যে, এ কথা মনে করবে না যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জালেম বলে তার গীবত করা হালাল হয়ে গিয়েছে বা তার উপর অপবাদ দেওয়া হালাল হয়ে গিয়েছে। মনে রাখবে! যখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ থেকে তার অন্যায়, হত্যা, জুলুম ও খুনের বদলা নিবেন, তখন তুমি তার যে গীবত করছো বা তার উপর যে অপবাদ আরোপ করছো, তার বদলাও আল্লাহ তা'আলা তোমার থেকে নিবেন। এমন নয় যে, যে ব্যক্তি দুর্নামগ্রস্থ হয়েছে তার উপর যা ইচ্ছা দোষ চাপিয়ে যাবে। অপবাদ দিতে থাকবে। গীবত করতে থাকবে। এজন্যে শত্রুতাও ভারসাম্যের সাথে করো এবং ভালোবাসাও করো ভারসাম্যের সাথে।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের অবস্থা

বর্তমানে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক পরিবেশ রয়েছে তার অবস্থা এই যে, কারো সাথে যদি রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে, তাহলে তাকে এমনভাবে মাথায় তুলে নেয় যে, তার মধ্যে আর কোনো দোষই দেখে না। অন্য কেউ যদি তার দোষ বর্ণনা করে তা শোনাও সহ্য হয় না। সে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পাক-পবিত্র হয়ে যায়। আর যখন তার সাথে রাজনৈতিক শত্রুতা সৃষ্টি হয়, তখন তার মধ্যে কোনো ভালো গুণই চোখে পড়ে না। উভয় ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন চলছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন।

আমি বার বার বলে থাকি যে, শুধু নামায-রোযার নাম দ্বীন নয়। এটাও দ্বীনের অংশ যে, মহব্বত করলে ভারসাম্যের সাথে করবে এবং বিদ্বেষ করলেও ভারসাম্যের সাথে করবে। যারা আল্লাহর প্রকৃত বন্দা, তারা এসব বিষয় বুঝে থাকেন। যারা শাসক, নেতা এবং জাতির পথপ্রদর্শক তাদের সাথে সম্পর্ক থাকবে সসম্মানের দূরত্ব সহকারে । তাদের সাথে সম্পর্ক হলে সীমা অতিক্রম করবে না।

কাজী বাক্কার বিন কুতাইবা রহ.-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

কাজী বাক্কার বিন কুতাইবা রহ. নামে এক কাজী ছিলেন। তিনি ছিলেন বড়ো মাপের মুহাদ্দিস। মাদরাসাসমূহে 'তহাবী শরীফ' নামে হাদীসের একটি

কিতাব পড়ানো হয়। এর লেখক হলেন ইমাম তহাবী রহ.। কাজী বাক্কার বিন কুতাইবা রহ. তাঁর ওস্তাদ। ঐ যুগের বাদশাহ তাঁর প্রতি সদয় হন। এমন সদয় হন যে, সব বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। সব ব্যাপারে তাকে ডাকতেন। সব দাওয়াতে তাকে আহবান করতেন। এমনকি তাকে পুরো দেশের কাজী বানিয়ে দেন। এখন সব ফায়সালা তার কাছে আসছে। দিন-রাত বাদশার সঙ্গে ওঠা-বসা চলছে। তিনি কোনো সুপারিশ করলে বাদশাহ তা গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। তিনি তার কাজীর দায়িত্বও পালন করেন এবং উপযুক্ত পরামর্শও বাদশাহকে দেন।

তিনি তো ছিলেন আলেম ও বিচারক। বাদশাহর দাস ছিলেন না। বাদশাহ একবার ভুল কাজ করে বসেন। কাজী ছাহেব ফতওয়া দেন যে, বাদশাহর এ কাজ ভুল। শরীয়ত পরিপন্থী। এখন বাদশাহ অসন্তুষ্ট হয় যে, আমি এতোদিন পর্যন্ত তাকে খাওয়াচ্ছি, পরাচ্ছি, তাকে হাদিয়া তোহফা দিচ্ছি, তার সুপারিশ কবুল করছি এখন তিনি আমারই বিরুদ্ধে ফতওয়া দিলেন। সুতরাং অবিলম্বে তাকে কাজীর পদ থেকে বরখাস্ত করে। দুনিয়ার রাজা-বাদশারা খুব ছোট মনের হয়ে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উদার দেখা গেলেও বাস্তবে ছোট মনের হয়ে থাকে। এই বাদশাহ শুধু তাকে বিচারপতির পদ থেকে বরখাস্তই করেনি বরং তাঁর নিকট দূত পাঠিয়েছে যে, গিয়ে তাকে বলো, আজ পর্যন্ত আমি যতো হাদিয়া তোহফা দিয়েছি সব ফেরত দাও। কারণ, তুমি এখন আমার মর্জির খেলাফ কাজ শুরু করেছো। এবার আপনারা অনুমান করুন! কয়েক বছরের সব হাদিয়া, কখনো এটা দিয়েছে, কখনো ওটা দিয়েছে। বাদশাহর সেই লোক এলে তিনি তাকে বাড়ির একটা কামরার মধ্যে নিয়ে গেলেন। একটা আলমারির তালা খুললেন। পুরো আলমারি থলে দিয়ে ভরা ছিলো। তিনি ঐ দূতকে বললেন, তোমার বাদশাহ থেকে যতো হাদিয়ার থলে আসতো তা সবগুলোই এই আলমারিতে রাখা আছে। থলের উপর যে সিল-মোহর লাগানো আছে তা এখনও খোলা হয়নি। এসব থলে নিয়ে যাও। কারণ, যেদিন থেকে বাদশাহর সাথে সম্পর্ক হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, ঐ দিন থেকেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস আমার মাথায় ছিলো যে,

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا[৭]

---

৭. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২০

আমার ধারণা ছিলো যে, হয়তো এমন কোনো সময় আসবে, যখন এ সব হাদিয়া আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, বাদশাহর দেওয়া হাদিয়া-তোহফার মধ্যে থেকে একটি কণাও আমি আজ পর্যন্ত ব্যবহার করিনি। এটা হলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর উপর আমল করার সঠিক নমুনা। এমন নয় যে, যখন বন্ধুত্ব হলো তখন সব ধরনের সুবিধা ভোগ করা হচ্ছে, আর যখন শত্রুতা হলো তখন লজ্জা ও অনুতাপ হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

এই দু'আ করতে থাকো

প্রকৃত সঠিক অর্থে ভালোবাসা কেবল আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে হওয়া উচিত। এ কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, যা প্রত্যেক মুসলমানের সবসময় করা উচিত।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَيَّ

'হে আল্লাহ! আপনার মহব্বতকে সকল মহব্বতের উপর প্রবল করে দিন।'[১]

মানুষ যেহেতু দুর্বল, তার সঙ্গে মানবীয় চাহিদা লেগে আছে, এজন্যে অন্যের সাথেও মানুষের ভালোবাসা হয়। যেমন স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা, মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালোবাসা- এসব ভালোবাসা মানুষের সঙ্গে লেগে আছে। এসব ভালোবাসা মানুষের সাথে থাকবে। কখনো শেষ হবে না। তবে আসল কথা এই যে, মানুষ দু'আ করবে, হে আল্লাহ! এ সমস্ত ভালোবাসা আপনার ভালোবাসার অনুগামী হোক এবং আপনার ভালোবাসা সব ভালোবাসার উপর প্রবল হোক।

মহব্বত সীমাতিরিক্ত হলে এই দু'আ করবে

কারো প্রতি যদি ভালোবাসা হয়, আর অনুভূত হয় যে, ভালোবাসার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে, তাহলে অবিলম্বে আল্লাহর দিকে রুজু করবে যে, হে আল্লাহ! এ ভালোবাসা আপনি আমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, কিন্তু তা সীমা

---

[১] কানযুল উম্মাল, খণ্ডঃ ২, পৃঃ ১৮২

অতিক্রম করে যাচেছ। হে আল্লাহ! এমন যেন না হয় যে, আমি কোনো ফেৎনার শিকার হয়ে যাই। হে আল্লাহ! নিজ দয়ায় আমাকে ফেৎনায় লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। তারপর নিজের ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করবে। যে আজকের বন্ধু সে কালকের শত্রুও হতে পারে। কাল পর্যন্ত যার সাথে সবসময় উঠা-বসা ছিলো, পানাহার ছিলো, আজ এমন পরিণতি হলো যে, চেহারা দেখতেও রাজি না, এমন হওয়া উচিত নয়। যদি এমন ঘটনা হয়, তবে তার পক্ষ থেকে যেন হয়, তোমার পক্ষ থেকে যেন না হয়। যাই হোক, বন্ধুত্বের ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হলো শিক্ষা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি শিক্ষা এমন যে, তা যদি আমরা পালন করে চলি তাহলে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত গড়ে উঠবে।

বন্ধুত্বের পরিণতিতে গোনাহ

অনেক সময় এ বন্ধুত্বের পরিণতিতে আমরা গোনাহে লিপ্ত হই। চিন্তা করি যে, সে আমার বন্ধু। তার কথা না মানলে তার মন ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তার মন রক্ষার পরিণতিতে শরীয়ত ভেঙ্গে গেলে তার পরোয়া করা হয় না। অথচ শরীয়তে যদি উভয়টার সুযোগ না থাকে, তাহলে শরীয়ত রক্ষা করা মন রক্ষা করার উপর অগ্রগণ্য। আর যদি শরীয়তের মধ্যে সুযোগ থাকে, তবে নিঃসন্দেহে এই হুকুম রয়েছে যে, যথাসাধ্য মুসলমানের মন রক্ষা করা উচিত। তার মন ভাঙ্গা উচিত নয়। কারণ এটাও ইবাদত।

ভারসাম্যের পথ অবলম্বন করুন

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, এ হাদীসের মধ্যে মুআমালার বিষয়ে 'গুলু' করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোনো বিষয়ে যেন 'গুলু' না হয়। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও না এবং লেনদেনের ক্ষেত্রেও না। 'গুলু' অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। কোনো বিষয়েই মানুষ সীমালঙ্ঘন করবে না। বরং উপযুক্ত সীমার ভিতরে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এ হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মন্দের বদলা ভালোর মাধ্যমে দিন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ[১]

বিগত কয়েক জুমা ধরে সূরা মুমিনূনের প্রথম কয়েকটি আয়াতের আলোচনা চলছে। এসব আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের ঐসব গুণের বর্ণনা দিয়েছেন, যা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সফলতার কারণ হবে। তাই কোনো মুসলমান যদি দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করতে চায়, তাহলে এসব আয়াতে বর্ণিত গুণাবলির প্রতি তার গুরুত্বারোপ করা জরুরী। এসব আয়াতে উল্লিখিত সর্বপ্রথম গুণ হলো নামাযের মধ্যে 'খুশু' অবলম্বন করা। আলহামদুলিল্লাহ! এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৪, পৃঃ ২৫২-২৬৮ আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. আল মু'মিনুন ঃ ১-৭

ঈমানদারের দ্বিতীয় গুণ

এ সব আয়াতে উল্লিখিত দ্বিতীয় গুণ বা দ্বিতীয় আমল এই-

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

'সফলতা লাভকারী ঈমানদার তারা, যারা অসার বিষয় থেকে বিরত থাকে।'

এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তি তার সঙ্গে অসমীচীন কথা বললে বা অসৌজন্যে আচরণ করলে সেও অসমীচীন কথা ও অসৌজন্যে আচরণের মাধ্যমে তার উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে আলাদা হয়ে যায়। নিজেকে নিজে অসার কাজ ও কথা থেকে বিরত রাখে।

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর ঘটনা

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. থেকে হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর ঘটনা শুনেছি। তিনি এমন বুযুর্গ ছিলেন যে, নিকট অতীতে তার দৃষ্টান্ত মেলা কঠিন। রাজবংশের শাহজাদা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে বের হন এবং কুরবানী করেন। একবার দিল্লীর জামে মসজিদে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। বক্তব্য চলাকালে জনসমাবেশে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমি শুনেছি যে, আপনি হারামযাদা (নাউযুবিল্লাহ)। এতো বড়ো আলেম ও শাহাজাদাকে ভরা মজমার মধ্যে এই গালি দিলো এবং মজমাও ছিলো ভক্তদের। আমার ওয়ালেদ ছাহেব বলতেন যে, আমাদের মতো কোনো মানুষ হলে তাকে শাস্তি দিতো। আর নিজে শাস্তি না দিলেও তার ভক্তবৃন্দ তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলতো। কমপক্ষে প্রতি উত্তরে এ কথা তো বলতো যে, তুই হারামজাদা, তোর বাপ হারামজাদা। কিন্তু হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.- যিনি পয়গাম্বরসুলভ দাওয়াতের আমল করছিলেন- উত্তরে বললেন, আপনি ভুল সংবাদ পেয়েছেন। আমার মায়ের বিয়ের সাক্ষী তো আজও দিল্লীতে রয়েছে। তিনি গালিকে মাসআলা বানিয়ে দিলেন। গালির উত্তরে গালি দেননি।

গালির উত্তরে গালি দিবে না

গালির উত্তরে গালি দিবে না। যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্য ব্যক্তি তোমাকে যেমন গালি দিয়েছে তুমিও তাকে তেমন গালি দেওয়ার অধিকার

রয়েছে। কিন্তু নবীগণ এবং তার ওয়ারিসগণ প্রতিশোধ গ্রহণের এই অধিকার ব্যবহার করেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাজীবনে কখনো এই অধিকার ব্যবহার করেননি। সবসময় মাফ করে দিয়েছেন। ছেড়ে দিয়েছেন। নবীগণের ওয়ারিসদেরও এ আদর্শই ছিলো।

প্রতিশোধ গ্রহণ না করে মাফ করে দাও

আরে ভাই! কেউ যদি তোমাকে গালি দিয়ে থাকে তাহলে তোমার কি ক্ষতি হয়েছে? তোমার আখেরাতের কি নষ্ট হয়েছে? বরং তোমার তো মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তুমি যদি প্রতিশোধ না নাও, মাফ করে দাও তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মাফ করে দিবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যের ভুল মাফ করে দেয় আল্লাহ তা'আলা তাকে সেদিন মাফ করে দিবেন, যেদিন সে মাফের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন। এজন্যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা ছেড়ে দাও, মাফ করে দাও।

বুযুর্গদের বিভিন্ন শান

এক বুযুর্গের কাছে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো যে, হযরত আমি শুনেছি আল্লাহর ওলীদের বিরল-বিস্ময়কর শান হয়ে থাকে। কারো এক রং, কারো অন্য রং এবং কারো অন্য শান হয়ে থাকে। আল্লাহর ওলীদের সেই শান দেখতে আমার মন চায়। ঐ বুযুর্গ তাকে বললেন, তুমি কোন ঘোরের মধ্যে পড়লে! ওলী ও বুযুর্গদের শান দেখার চিন্তায় পড়ো না। নিজের কাজ করতে থাকো। লোকটি পীড়াপীড়ি করলো। আমি তো একটু দেখতে চাই। দুনিয়াতে কেমন কেমন বুযুর্গ হন? ঐ বুযুর্গ বললেন, তুমি যদি দেখতেই চাও তাহলে দিল্লীর অমুক মসজিদে যাও। সেখানে তুমি তিনজন বুযুর্গকে যিকিরে মগ্ন দেখতে পাবে। তুমি গিয়ে প্রত্যেকের পিঠের উপর একটি করে ঘুষি মারবে, তারপর দেখবে আল্লাহর ওলীদের কেমন শান হয়ে থাকে। সুতরাং লোকটি গেলো। সেখানে গিয়ে দেখে বাস্তবেই তিনজন বুযুর্গ বসে যিকির করছেন। সে গিয়ে প্রথম বুযুর্গের পিঠে একটি ঘুষি মারলো। তিনি মুখ ঘুরিয়ে দেখলেনও না। নিজের যিকিরে মগ্ন থাকলেন। দ্বিতীয় বুযুর্গকে যখন ঘুষি মারলো, তখন ঘুরে উঠে তিনিও একটি ঘুষি মারলেন, তারপর নিজের কাজে

রত হলেন। তৃতীয় বুযুর্গকে ঘুষি মারলে তিনি ঘুরে ওঠে তার হাত বুলাতে আরম্ভ করলেন। এবং বললেন,আপনি ব্যথা তো পাননি?

তারপর লোকটি ঐ বুযুর্গের কাছে ফিরে এলো, যিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- কি হলো? লোকটি বললো, অবাক কান্ড ঘটেছে। যখন আমি প্রথম বুযুর্গকে ঘুষি মেরেছি তখন তিনি আমার দিকে ঘুরেও তাকাননি। যখন দ্বিতীয় বুযুর্গকে ঘুষি মেরেছি তখন ঘুরে উঠে তিনিও আমাকে একটি ঘুষি মেরেছেন। আর যখন তৃতীয় বুযুর্গকে ঘুষি মেরেছি তখন তিনি ঘুরে উঠে আমার হাত বুলাতে আরম্ভ করেছেন।

ঐ বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা বলো তো যিনি তোমাকে ঘুষি মেরেছেন, তিনি কি মুখ দিয়ে কিছু বলেছেন? লোকটি বললো, মুখ দিয়ে তো কিছু বলেননি। শুধু ঘুষি মেরে আবার নিজের কাজে মশগুল হয়েছেন।

প্রতিশোধ গ্রহণে আমার সময় নষ্ট করবো কেন?

ঐ বুযুর্গ বললেন, এবার শোনো! প্রথম বুযুর্গ, যিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তিনি চিন্তা করেছেন যে, আমি প্রতিশোধ গ্রহণে আমার সময় নষ্ট করবো কেন? সে আমাকে ঘুষি মেরেছে তো আমার কি হয়েছে? এখন আমি পিছনে ফিরবো। দেখবো যে কে মেরেছে? তারপর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। যতোটুকু সময় এতে ব্যয় হবে, তা আল্লাহ তা'আলার যিকিরে ব্যয় করবো না কেন?

প্রথম বুযুর্গের দৃষ্টান্ত

প্রথম বুযুর্গের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক ব্যক্তিকে বাদশাহ ডাকলো এবং বললো যে, তুমি আমার কাছে আসো। আমি তোমাকে একটি বড়ো ধরনের পুরস্কার দিবো। এবার ঐ ব্যক্তি পুরস্কারের আগ্রহে দৌড়িয়ে বাদশার মহলের দিকে যাচ্ছে। সময় কম, যথা সময় তাকে পৌঁছতে হবে। পথে এক ব্যক্তি তাকে ঘুষি মারলো। এখন এ ব্যক্তি তার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, না নিজের পথ চলা অব্যাহত রাখবে এবং যে কোনোভাবে দ্রুত বাদশার কাছে পৌঁছবে? বলা বাহুল্য যে, সে আঘাতকারীর সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না, বরং সে তো এই চিন্তায় থাকবে যে, আমি যে কোনোভাবে দ্রুত বাদশার কাছে পৌঁছে পুরস্কার গ্রহণ করি। একইভাবে এই বুযুর্গ তার আঘাতকারীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হননি। বরং নিজের যিকিরে মশগুল থেকেছেন, যেন সময় নষ্ট না হয়।

দ্বিতীয় বুযুর্গের ধরন

দ্বিতীয় বুযুর্গ, যিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। তিনি চিন্তা করেছেন যে, শরীয়ত এ অধিকার দিয়েছে যে, যে পরিমাণ সীমালঙ্ঘন কেউ তোমার সঙ্গে করে ঐ পরিমাণ তুমিও তার সঙ্গে করতে পারবে। তার অধিক করতে পারে না। তুমি তাকে একটি ঘুষি মেরেছিলে তিনিও তোমাকে একটি ঘুষি মেরে দিয়েছে। তুমি তাকে মুখে কিছু বলো নি, তিনিও তোমাকে মুখে কিছু বলেননি।

প্রতিশোধ গ্রহণও কল্যাণ কামনা

হযরত থানভী রহ. বলেন যে, কতক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা তাদের সাথে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিশোধ গ্রহণও হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তির কল্যাণ কামনার কারণে। কারণ, কারণ আল্লাহর ওলীর অবস্থা এই হয়ে থাকে যে, কোনো ব্যক্তি যদি তাকে কষ্ট দেয় বা তার সাথে বেয়াদবী করে আর তিনি সবর করেন তাহলে এই সবর করার ফলে ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায়।

হাদীসে কুদসীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করবে তার জন্যে আমার পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রইলো।'[২]

কতক সময় আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দার সাথে করা অত্যাচারের কারণে এমন আযাব নাযিল করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তা থেকে হেফাজত করুন। কারণ, ঐ ওলীর সবর ঐ ব্যক্তির উপর এসে পতিত হয়। এ কারণেই আল্লাহওয়ালাগণ কতক সময় তার সাথে করা অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, যেন তার বদলা হয়ে যায়। আল্লাহর আযাব যেন তার উপর পতিত না হয়।

আল্লাহ তা'আলা কেন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন

হযরত থানভী রহ. বলেন যে, কারো যদি এ বিষয়ে প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তা'আলার এ আচরণ বিস্ময়কর যে, আল্লাহর ওলীগণ তো এতো

২. জামেউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী কৃত, খণ্ডঃ ১, পৃঃ ৩৫৭, মাআরিজুল কবুল, হাফেয ইবনে আহমাদ হাকমি কৃত, খণ্ডঃ ৩, পৃঃ ১০০১

স্নেহ-পরায়ণ যে, তারা তাদের উপর করা অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আযাব দেওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন। প্রতিশোধ নেওয়া না হলে তিনি অবশ্যই আযাব দিবেন। এর অর্থ তো এই দাঁড়ালো যে, আল্লাহ ওয়ালাগণের স্নেহ আল্লাহ তা'আলার স্নেহ ও দয়ার তুলনায় অধিক। এর উত্তর দিয়ে তিনি বলেন, মূলত সিংহীকে কেউ উত্যক্ত করলে সে তা উপেক্ষা করে, প্রতিশোধ নেয় না। তার উপর আক্রমণ করে না। কিন্তু কেউ যদি তার বাচ্চাকে উত্যক্ত করে তাহলে সিংহী তা সহ্য করে না। উত্যক্তকারীর উপর আক্রমণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার শানে মানুষ বেয়াদবী করে- কেউ শিরক করে, কেউ আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর সহনশীলতার গুণে তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আল্লাহর ওলীগণ- যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা- তাদের শানে কেউ বেয়াদবী করলে আল্লাহ তা'আলা সহ্য করেন না। এ কারণে এ বেয়াদবী মানুষকে ধ্বংস করে। তাই যেখানেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো আল্লাহর ওলী প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন, সেই প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার কল্যাণ কামনার জন্যে হয়ে থাকে। কারণ, যদি প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তাহলে জানা নেই আল্লাহ তা'আলার কোন আযাব তার উপর আপতিত হয়!

তৃতীয় বুযুর্গের ধরন

আর তৃতীয় বুযুর্গ, যিনি তোমার হাত বুলাতে আরম্ভ করেছেন, তাকে আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের প্রতি স্নেহ ও মমতার গুণ দান করেছেন। এ কারণে তিনি ঘুরে উঠে হাত বুলাতে আরম্ভ করেছেন।

প্রথম বুযুর্গের পদ্ধতি সুন্নাত

কিন্তু আসল সুন্নাত পদ্ধতি ঐটা, যা প্রথম বুযুর্গ অবলম্বন করেছেন। কেউ যদি তোমার ক্ষতি করে তাহলে তার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা তুমি কেন করবে? কারণ, তুমি যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো তাহলে তোমার কি লাভ হবে? এতোটুকুই তো হবে যে, তোমার মনের আগুন ঠান্ডা হবে। কিন্তু তুমি যদি তাকে মাফ করে দাও, ক্ষমা করে দাও, তাহলে মনের আগুন তো বটেই জাহান্নামের আগুনও ঠান্ডা হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন।

মাফ করা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ

আজকাল আমাদের ঘরে, পরিবারে এবং সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে দিন-রাত এসব সমস্যা দেখা দেয় যে, অমুক আমার সঙ্গে এই করেছে, অমুক এই করেছে। এখন তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় বিভোর। অন্যদের কাছে অভিযোগ করে ফিরছে। তাকে তিরস্কার করছে। অন্যদের নিকট তার গীবত করছে। অথচ এগুলো গোনাহের কাজ। কিন্তু তুমি যদি মাফ করে দাও এবং ছেড়ে দাও তাহলে তুমি অনেক বড়ো ফযীলত ও সওয়াবের অধিকারী হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

'যে ধৈর্য ধারণ করলো এবং ক্ষমা করে দিলো নিঃসন্দেহে এটা উচ্চ সাহসীকতার কাজ।'[৩]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

'অন্যের মন্দ আচারণের বদলা ভালো আচরণ দ্বারা দাও। এর ফল এই হবে যে, যার সঙ্গে শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অনুরক্ত হয়ে যাবে।'[৪]

তবে সাথে একথাও বলেছেন যে,

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

'এ আমল তাদেরই ভাগ্যে জুটে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যের তাওফীক দান করেন এবং এ দৌলত বড়ো ভাগ্যবানরাই লাভ করে থাকে।'[৫]

নবী আলাইহিমুস সালামগণের উত্তর দেওয়ার ধরন

হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরামের পদ্ধতি এই যে, তাঁরা তিরস্কার করেন না। এমনকি সম্মুখস্থ কোনো ব্যক্তিও যদি তিরস্কার করে তাহলেও উত্তরে তাঁরা তিরস্কার করেন না।

সম্ভবত হযরত হূদ আলাইহিস সালামের ঘটনা যে, তাকে তাঁর জাতি বললো,

---

৩. আশ শূরা : ৪৩

৪. হা মীম সিজদা : ৩৪

৫. হা মীম সিজদা : ৩৫

إِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

নবীকে বলা হচ্ছে যে, আমাদের ধারণায় তুমি নিতান্ত পর্যায়ের বেউকুফ, নির্বোধ। আমরা তোমাকে অন্যতম মিথুক মনে করি।[৬] যে সকল নবীর উপর প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা নিবেদিত, তাঁদের সম্পর্কে এ কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রতি উত্তরে নবী বলছেন,

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'হে আমার জাতি! আমি বেউকুফ নই, বরং আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একটি পয়গাম নিয়ে এসেছি।'[৭]

অন্য এক নবীকে বলা হচ্ছে,

إِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

'আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত দেখছি।'[৮]

উত্তরে নবী বলছেন,

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'হে আমার জাতি! আমি পথভ্রষ্ট নই। আমি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নবী হয়ে এসেছি।'[৯]

আপনারা লক্ষ করলেন, নবীগণ তিরস্কারের উত্তর তিরস্কার দ্বারা দেননি।

রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- যাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীন বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, তাঁর উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, হাঁটু রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে, কিন্তু মুখে এই দু'আ জারী রয়েছে যে.

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

---

৬. আ'রাফ ঃ ৬৬

৭. আ'রাফ ঃ ৬৭

৮. আ'রাফ ঃ ৬০

৯. আ'রাফ ঃ ৬১

'হে আল্লাহ! আমার এ জাতিকে হেদায়েত দান করুন। কারণ, এরা জাহেল। এরা বাস্তব অবস্থা জানে না। এ কারণে তারা আমার সঙ্গে এ আচরণ করছে।'[১০]

নবীগণ কখনোই মন্দ আচরণের প্রতিশোধ মন্দ আচরণ দ্বারা নেননি। গালির বিনিময়ে গালি দেননি। সেই মক্কাবাসী, যারা মক্কায় বসবাসকারী সাহাবায়ে কেরামের জীবনকে আযাবে পরিণত করেছিলো। সাহাবায়ে কেরামকে উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়ানো হয়েছে। বড়ো বড়ো পাথর তাদের বুকের উপর রাখা হয়েছে। তাদেরকে বয়কট করা হয়েছে। তাদের পানাহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তেরো বছর পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে জুলুম অত্যাচারের জাঁতায় নিষ্পেষিত করা হয়েছে। কিন্তু সেই মক্কা শহরেই মক্কা বিজয়ের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিজয়ীরূপে প্রবেশ করছিলেন, তখনকার চিত্র অঙ্কন করে হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি দেখছিলাম যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনীর উপর আরোহণ করে বিজয়ীরূপে মক্কা মুকাররমায় এ অবস্থায় প্রবেশ করছেন যে, তাঁর মস্তক অবনত ছিলো। অন্য কোনো বিজয়ী হলে তার মস্তক সটান থাকতো। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মস্তক ছিলো অবনত। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিলো। পবিত্র জবানে উচ্চারিত হচ্ছিলো এই আয়াত,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।'[১১]

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

সে সময় তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি অস্ত্র সমর্পণ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সেও নিরাপদ, যে ব্যক্তি হারামের মধ্যে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ, যে ব্যক্তি আবু

১০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৪৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪০১৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৪২৯

১১. ফাতহ : ১ (সীরাতে মুস্তফা খণ্ডঃ ৩, পৃঃ ২৪, ইবনে ইসহাক ও মুস্তাদরাকে হাকেমের উদ্ধৃতিতে)

সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ। তারপর তিনি সমস্ত মক্কাবাসীকে একত্রিত করে বলেন,

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

'আজকে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা সকলে মুক্ত।'[১২]

এ আচরণ তিনি ঐ সব লোকের সঙ্গে করেছেন, যারা ছিলো তাঁর রক্ত পিপাসু।

এসব সুন্নাতের উপরেও আমল করুন

মোটকথা, নবীগণের সুন্নাত এই যে, মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দিবেন না, গালীর উত্তর গালির দ্বারা দিবেন না, বরং প্রতিপক্ষের সঙ্গে সদয় আচরণ করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সবগুলো পদ্ধতিই সুন্নাত। আমরা শুধুমাত্র বাহ্যিক কিছু জিনিসের নাম রেখেছি সুন্নাত। যেমন দাড়ি রাখা, বিশেষ ধরনের পোষাক পরিধান করা, ইত্যাদি। যতোগুলো সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফীক হবে তা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। কিন্তু সুন্নাত শুধু এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এগুলোও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত যে, মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দিবেন না, গালির উত্তরে গালির দ্বারা দিবেন না। যে ব্যক্তি এ সুন্নাতের উপর আমল করবে তার সম্পর্কে কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

'যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করলো এবং ক্ষমা করে দিলো নিঃসন্দেহে এটা অনেক বড়ো হিম্মতের কাজ।'[১৩]

এটা অনেক বড়ো হিম্মতের ব্যাপার যে, মানুষের ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে, রক্ত উদ্বেলিত হচ্ছে, সে সময় মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে সীমার উপর অটল থাকবে এবং সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে মাফ করে দিবে এবং অন্য পথ ধরে চলে যাবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

---

১২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খণ্ডঃ ৪, পৃঃ ৩০০-৩০১

১৩. আশ শূরা ঃ ৪৩

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

'যারা অসার বিষয় থেকে দূরে থাকে।'[১৪]

এ সুন্নাতের উপর আমল করলে দুনিয়া জান্নাত হয়ে যাবে

আপনারা চিন্তা করে দেখুন! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নাত যদি অর্জিত হয় তাহলে কি দুনিয়াতে ঝগড়া-বিবাদ থাকবে? যতো ঝগড়া, যতো ফাসাদ, যতো শত্রুতা সব এ কারণে যে, এই সুন্নাতের উপর আমল নেই। আল্লাহ তা'আলা যদি নিজ দয়ায় এই সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফীক দান করেন, তাহলে এ দুনিয়া যা আজ ঝগড়া-বিবাদের কারণে জাহান্নামে পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে শত্রুতার আগুন প্রজ্বলিত হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নাতের উপর আমল করার ফলে তা জান্নাত হয়ে যাবে, পুষ্প উদ্যানে পরিণত হবে।

কষ্ট পেলে এ কথা চিন্তা করুন

যখনই আপনি কারো দ্বারা কষ্ট পাবেন তখনই চিন্তা করবেন যে, আমি প্রতিশোধ গ্রহণের আবর্তে পড়বো কেন? দূর করো এ চিন্তা! আল্লাহ আল্লাহ করবো এবং তাকে মাফ করে দিবো। আসলে হয় এই যে, একজন আপনার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করলো আপনি তার সঙ্গে তার চেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলেন, এরপর ঐ ব্যক্তি আপনার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, তারপর আপনি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, এভাবে শত্রুতার এক অন্তহীন ধারা শুরু হয়ে যাবে, যার কোনো শেষ নেই। কিন্তু পরিশেষে আপনাকে কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে হার মানতে হবে। এই বিবাদ শেষ করতে হবে। তাই আপনি প্রথম দিনই তাকে মাফ করে দিয়ে ঝগড়া শেষ করে ফেলুন।

চল্লিশ বছরের যুদ্ধের কারণ

জাহেলিয়াতের যুগে দীর্ঘ একটি যুদ্ধ হয়েছিলো। যাকে 'বাসুসে'র যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধের সূচনা এভাবে হয়েছিলো যে, এক ব্যক্তির মুরগির বাচ্চা অন্য এক ব্যক্তির ক্ষেতে গিয়ে চারা নষ্ট করে। এর ফলে বিবাদ শুরু হয়।

---

১৪. ফুরকান : ৭২

উভয়ের বংশ ও গোত্রের লোকেরা চলে আসে। প্রথমে লাঠি চালানো হয়, তারপর তরবারী কোষ মুক্ত করা হয়। এই যুদ্ধ চল্লিশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। বাবার মৃত্যুর সময় ছেলেকে ওসিয়ত করে যেতো- বৎস! সব কিছু করবে কিন্তু আমার ঘাতককে ক্ষমা করবে না। শুধু একটি মুরগির বাচ্চার কারণে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রথম দিনই যদি কুরআনে কারীমের আয়াত,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

'সফলতা লাভকারী ঈমানদার তারা, যারা অসার বিষয় থেকে বিরত থাকে।'-এর উপর আমল করতো, তাহলে সেদিনই এ ঝগড়া মিটে যেতো।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে এ বিষয়টি আমাদের অন্তরে বসিয়ে দিন। আমাদেরকে এর উপরে আমল করার সাহস ও উদ্দীপনা দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অন্যের জিনিস ব্যবহার করা*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ
نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ
رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهٗ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُهٗ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ
بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ثَوْبًا فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْسُوْهُ مِثْلَهٗ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ
سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْمُ بِهٖ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[১]

অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করা

হযরত মুসতাওরাদ বিন শাদ্দাদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের গ্রাস ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ খানার সমপরিমাণ ওজনের জাহান্নামের অঙ্গার ভক্ষণ করাবেন। অর্থাৎ, কোনো মুসলমানের হক নষ্ট করে বা কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে বা কোনো মুসলমানের বদনাম করে নিজের কোনো স্বার্থ উদ্ধার করবে; যেমন কতক মানুষ এমন রয়েছে, যাদের জীবিকার ভিত্তিই হলো অন্যকে কষ্ট দিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করা। যেমন ঘুষ

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১১, পৃঃ ১৪৮-১৬৭, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৩৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৩২৫

নিয়ে খেলো। সে মূলত একজন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়ে ভক্ষণ করলো। এমনিভাবে কাউকে ধোঁকা দিয়ে তার থেকে পয়সা হাতিয়ে নিলো, তাহলে সেও একজন মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে ভক্ষণ করলো। এমনিভাবে যদি কোনো মুসলমানের দুর্নাম রটিয়ে পয়সা অর্জন করে; যেমন বর্তমানে প্রচার-প্রসার ও পাবলিসিটির যুগ। এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে অন্যকে ব্লাকমেইল করাকে নিজের পেশা ও আমদানীর মাধ্যম বানিয়ে রেখেছে। এমন ব্যক্তি অন্যের দুর্নাম রটিয়ে পয়সা অর্জন করে এবং ভক্ষণ করে। এ সবগুলো পন্থাই এ হাদীসের অর্থের অন্তর্ভুক্ত যে, কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে যে ব্যক্তি খাবার খাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ খানার সমপরিমাণ ওজনের জাহান্নামের অঙ্গার খাওয়াবেন।

অন্যকে কষ্ট দিয়ে পোষাক বা খ্যাতি অর্জন করা

এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে এবং তার হক নষ্ট করে পয়সা কামাবে তারপর ঐ পয়সা দ্বারা পোষাক বানাবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের ঐ পরিমাণ পোষাক পরাবেন। অর্থাৎ, আগুনের অঙ্গারের পোষাক পরাবেন।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে খ্যাতির আসন অর্জন করবে; যেমন কতক লোক অন্যের নিন্দা করে নিজের সুনাম অর্জন করে। ইলেকশনের সময় নির্বাচনী সমাবেশে অন্যের দোষ বর্ণনা করে নিজের সুনাম বর্ণনা করে। এমন লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দুর্নামের আসনে খাড়া করবেন। এখানে দুনিয়াতে তো সে সুনাম অর্জন করেছিলো, কিন্তু এর ফলে আল্লাহ তা'আলা সেখানে তার দুর্নাম রটাবেন। সর্বসাধারণের সামনে তাকে লাঞ্ছিত করবেন যে, এ এমন এক ব্যক্তি, যে মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে খ্যাতির আসন অর্জন করেছিলো।

এ হাদীস দ্বারা অনুমান করুন যে, কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া এবং তার হক নষ্ট করা কতো বিপজ্জনক কাজ এবং কতো মারাত্মক অপরাধ। এজন্যে আমি বার বার বলি যে, প্রত্যেকে নিজের কাজ এবং আচরণে লক্ষ রাখবেন, যেন অন্যের হক নষ্ট না হয়, আর এর ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের থেকে এর হিসাব গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

অন্যের জিনিস নেওয়া

অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন তার কোনো সাথী বা বন্ধুর জিনিস রসিকতা করেও না নেয় এবং বাস্তবেও না নেয়।[২]

অন্যের মালিকানাভুক্ত জিনিস তার অনুমতি ছাড়া, বরং খুশি মনে দেওয়া ছাড়া আপনার জন্যে ব্যবহার করা বা অধিকারে নেওয়া জায়েয নেই। বাস্তবেও এমন করা জায়েয নেই এবং ঠাট্টা করেও জায়েয নেই। সে তোমার নিকটতম বন্ধু বা আত্মীয় হলেও তার জিনিস অনুমতি এবং খুশি মনে দেওয়া ছাড়া ব্যবহার করা মোটেই জায়েয নেই।

খুশি মনে দেওয়া ছাড়া অন্যের জিনিস হালাল নয়

অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'মুসলমানের কোনো সম্পদ তার খুশি মনের অনুমতি ছাড়া অন্যের জন্যে হালাল নয়।'[৩]

এ হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'অনুমতি' শব্দ ব্যবহার করেননি, 'খুশি মনে' শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কারো এমন কোনো জিনিস চাইলেন- যা দিতে তার মন চাচ্ছে না- কিন্তু ভদ্রতা রক্ষার্থে সে তা দিয়ে দিলো, অথচ তার মন খুশি নয়। এই জিনিস যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে তা আপনার জন্যে জায়েয নয়। কারণ, আপনি তার মাল তার খুশি মনের অনুমতি ছাড়া নিয়েছেন।

মওলবীগিরি বিক্রির জিনিস নয়

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব রহ. তাঁর কোনো ওস্তাদ বা শাইখের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, একবার তিনি এক দোকানে একটি জিনিস ক্রয় করতে যান। তিনি ঐ জিনিসের মূল্য জিজ্ঞাসা করেন। দোকানদার মূল্য বলে। তিনি মূল্য পরিশোধ করছিলেন, এমন সময় অন্য

---

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২০৮৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৫০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭২৬১

৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০১২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৯৭৭৪

এক ব্যক্তি সেখানে আসে, যে ঐ মাওলানা ছাহেবকে চিনতো। দোকানদার তাকে চিনতো না। ঐ লোকটি দোকানদারকে বললো যে, ইনি অমুক মাওলানা ছাহেব, তাকে ছাড় দিয়েন। তখন মাওলানা ছাহেব বললেন, আমি আমার মওলবী হওয়ার মূল্য নিতে চাই না। এই জিনিসের প্রকৃত মূল্য যা তাই আমার থেকে নাও। এ কারণে যে, প্রথমে তুমি যেই মূল্য বলেছিলে, সেই মূল্যে তুমি খুশি মনে এই জিনিস দিতে প্রস্তুত ছিলে। এখন যদি অন্য মানুষের কথায় তুমি ছাড় দাও, আর তাতে তোমার দিল পরিতৃপ্ত না থাকে, তাহলে তা খুশি মনে দেওয়া হবে না। তখন এ জিনিসের মধ্যে আমার বরকত হবে না এবং তা নেওয়া আমার জন্যে হালাল হবে না। এজন্যে তুমি আমাকে যেই পরিমাণ মূল্য বলেছিলে, ঐ পরিমাণ মূল্যই নাও।

এ ঘটনা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, মওলবীগিরি বিক্রির জিনিস নয় যে, বাজারে তা বিক্রি করা হবে, আর মানুষ এর কারণে জিনিসের মূল্য কম রাখবে।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ওসীয়ত

আমাদের ইমাম হযরত আবু হানীফা রহ. তাঁর শাগরিদ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-কে ওসীয়ত করেন যে, যখন তুমি কোনো জিনিস ক্রয় করবে বা ভাড়া নিবে, যেই পরিমাণ মূল্য ও ভাড়া সাধারণ মানুষ দিয়ে থাকে তুমি তার থেকে কিছু বেশি দিবে। এমন যেন না হয় যে, তোমার কম দেওয়ার কারণে ইলম ও দ্বীনের অসম্মান ও অমর্যাদা হয়।

যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সতর্কতার এই মাকাম দান করেন, তারা এই পরিমাণ লক্ষ রাখেন যে, অন্যের কোনো জিনিস যেন তার অন্তরের সন্তুষ্টি ছাড়া আমার কাছে না আসে। যেমন আপনি কারো থেকে কোনো জিনিস চাইবেন, চাওয়ার আগে একটু চিন্তা করুন যে, অন্য কেউ যদি আপনার কাছে এ জিনিস চাইতো, তাহলে কি আপনি তাকে খুশি মনে তা দিতেন? আপনি যদি খুশি মনে রাজি না হতেন, তাহলে ঐ জিনিস অন্যের থেকে চাইবেন না। কারণ, হতে পারে ভদ্রতার খাতিরে সে আপনাকে ঐ জিনিস দিলো, কিন্তু তার অন্তর খুশি নয়। এর ফলে আপনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর লক্ষ্যে পরিণত হলেন যে, 'কোনো মুসলমানের সম্পদ তার খুশি মনের অনুমতি ছাড়া হালাল নয়।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কতার একটি ঘটনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতো উঁচু মাকাম ছিলো যে, তিনি এ পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, একবার তিনি হযরত ওমর ফারুক রাযি.-কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে জান্নাতের মধ্যে যেই মহল বানিয়েছেন আমি তা নিজ চোখে দেখেছি। সে মহল এতো সুন্দর ছিলো যে, আমার মন চাইলো ঐ মহলের ভিতরে প্রবেশ করি। আমি যখন ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ হলো। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অনেক বেশি আত্মমর্যাদা দান করেছেন। অন্য কোনো ব্যক্তি যদি তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে প্রবেশ করে তাহলে তোমার আত্মমর্যাদায় বাঁধে। এজন্যে আমি চিন্তা করলাম যে, তোমার অনুমতি ছাড়া এ ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়। এজন্যে আমি তাতে প্রবেশ করিনি। হযরত ওমর ফারুক রাযি. এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং নিবেদন করলেন-

أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ؟

'হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হোক। আপনার ব্যাপারেও কি আমি আত্মমর্যাদা দেখাবো?'[৪]

উম্মতের জন্যে শিক্ষা

এবার আপনারা অনুমান করুন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন ওমর ফারুক রাযি.-এর মতো মানুষ নিজের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু সবকিছু তাঁর উপর কোরবান করতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর কাছে বড়ো থেকে বড়ো কোনো সম্পদ থাকলে আর তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহারে আসলে তিনি নিজের জন্যে গর্বের বিষয় মনে করবেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর মহলের মধ্যে প্রবেশ করেননি। অথচ তা ছিলো জান্নাতের জায়গা। যেখানে কোনো কষ্ট নেই। ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ হাদীস দ্বারা মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে

৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪০৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪০৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৩৮০১

এই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, দেখো! আমি নিজেও আমার এমন নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীর ঘরে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করিনি। তাহলে তোমাদের জন্যে সাধারণ অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিস ব্যবহার করা কি করে জায়েয হতে পারে?

সালামের উত্তরের জন্যে তায়াম্মুম

আল্লাহ তা'আলা আমাদের মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কবরকে নূর দ্বারা ভরে দিন- আমীন। এঁরা আমাদের জন্যে বিস্ময়কর ভান্ডার রেখে গিয়েছেন। এক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একপথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এক সাহাবী তাকে দেখে সালাম করেন। এটা ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা ছিলো। তখন ওযু ছাড়া আল্লাহর নাম নেওয়া মাকরূহ ছিলো। 'সালাম'ও আল্লাহ তা'আলার 'আসমায়ে হুসনা'র অন্তর্ভুক্ত। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযু ছিলো না। এমতাবস্থায় যদি তিনি 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম' বলতেন তাহলে ওযু ছাড়া আল্লাহর নাম নেওয়া হতো। তিনি ওযু ছাড়া আল্লাহর নাম নেওয়া থেকে বাঁচার জন্যে নিকটবর্তী যে বাড়ি ছিলো তার দেয়ালে তায়াম্মুম করেন। তারপর তিনি 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে উত্তর দেন।[৫]

হাদীস থেকে ওলামায়ে কেরামের মাসআলা বের করা

ঐ সাহাবী তো হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ফুকাহায়ে কেরামের অবস্থা ছিলো এই যে, একেকটি হাদীস থেকে উম্মতের জন্যে কী কী হেদায়েত বের হয়, তা উদ্ভাবনে তাঁরা ব্যপৃত হয়েছেন। হাদীস থেকে বিধান বের করার বিষয়টি যখন আমি কল্পনা করি, তখন আমার সামনে এই দৃশ্য ভেসে ওঠে যে, কোনো বিমান যখন বিমানবন্দরে অবতরণ করে, তখন অবিলম্বে সব লোক নিজ নিজ ডিউটি করতে আরম্ভ করে। কেউ তা পরিষ্কার করে, কেউ তার মধ্যে পেট্রোল ভরে, কেউ যাত্রীদেরকে নামায়, কেউ খাবার উঠায়- সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে যায়। এমনিভাবে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু

---

৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫৪, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৯, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৭৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬৮৮৩

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস সামনে আসে, তখন উম্মতের আলেমগণও বিভিন্ন দিক থেকে ঐ হাদীসের উপর কাজ করতে আরম্ভ করেন। কেউ ঐ হাদীসের সনদ যাচাই করেন যে, এর সনদ সহীহ কি না। কেউ বর্ণনাকারীদের পরখ করতে থাকেন। কেউ ঐ হাদীস দ্বারা যেসব বিধান বের হয় তা বের করতে থাকেন এবং দিকনির্দেশনা চিহ্নিত করতে থাকেন। এ মর্মে ফুকাহায়ে-কেরামের কাজ এই যে, কোনো হাদীস যখন তাদের সামনে আসে, তখন তারা ঐ হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিধান বের করতে থাকেন।

'বুলবুলির হাদীস' দ্বারা একশ' দশটি মাসআলা উদ্ভাবন

মনে পড়লো, শামায়েলে তিরমিযীর মধ্যে হাদীস আছে যে, হযরত আনাস রাযি.-এর একটি ছোট ভাই ছিলো, তিনি ছিলেন শিশু। তিনি একটি বুলবুলি পাখি পুষে ছিলেন। পাখিটি মরে যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,

يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

'হে আবু ওমাইর! তুমি যে বুলবুলি পাখি পুষে ছিলে, তার কী হয়েছে?'[১]

শুধু এই একটি হাদীস থেকে ফুকাহায়ে কেরাম একশ' দশটি ফিকহী মাসআলা বের করেছেন। একজন মুহাদ্দিস এই একটি হাদীসের ব্যাখ্যা এবং তা থেকে বের হওয়া বিধানসমূহের উপর স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

সালামের উত্তরের জন্যে তায়াম্মুম করা জায়েয

যাই হোক, ঐ সাহাবীর সালামের উত্তরের জন্যে তিনি প্রথমে তায়াম্মুম করেন তারপর সালামের উত্তর দেন। এ হাদীস দ্বারাও ফুকাহায়ে কেরাম অনেকগুলি মাসআলা বের করেছেন। এ হাদীস দ্বারা ফুকাহায়ে কেরাম একটি মাসআলা এই বের করেছেন যে, যে কাজের জন্যে ওযু করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব, তার জন্যে ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েয। যেমন দু'আ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা ওযু করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেননি। বরং

---

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৬৪, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩১৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭১০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২৬৭

তিনি তাঁর দরজার কড়া নাড়াকে এবং দু'আ করাকে সহজ করে দিয়েছেন যে, এর জন্যে ওযু শর্ত করেননি। এমনকি পাক থাকারও শর্ত আরোপ করেননি। এ জন্যে কোনো ব্যক্তির গোসল ফরয হয়ে থাকলে সে ঐ অবস্থাতেও দু'আ করতে পারে। কিন্তু দু'আ করার সময় ওযু থাকা মুস্তাহাব এবং উত্তম। যদি ওযুর সুযোগ না থাকে তাহলে তায়াম্মুম করবে। কারণ, তায়াম্মুম করে দু'আ করা ওযু ছাড়া দু'আ করা থেকে উত্তম। যদিও ঐ তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া এবং এমন কোনো কাজ করা জায়েয হবে না, যার জন্যে ওযু করা ওয়াজিব। কিন্তু ঐ তায়াম্মুম দ্বারা দু'আ করতে পারবে।

যিকিরের জন্যে তায়াম্মুম করা

যেমন, কোনো ব্যক্তি যিকির করতে চায় বা তাসবীহ পাঠ করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাম নেওয়াকে এতো সহজ করে দিয়েছেন যে, এর জন্যে ওযু থাকার শর্ত নেই। তবে ওযুসহ যিকির করা মুস্তাহাব। এ কারণে যদি ওযু করার সুযোগ না থাকে আর যিকির করতে চায়, তাহলে কমপক্ষে তায়াম্মুম করে যিকির করবে। কারণ, তায়াম্মুম করে যিকির করা ওযু ছাড়া যিকির করা থেকে উত্তম। তবে এই তায়াম্মুম দ্বারা কোনো প্রকার নামায পড়া জায়েয হবে না।

অন্যের দেয়ালে তায়াম্মুম করা

ফুকাহায়ে কেরাম এ হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় মাসআলা এই বের করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই দেয়ালে তায়াম্মুম করেছেন তা ছিলো অন্য মানুষের ঘরের দেয়াল। এখন প্রশ্ন জাগে যে, তিনি অন্য মানুষের ঘরের দেয়াল তার অনুমতি ছাড়া তায়াম্মুমের জন্যে কি করে ব্যবহার করলেন? কারণ, অন্যের জিনিস তার অনুমতি এবং আন্তরিক সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করা জায়েয নেই। ফুকাহায়ে কেরাম এই প্রশ্ন উঠিয়েছেন এবং তাও উঠিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যে, তিনি ঐ দেয়াল কি করে ব্যবহার করলেন?

তারপর ফুকাহায়ে কেরাম এর উত্তরও দিয়েছেন যে, আসল বিষয় ছিলো এই যে, এটা শত ভাগ নিশ্চিত যে, বাড়ির দেয়ালের বাইরের অংশে তায়াম্মুম করতে কেউই তাঁকে নিষেধ করবে না। তাই তাঁর জন্যে ঐ দেয়ালে তায়াম্মুম করা জায়েয ছিলো। এ কারণে যেখানে এ বিষয় শত ভাগ নিশ্চিত হয় যে,

মানুষ এটা ব্যবহার করার শুধু অনুমতিই দিবে না বরং তাতে খুশি হবে, এমতাবস্থায় ঐ জিনিস ব্যবহার করা জায়েয। এবার আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে, ফুকাহায়ে কেরাম কতো সূক্ষ্ম বিষয় উদঘাটন করেছেন!

কোনো সম্প্রদায়ের ভাগাড় ব্যবহার করা

ফুকাহায়ে কেরাম এই একই প্রশ্ন অন্য একটি হাদীসের উপরেও উঠিয়েছেন। সেই হাদীস শরীফটি এই যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে তাঁর পেশাব করার প্রয়োজন হয়। এক জায়গায় এক সম্প্রদায়ের ভাগাড় ছিলো। সেখানে মানুষ তাদের ময়লা-আবর্জনা ফেলতো। ঐ ভাগাড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করেন। হাদীসের শব্দ এই-

أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ

'এক সম্প্রদায়ের ময়লা ফেলার জায়গায় তিনি এলেন।'[1]

ফুকাহায়ে কেরাম এই হাদীসের উপর প্রশ্ন উঠিয়েছেন যে, ঐ ভাগাড় কোনো সম্প্রদায়ের মালিকানাভুক্ত ছিলো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুমতি ছাড়া তা কীভাবে ব্যবহার করলেন?

তারপর ফুকাহায়ে কেরাম নিজেরাই এর উত্তর দিয়েছেন যে, মূলত তা সবার ব্যবহারের জায়গা ছিলো। এ উদ্দেশ্যেই ঐ জায়গা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিলো। এ কারণে কোনো ব্যক্তির মালিকানায় হস্তক্ষেপ করার প্রশ্নই ওঠে না।

মেজবানের ঘরের জিনিস ব্যবহার করা

এ হাদীস দ্বারা আপনারা অনুমান করুন যে, শরীয়ত অন্যের জিনিস ব্যবহার করার বিষয়ে কি পরিমাণ অনুভূতিপরায়ণ! উদাহরণস্বরূপ, আমরা কারও বাড়ির মেহমান হয়ে গেলাম। এখন যদি তার ঘরের কোনো জিনিস ব্যবহার করতে হয় তাহলে ব্যবহারের পূর্বে একটু চিন্তা করে দেখুন যে, আমার জন্যে এটা ব্যবহার করা জায়েয কি না এবং চিন্তা করে দেখুন যে,

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০২, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১২, সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ১৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩০১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২১৫৭

আমি এটা ব্যবহার করলে মেজবান খুশি হবে, নাকি তার অন্তরে সঙ্কোচন সৃষ্টি হবে। যদি তার অন্তরে সঙ্কোচন সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে সামান্য আশঙ্কাও দেখা দেয়, সেমতাবস্থায় ঐ জিনিস ব্যবহার করা আপনার জন্যে জায়েয নেই।

আমাদের সমাজে এ বিষয়ে খুবই অসতর্কতা পাওয়া যায়। বন্ধুর বাড়িতে যায়, আর চিন্তা করে যে, এতো আমার অকৃত্রিম বন্ধু। এখন বন্ধুত্বের অজুহাতে তাকে লুট করতে আরম্ভ করে। তার জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। এটা জায়েয নেই। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, ঠাট্টা করেও অন্যের জিনিস নিয়ে ব্যবহার করা জায়েয নেই। তাহলে বাস্তবে কি করে তা জায়েয হতে পারে? এজন্যে আমাদের জরিপ চালিয়ে দেখা উচিত যে, অকৃত্রিমতার সুবাদে আমরা কোথায় কোথায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে চলছি।

সন্তানের ঘরে প্রবেশ করার জন্যে অনুমতি

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর সারাজীবন আমরা এই নিয়ম দেখেছি যে, যখনই তিনি কোনো কাজের জন্যে তার সন্তানদের কামরায় প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নিতেন। অথচ ঐ কামরা আমাদের মালিকানাভুক্ত ছিলো না। তাঁরই মালিকানাধীন ছিলো। এতদসত্ত্বেও অনুমতি নিতেন। আর যদি কখনো হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর আমাদের ব্যবহারাধীন কোনো জিনিস ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিতো, তখন সবসময় অনুমতি চাইতেন যে, তোমার এ জিনিসটা আমি ব্যবহার করি? এবার আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে, একজন বাপ তার ছেলের কাছে জিজ্ঞাসা করছে যে, আমি তোমার জিনিস ব্যবহার করি? অথচ হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

'তুমি নিজে এবং তোমার সম্পদ সব তোমার বাবার।'[৮]

---

৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৮২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৬০৮

কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ পরিমাণ সতর্কতা ছিলো যে, সন্তানের কাছে জিজ্ঞাসা করে তার জিনিস ব্যবহার করছেন। নিজের সন্তানের জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি এ পরিমাণ সতর্ক থাকতে হয়, তাহলে যাদের সাথে এ ধরনের আত্মীয়তা নেই, তাদের জিনিস অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা কতো মারাত্মক ব্যাপার!

অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করা

এসব বিষয়কে আমরা আমাদের দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছি। আজকাল শুধু ইবাদত ও নামায-রোযার নাম দ্বীন মনে করেছি। এর বাইরে যেসব মুআমালা আছে সেগুলোকে আমরা দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছি। যেমন অন্য কারো বাড়িতে পূর্ব অবগতি ছাড়া খানা খাওয়ার সময় যাওয়া দ্বীনের খেলাফ। যেমন বর্তমানে হয়ে থাকে যে, পীর ছাহেব তার মুরীদান বাহিনী নিয়ে কোনো মুরীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পীর ছাহেব মনে করছেন যে, এতো আমার মুরীদ। তাই সর্বাবস্থায় আমার আদর-যত্ন তাকে করতেই হবে। এটা আমি চোখে দেখা ঘটনা বলছি। এখন মুরীদ বেচারা পেরেশান যে, উপস্থিত মুহূর্তে আমি কি ব্যবস্থা করবো? এতো বড়ো বাহিনী এসেছে, এর জন্যে কোত্থেকে আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবো? আপনারা লক্ষ করুন! নামাযও হচ্ছে, তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশ্‌ত, যিকির-আযকার সব ইবাদত হচ্ছে, পীর ছাহেব হয়ে বসে আছে। কিন্তু পূর্ব অবগতি ছাড়া মুরীদের বাড়িতে চলে গেলো। মনে রাখবেন! এটা এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ[১]

কিন্তু পীর ছাহেবের এ বিষয়ে কোনো পরোয়া নেই যে, এর ফলে মুরীদের কষ্ট হচ্ছে বা পেরেশানী হচ্ছে বা তার সম্পদ তার স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি ছাড়া ভোগ করা হচ্ছে। আজ আমাদের সমাজে এসব বিষয় মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। একে দ্বীনের অংশই মনে করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং প্রত্যেক জিনিসকে যথাস্থানে রাখার রুচি দান করুন, আমীন। যে জিনিসের যে অবস্থান, সে অনুপাতেই যেন তার উপর আমল হয়।

---

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০১২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৯৭৭৪

স্বতঃস্ফূর্ততা ছাড়া চাঁদা গ্রহণ করা

একইভাবে যে ভালো উদ্দেশ্যেই চাঁদা নেওয়া হোক না কেন, মাদরাসার জন্যে হোক, মসজিদের জন্যে হোক, জিহাদের জন্যে হোক বা তাবলীগের জন্যে- চাঁদা গ্রহণের সময় যদি কোনো ক্ষেত্রে সামান্য চাপও হয় তাহলে ঐ চাঁদা হারাম। এ বিষয়ে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব রহ.-এর স্বতন্ত্র পুস্তক রয়েছে। তাতে তিনি বলেন যে, আজকাল চাঁদার যে পদ্ধতি রয়েছে- বড়ো বড়ো ব্যক্তিরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের চাপ সৃষ্টি করে চাঁদা উসূল করে থাকে। কারণ, মাদরাসার সাধারণ কোনো দূতকে চাঁদার জন্যে পাঠানো হলে চাঁদা কম উসূল হবে। এজন্যে কোনো বড়ো ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে চাঁদার জন্যে পাঠানো হয়। যার ফল এই হয় যে, ঐ প্রভাবশালী ব্যক্তি কারো কাছে চাঁদার জন্যে গেলে সে চিন্তা করে যে, এতো বড়ো মানুষ আমার কাছে এসেছে এখন অল্প পয়সা কীভাবে দেই? সুতরাং সে বেশি পয়সা দেয়। হযরত থানভী রহ.বলেন, এটা মূলত ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা। আর ব্যক্তির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে যে চাঁদা উসূল করা হয়, তা স্বতঃস্ফূর্ত মনে দেওয়া হয় না। আর যা স্বতঃস্ফূর্ত মনে দেওয়া হয় না, তা হারাম এবং তা নিম্নোক্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ[১০]

সাধারণ সমাবেশে চাঁদা উসূল করা

একইভাবে সাধারণ সমাবেশে চাঁদার ঘোষণা দিয়ে সেখানেই চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এবার যে সামর্থ্যবান ব্যক্তি ঐ সমাবেশে বসা আছে, সে চিন্তা করে যে, সবাই তো চাঁদা দিচ্ছে, আমি যদি না দেই তাহলে আমার নাক কাটা যাবে। আর যদি অল্প চাঁদা দেই তাহলেও অসম্মান হবে। এজন্যে আমার বেশি চাঁদা দেওয়া উচিত। এখন এই চাপে পড়ে সে বেশি চাঁদা দিলো।

মনে রাখবেন! এই চাপে পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা ছাড়া যেই চাঁদা সে দিলো, তা لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ[১১] হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

১০. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০১২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৯৭৭৪
১১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩০১২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৯৭৭৪

এ কারণেই হযরত থানভী রহ.-এর মুরীদদের ব্যাপারে তাঁর সাধারণ নিয়ম এই ছিলো যে, তাদের জন্যে সাধারণ সমাবেশে চাঁদা সংগ্রহের অনুমতি ছিলো না। কারণ, এতে মানুষ লজ্জায় বা ভদ্রতার কারণে চাঁদা দিয়ে থাকে, যা জায়েয ও হালাল নয়।

তাবুক যুদ্ধের ঘটনা দ্বারা প্রশ্ন ও তার উত্তর

হযরত থানভী রহ.-এর এ কথাটি আমি একবার বয়ানের মধ্যে বলি। তখন এক ব্যক্তি বলে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাবুক যুদ্ধের সময় সমাবেশের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন। তাবুক যুদ্ধের প্রয়োজন যখন দেখা দেয়, তখন তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে, এ সময় জিহাদের জন্যে রসদপত্রের তীব্র প্রয়োজন, যে ব্যক্তি এতে ব্যয় করবে সে এই সওয়াব পাবে। সুতরাং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এ ঘোষণা শুনে বাড়ির সব সম্পদ নিয়ে আসেন। এর দ্বারা জানা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মজমার মধ্যে চাঁদার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এর উত্তর এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেননি যে, এখনই এবং এ জায়গাতেই চাঁদা দাও। বরং তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এই পরিমাণ প্রয়োজন। প্রত্যেকে যার যার সুবিধা মতো যখন যে পরিমাণ ইচ্ছা চাঁদা দিবে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তীতে বিভিন্ন জিনিস এনে জমা দেন। এ ঘোষণা ছিলো না যে, এখন এবং এখানেই জমা করো।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাকে আমাদের অবস্থার সাথে কি করে তুলনা করতে পারি? আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের অন্তরকে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে কেউই এমন ছিলেন না যে, শুধু মানুষকে দেখানোর জন্যে চাঁদা দিবে। আল্লাহর জন্যে চাঁদা দেওয়ার থাকলে দিতেন, না দেওয়ার থাকলে না দিতেন। আমাদের সমাজের মানুষ চাপের মুখে পড়ে চক্ষুলজ্জার কারণে দিতে বাধ্য হয়। এজন্যে বর্তমানের অবস্থাকে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থার সাথে তুলনা করা যায় না। এজন্যে হযরত থানভী রহ. বলেন যে, সাধারণ মজমায় প্রচলিত নিয়মে চাঁদা সংগ্রহ করা জায়েয নয়। কারণ, এমন চাঁদার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত মনে দেওয়া পাওয়া যায় না।

চাঁদা সংগ্রহের সঠিক পদ্ধতি

চাঁদা সংগ্রহের সঠিক পদ্ধতি এই যে, আপনি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন যে, এটি একটি প্রয়োজন এবং দ্বীনের সঠিক খাত। এখানে দান করলে সওয়াব হবে। এজন্যে যার যখন ইচ্ছা এ প্রয়োজন পূরণের জন্যে এবং সওয়াব অর্জনের জন্যে চাঁদা দিবেন। এসমস্ত বিধান এ হাদীস থেকেই বের হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি অন্যের সম্পদ ও অন্যের সামানা বাস্তবেও নিবে না এবং ঠাট্টা করেও নিবে না।

ধার নেওয়া জিনিস তাড়াতাড়ি ফেরত না দেওয়া

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও ইরশাদ করেছেন,

وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ

তুমি যদি কোনো সময় অন্যের লাঠিও নিয়ে থাকো তাহলে তা ফিরিয়ে দাও।[১২] অর্থাৎ, তুমি যদি কোনো জিনিস ব্যবহারের জন্যে ধার নিয়ে থাকো এবং সে খুশি মনে তোমাকে দিয়ে থাকে, খুশি মনে দিয়ে তো সে কোনো অপরাধ করেনি, এজন্যে প্রয়োজন পুরা হলে জিনিসটি তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দাও। এ ব্যাপারেও আমাদের অনেক ত্রুটি ও গাফলতি হয়ে থাকে। একটি জিনিস প্রয়োজনে কারো থেকে নিয়েছিলো, এখন তা বাড়িতে পড়ে আছে। ফিরিয়ে দেওয়ার চিন্তা নেই। আরে ভাই! তোমার প্রয়োজন যখন পুরা হয়ে গিয়েছে, এবার তা ফিরিয়ে দাও। হতে পারে, যার জিনিস তার ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে লজ্জা বোধ করছে যে, তার কাছে কীভাবে চাইবো। এখন তুমি ব্যবহার করলে তার খুশি মনের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করছো। এজন্যে এভাবে ব্যবহার করা তোমার জন্যে হারাম।

কিতাব নিয়ে ফিরিয়ে না দেওয়া

এমনিভাবে আমাদের সমাজে মাসআলা বানিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, কিতাব চুরি করা চুরির অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, অন্য কারো থেকে পড়ার জন্যে কিতাব নিলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিতাব পড়ার পর ঘরে

---

১২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২০৮৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৫০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭২৬১

আছে, কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়ার চিন্তা নেই। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু লাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে, তুমি যদি অন্যের কোনো জিনিস য়ে থাকো তাহলে তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়ার চিন্তা করো। দ্রুত মালিকের তে পৌঁছিয়ে দাও।

ল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ল্লামের এসব বাণীর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অন্যের জন্যে পছন্দের মাপকাঠি*

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ

شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ

نَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ

رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ[১]

কয়েকদিন ধরে একটি হাদীসের উপর বয়ান চলছে। তার মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয়ে নসীহত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-কে তিনি তাকিদ করেছেন যে, তিনি নিজে এ বিষয়গুলো বুঝবেন, আমল করবেন এবং অন্যদের পর্যন্ত তা পৌঁছিয়ে দিবেন। তার মধ্যে তিনটি নসীহতের আলোচনা বিগত দিনগুলোতে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

তুমি নিজের জন্যে যা পছন্দ করো

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ নসীহত এই করেছেন,

وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ

'অন্যের জন্যে তাই পছন্দ করো, যা তুমি নিজের জন্যে পছন্দ করো।'

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৬, পৃঃ ১৬৭-১৮২, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২০৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭৭৪৮

এসব নসীহতের মধ্যে প্রত্যেকটি এমন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বব্যাপী যে, কোনো মানুষ যদি এর উপর আমল করার তাওফীক লাভ করে তাহলে তার সারাজীবন গড়ে উঠবে। এ নসীহতটিও তার একটি যে, অন্যের জন্যে তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্যে পছন্দ করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে এমন একটি মাপকাঠি দান করেছেন যে, সামাজিকতার যতো ইসলামী বিধান রয়েছে, তার সবগুলো এই একটি বাক্যের মধ্যে চলে আসে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যেই দ্বীন আমাদেরকে দান করেছেন তা আকীদা ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাকের সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। দ্বীনের বড়ো একটি অধ্যায় হলো মুআশারাত। অর্থাৎ, পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ ও বসবাসের মধ্যে কী কী আদব থাকা উচিত, একে অপরের সঙ্গে কীভাবে জীবন কাটাবে- এগুলো মুআশারাতের অধ্যায়। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তার মুজাদ্দিদসুলভ তা'লীমের মধ্যে বিশেষভাবে মুআশারাতকে অনেক বেশি গুরুত্বের সঙ্গে মানুষের মন-মগজে বসানোর চেষ্টা করেছেন।

ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার ঘৃণা সৃষ্টি হয়

হযরত থানভী রহ. এ পর্যন্ত বলেছেন যে, আমার কোনো মুরীদের সম্পর্কে যদি জানতে পারি যে, সে যিকির, তাসবীহ বা নফল আমলের মধ্যে ত্রুটি করেছে, তাহলে অবশ্যই তার ফলে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু কারো সম্পর্কে যদি জানতে পারি যে, সে মুআশারাতের বিধানের ক্ষেত্রে কোনো বিধান অমান্য করেছে, তাহলে তার প্রতি আমার ঘৃণা সৃষ্টি হয়। কারণ, মুআশারাতের বিধানের সম্পর্ক বান্দার হকের সঙ্গে। বান্দার হকের মাসআলা এই যে, কেউ যদি এ ব্যাপারে ত্রুটি করে তাহলে হকদার মাফ না করা পর্যন্ত তা মাফ হবে না। এজন্যে মুআশারাতের বিধান অমান্য করা মারাত্মক ব্যাপার।

আমার দ্বারা যেন কেউ কষ্ট না পায়

যাই হোক, মুআশারাত ইসলামী বিধানের বড়ো একটি অধ্যায়। হযরত থানভী রহ. 'আদাবুল মুআশারাত' নামে পরিপূর্ণ একটি পুস্তিকা লিখেছেন। যেসব লোক তারবিয়াতের উদ্দেশ্যে হযরত থানভী রহ.-এর নিকট থানাভবন

রেছেন, তাদের জন্যে মুআশারাতের বিধান মেনে চলার ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করা হতো। এজন্যে তিনি বলতেন যে, কারো যদি 'সূফী' হওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে অন্য কোথাও চলে যাক। ('সূফী' দ্বারা উদ্দেশ্য- সাধারণ পরিভাষায় যাকে 'সূফী' বলে)। আর যদি কারো মানুষ হতে হয়, তাহলে সে যেন এখানে চলে আসে। কারণ, সেখানে এ বিষয় দেখা হতো যে, তার উঠা-বসার আঙ্গিকের মধ্যে এবং তার দেখা-সাক্ষাতের কর্মপদ্ধতির মধ্যে ইসলামের বিধান চোখে পড়ে, নাকি তার বিরুদ্ধাচরণ করে। মোটকথা, মুআশারাত দ্বীনের বিধানের বিরাট একটি অধ্যায়। মুআশারাতের সমস্ত বিধানের সার-নির্যাস হলো- اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَ يَدِهٖ হাদীস। অর্থাৎ, তোমার দ্বারা অন্য কোনো মুসলমান যেন কোনো প্রকারের কষ্ট না পায়। দৈহিক, আত্মিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক কোনো প্রকার কষ্ট যেন না পায়। সে হলো মুসলমান, যার ব্যক্তিসত্তা কোনোভাবেই অন্যের জন্যে কষ্টের কারণ হয় না। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মুআশারাতের যাবতীয় বিধান এই হাদীসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় যে, মানুষ এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবে, তমার দ্বারা কেউ যেন কষ্ট না পায়।

প্রত্যেক বিষয়কেই মাপকাঠিতে ওজন করো

মানুষ প্রত্যেক কাজেই লক্ষ রাখবে যে, আমার এ কাজ দ্বারা অন্য কেউ কষ্ট পাচ্ছে না তো। এ বিষয়টি লক্ষ রাখলে মুআশারাতের যাবতীয় বিধান এবং বান্দার সব হক আদায় করা হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কীভাবে বোঝা যাবে যে, আমার দ্বারা অন্যে কষ্ট পাচ্ছে কি না, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ হাদীস তার মাপকাঠি। অর্থাৎ, অন্যের জন্যে তাই পছন্দ করো যা নিজের জন্যে পছন্দ করো। প্রত্যেক বিষয়কে এ মাপকাঠিতে ওজন করে দেখো, তাহলে অন্যে কষ্ট পাচ্ছে কি না, জানতে পারবে? যদি অন্যে কষ্ট পায়, তাহলে তা ত্যাগ করো।

খাওয়ার পরে পান খাওয়া

হযরত থানভী রহ. বলতেন যে, আমাদের এখানে তো এ জাতীয় তাসাওউফ রয়েছে। যদি মুরাকাবা-মুজাহাদার তাসাওউফ চাও তাহলে অন্যত্র চলে যাও। আমাদের এখানে তো এ তারবিয়াতই দেওয়া হয় যে, এক মানুষ যেন অন্য মানুষের জন্যে কষ্টের কারণ না হয়।

আমি এ ঘটনা আপনাদেরকে এর আগেও শুনিয়েছি যে, আমার ভাই জনাব মুহাম্মাদ যাকী কাইফী মরহুম- আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি

করুন, আমীন- তিনি শিশু বয়সে হযরত ওয়ালেদ ছাহেবের সঙ্গে হযরত থানভী রহ.-এর খেদমতে যাতায়াত করতেন। হযরত শিশুদেরকে খুব আদর করতেন। কারণ, এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. প্রতি বছর রমাযান মাস থানা ভবনে পরিবার-পরিজন নিয়ে কাটাতেন। শিশুদের ব্যাপারে কোনো নিয়ম-কানুন ছিলো না। বড়ো বড়ো মানুষ খানকার মধ্যে অবস্থানকালে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতেন যে, কোনো কাজ যেন হযরতের মেজাজের খেলাফ না হয়। কিন্তু শিশুরা স্বাধীনভাবে হযরতের নিকট চলে যেতো। হযরতের নিয়ম এই ছিলো যে, খানা খাওয়ার পর চুন, সুপারি ও খর ছাড়া পান পাতা চাবাতেন। কারণ, পান হজমের কাজ দেয়। এতে কোনো ক্ষতি নেই। আমার বড়ো ভাই জনাব যাকী কাইফী মরহুমের উপর খানা খাওয়ার পর ঘর থেকে পান আনার দায়িত্ব ছিলো। এ কারণে হযরত তার নাম দিয়েছিলেন 'পানী'।

পাঠকের যেন কষ্ট না হয়

ভাই ছাহেব মরহুম যখন লিখতে শিখলেন, তখন হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বললেন যে, তুমি প্রথম চিঠি হযরত থানভী রহ.-কে লিখো। ওয়ালেদ ছাহেব তার দ্বারা চিঠি লিখিয়ে হযরতের খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত থানভী রহ. তার উত্তরে ইলমের একটি অধ্যায় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। উত্তরে হযরত বলেন,

'তোমার চিঠি পেলাম। মন খুব আনন্দিত হলো যে, তুমি লিখতে শিখেছো। এখন তুমি নিজের লেখাকে আরো ভালো করার চেষ্টা করো। আর নিয়ত এই করো যে, পাঠকের যেন কষ্ট না হয়। দেখো! আমি তোমাকে এখন থেকেই সূফী বানাচ্ছি।'

যেই শিশু মাত্র লেখা শিখছে, বলাবাহুল্য যে, সে আঁকা-বাঁকা লিখবে। সে সময় শিশুটিকে বলা হচ্ছে যে, হাতের লেখা ঠিক করো, যাতে পাঠকের কষ্ট না হয়। সাথে এ কথাও বলছেন যে, দেখো! আমি এখন থেকেই তোমাকে সূফী বানাচ্ছি! কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, হাতের লেখা ঠিক হওয়ার সঙ্গে সূফীর কী সম্পর্ক? কারণ, আমাদের মাথায় বদ্ধমূল যে, যে ব্যক্তি যতো বেশি এলোমেলো, সে ততো বড়ো সূফী! যে যতো বেশি ময়লা ও অপরিষ্কার, সে ততো বড়ো সূফী! যার কোনো কাজেরই শৃঙ্খলা নেই, সে হলো বড়ো সূফী!

মাখলুকের খেদমত করা ছাড়া তাসাওউফ লাভ হয় না

এই উত্তরের মাধ্যমে হযরত থানভী রহ. এ কথা বলে দিয়েছেন যে, মূলত সূফী সে-ই, যে প্রত্যেক কাজে আল্লাহকে খুশি করার নিয়ত করে। আর আল্লাহকে খুশি করার পদ্ধতি এই যে, আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচাবে। তাদেরকে আরাম পৌঁছাবে। এজন্যে হযরত থানভী রহ. বলেন যে, দেখো! আমি তোমাকে এখন থেকেই সূফী বানাচ্ছি।

আজকাল মানুষ খানকার মধ্যে অবস্থান, সাধনা, মুজাহাদা, মুরাকাবা, কাশ্‌ফ ও কারামতের নাম দিয়েছে তাসাওউফ। কিন্তু হযরত থানভী রহ. এ হাকীকত খুলে দিয়েছেন যে, এর নাম তাসাওউফ নয়।

ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست

طریقت بجز خدمت خلق نیست

অর্থাৎ, শুধু তাসবীহ পাঠ করা, জায়নামাযের উপর বসে থাকা আর মোটা কাপড় পরিধান করার নাম তাসাওউফ নয়। বরং মানুষের খেদমত করা ছাড়া তাসাওউফ লাভ হতে পারে না। যাই হোক, আসল কথা এই যে, আমার দ্বারা অন্য কেউ যেন সামান্যও কষ্ট না পায়।

আমার সাথে যদি এমন আচরণ হতো, তাহলে?

এর মাপকাঠি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলেছেন যে, যখনই কারো সঙ্গে আচরণ করবে, তখনই তাকে নিজের জায়গায় এবং নিজেকে তার জায়গায় খাড়া করবে এবং দেখবে যে, আমার সঙ্গে যদি এমন আচরণ করা হতো তাহলে আমার কেমন অবস্থা হতো। আমি এতে খুশি হতাম, না বেজার হতাম। এর দ্বারা আমি আরাম পেতাম, না কষ্ট পেতাম। এ কথা চিন্তা করো। এ আচরণ দ্বারা যদি তোমার কষ্ট হতো তাহলে তুমি অন্যের সঙ্গে এমন আচরণ কোরো না। আমরা যে দুই রকমের মাপ বানিয়ে নিয়েছি, নিজেদের জন্যে এক রকম আর অন্যদের জন্যে অন্য রকম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীস দ্বারা সে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। মাপ এক রকম হওয়া উচিত। নিজের জন্যে যেই মাপ, অন্যের জন্যেও একই মাপ।

দায়িত্বের পরোয়া নেই, অধিকার আদায়ের চিন্তা আগে

এক ব্যক্তি কোথাও চাকুরী করে বা শ্রমিকের কাজ করে। তার এ হাদীস তো খুব মনে আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করো। এ হাদীস তো খুব স্মরণ আছে, কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা নেই যে, ঘাম আদৌও বের হলো কি না। যেই কাজের জন্যে তাকে চাকর রেখেছে, তা সে সঠিকভাবে সম্পাদন করেছে কিনা- এ বিষয়ে কোনো চিন্তা-ফিকির নেই। আজকাল বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দুনিয়ায় এ ধরনের সংগঠন রয়েছে। যেমন, শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ সংগঠন, চাকুরীজীবিদের অধিকার সংগঠন, নারী-অধিকার সংগঠন ইত্যাদি। এর ফল এই হয়েছে যে, প্রত্যেকে নিজের অধিকার আদায়ের দাবি করছে যে, আমার অধিকার আমাকে পেতে হবে, কিন্তু আমার দায়িত্বে অন্যের যে হক আছে, তার প্রতি কোনো লক্ষ নেই। শ্রমিক বলছে যে, আমার পুরো পারিশ্রমিক পেতে হবে, কিন্তু আমার দায়িত্বে যে আট ঘন্টা ডিউটি রয়েছে, তার পুরা সময় শ্রমের পিছনে দিচ্ছি, নাকি সেখানে ফাঁকি দিচ্ছি- এদিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ নেই। অফিসে বিলম্বে যাচ্ছে। বিলম্বে গিয়েও নিজের দায়িত্ব পালন করছে না। অফিস টাইমে নিজের ব্যক্তিগত কাজ করছে। এসব কেন হচ্ছে? এ কারণে যে, যা কিছু নিজের জন্যে পছন্দ করছে তা অন্যের জন্যে পছন্দ করছে না। নিজের জন্যে এক মাপকাঠি, আর অন্যের জন্যে অন্য মাপকাঠি। এখন যদি তাকে বলা হয় যে, যেহেতু তুমি পুরো সময় দাওনি, এজন্যে তোমার বেতন কাটা হবে, তাহলে এর বিরুদ্ধে লড়াই-ঝগড়া ও সভা-সমাবেশ শুরু হয়ে যাবে যে, কর্মচারীদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে।

চাকুরীর ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি

এসব এজন্যে হচ্ছে যে, নিজের জন্যে এক মাপকাঠি, আর অন্যের জন্যে ভিন্ন মাপকাঠি। নিজের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। শুধু নিজের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। এ শুধু সরকারি চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে নয়, বরং যেসব আলেম মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন, বা মাদরাসায় চাকুরীরত আছেন, তাদের মধ্য থেকে খুব কম মানুষের অন্তরে একথা জাগে যে, আমার এ বেতন হালাল হচ্ছে কি না? আমাদের দারুল উলূম করাচীতে নিয়ম রয়েছে যে, সমস্ত ওস্তাদ ও কর্মচারী তাদের আগমন ও বর্হিগমনের

সময় লিখে রাখেন। শ্রেণিকক্ষে যেতে বেশি বিলম্ব হলে তার বেতন আপনাআপনি কাটা যায়।

থানা ভবনে হযরত থানভী রহ.-এর যে মাদরাসা ছিলো, যদিও সেখানে এরেনের ব্যবস্থা ছিলো না, কিন্তু ওস্তাদ নিজে মাসের শেষে একটি আবেদনপত্র লিখতেন যে, এ মাসে আমার এ পরিমাণ দেরি হয়েছে বা আমার এতো দিন অনুপস্থিতি হয়েছে, এজন্যে আমার বেতন থেকে এ পরিমাণ কেটে নেওয়া হোক। আজ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অধিকার আদায়ের শ্লোগান দিচ্ছে, কিন্তু কারো একথা চিন্তা হয় না যে, আমার দায়িত্ব আদায়ে কতোটুকু ত্রুটি করলাম।

বেতন কমানোর আবেদন

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব রহ.- আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন- দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম তালিবে ইলম ছিলেন। তারপর তিনি সেখানকার ওস্তাদ হন এবং পরবর্তীতে শাইখুল হাদীস হন। বুখারী শরীফ পড়াতে পড়াতে দীর্ঘ সময় অতিক্রম করলে মজলিসে শূরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হযরতের বেতন বাড়ানো উচিত। কারণ, তিনি দীর্ঘ দিন ধরে পড়াচ্ছেন। সে সময় তার বেতন ছিলো মাসিক দশ টাকা। এজন্যে মাসিক বেতন করা হয় পনের টাকা। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বিষয়টি জানতে পেরে মজলিসে শূরা বরাবর যথানিয়মে একটি দরখাস্ত লিখলেন। তাতে তিনি লিখলেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, মজলিসে শূরা আমার বেতন বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু আমি এর কোনো বৈধতা দেখছি না। কারণ, পূর্বে আমার শারীরিক শক্তি বেশি ছিলো, সময়ও দিতাম বেশি। এখন তো আমার শক্তিও কমে গিয়েছে এবং সময়ও বেশি দিতে পারি না। এজন্যে আমার বেতন না বাড়িয়ে কমানো হোক।'

আপনারা তো বেতন বাড়ানোর দরখাস্ত করতে দেখেছেন, কিন্তু সেখানে বেতন কমানোর জন্যে দরখাস্ত করা হচ্ছিলো।

দুই রকমের মাপ বানিয়ে রেখেছি

যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে, আল্লাহর সামনে জবাব দেওয়ার চিন্তা থাকে, যারা একথা জানে যে, অধিকার আদায়ের পূর্বে দায়িত্ব পরিশোধের চিন্তা করা উচিত, তাদের চিন্তা-চেতনা এমনই হয়ে থাকে। আজ সারা

দুনিয়ায় এজন্যে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ হচ্ছে যে, আমি দুই ধরনের মাপ বানিয়ে রেখেছি। আমি যদি অন্যকে কর্মচারী বানিয়ে রাখি, তখন যে কোনোভাবে তার চামড়া তুলে নিতে চাই। তার পারিশ্রমিক কম দিতে চাই। আর যদি নিজে কর্মচারী হই, তখন অধিক থেকে অধিক পারিশ্রমিক পেতে চাই, অথচ কাজ করতে চাই সবচেয়ে কম। একারণে এসব ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর উপর আমল করা হয় যে, তুমি যদি কর্মচারী হও তাহলে একথা চিন্তা করো যে, অন্যে যদি আমার কর্মচারী হতো তাহলে আমি তার থেকে কি চাইতাম? আর যদি তুমি অন্য কাউকে কর্মচারী বানিয়ে থাকো তাহলে চিন্তা করো যে, আমি কর্মচারী হলে মালিকের কাছে কী চাইতাম, তা পরিশোধ করো।

পারস্পরিক সম্পর্ক

এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। সেখানেও দুই ধরনের মাপেরই অধিক দখল রয়েছে। সেখানও এই হাদীসের উপর আমল করা জরুরী যে, তাদের জন্যেও তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্যে পছন্দ করো। তুমি যদি স্বামী হয়ে থাকো তাহলে লক্ষ করো যে, আমি স্ত্রীর নিকট থেকে কী ধরনের আচরণের আশা রাখি, তার কোন্ কাজ দ্বারা আমার কষ্ট হয় এবং তার কোন্ কাজ দ্বারা আমার আরাম হয়। তারপর তুমিও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করো, যা তাকে আরাম দিবে, কষ্ট দিবে না। আর যদি তুমি স্ত্রী হয়ে থাকো, তাহলে দেখো যে, আমার স্বামীর কোন্ কাজ ও কোন্ আচরণ দ্বারা আমি কষ্ট পাই এবং কোন্ কাজ ও কোন্ আচরণ দ্বারা আরাম পাই। তারপর স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে এমন আচরণ করবে, যা তাকে আরাম পৌছাবে।

বৌ-শাশুড়ির ঝগড়ার কারণ

বৌ-শাশুড়ির ঝগড়া-বিবাদে আমাদের পুরো সমাজ ভরা। অসংখ্য পরিবার এই অশান্তির শিকার। এসব কেন হচ্ছে? কারণ, এই হাদীসের উপর আমল হচ্ছে না। যতোদিন পর্যন্ত শাশুড়ি সাহেবা বৌ ছিলেন, ততোদিন পর্যন্ত তিনি তার শাশুড়ির নিকট কেমন আচরণের প্রত্যাশা রাখতেন, আর এখন যখন নিজে শাশুড়ি হয়েছেন, তার বৌয়ের সঙ্গে কেমন আচরণ করছেন? এই দুই ধরনের মাপ বানিয়ে রেখেছেন। নিজের জন্যে এক মাপ, আর অন্যের জন্যে আরেক মাপ। যদি এক মাপ হতো তাহলে সব ঝগড়া শেষ হয়ে যেতো।

এ পদ্ধতিকে বিলুপ্ত করো

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

আক্ষেপ সে সব লোকের জন্যে, যারা নিজেদের অধিকার গ্রহণের সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে, কোনো কমতি রাখে না, আর যখন অন্যকে দেওয়ার সময় হয় তখন কম দেয়।[২]

যাই হোক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীস দ্বারা এমন মাপকাঠি বলে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডের জরিপ চালিয়ে দেখতে পারি যে, আমাদের দ্বারা কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে। যেখানে যেখানে ভুল হচ্ছে তা ঠিক করে নাও। তাহলে আল্লাহ তা'আলা এর এমন বরকত দান করবেন যে, আমাদের দ্বীন-দুনিয়া ঠিক হয়ে যাবে।

আমার মাখলুককে ভালোবাসো

আমার শাইখ হযরত আরেফী রহ. বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার সঙ্গে যদি তোমাদের ভালোবাসা থাকে তাহলে আমার মাখলুককে ভালোবাসো। তুমি আমাকে কি করে ভালোবাসবে? তুমি না আমাকে দেখেছো, না তোমার মধ্যে আমাকে দেখার শক্তি আছে। এজন্যে তুমি আমাকে কি করে মহব্বত করবে? আমাকে মহব্বত করার পদ্ধতি এই যে, আমার সৃষ্টিকে মহব্বত করো, আমার বান্দাদেরকে ভালোবাসো।

হযরতের কথার সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কারো অন্তরে তাঁর মহব্বত দান করেন, তখন আল্লাহর সব সৃষ্টির সঙ্গে তার মহব্বত হয়ে যায়। তার অন্তরে কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকে না। কারো প্রতি শত্রুতা থাকে না। কবি বলেন,

کفر است در طریقت ما کینہ داشتن

آئین ما ست سینہ چوں آئینہ داشتن

---

২ সূরা মুতাফফিফীন ঃ ১-৩

'তরিকতের মধ্যে কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখা কুফরী,
আমাদের আইন হলো, অন্তরকে আয়নার মতো স্বচ্ছ রাখা।'

এখানে না কারো বিরুদ্ধে ক্রোধ রয়েছে, না হিংসা রয়েছে, না বিদ্বেষ রয়েছে, না শত্রুতা রয়েছে। বরং সর্বাবস্থায় অন্যের কল্যাণকামনা রয়েছে।

এক সাহাবীর ঘটনা

আমাদের বুযুর্গদেরকে আমরা এমন পেয়েছি যে, তাদের সঙ্গে যতো মানুষের সম্পর্ক থাকতো প্রত্যেকে মনে করতো যে, ঐ বুযুর্গ আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এটা মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। প্রত্যেক সাহাবী মনে করতেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অধিক মহব্বত করেন। এমনকি তার মনে হতো যে, আমিই হুযূরের সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। হযরত আমর ইবনে আস রাযি. যিনি অনেক পরে মুসলমান হয়েছেন, তাঁর অন্তরে এই চিন্তা জাগলো যে, হয়তো আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে অধিক প্রিয়। এদিকে প্রথম সারির মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এবং হযরত ওমর ফারুক রাযি.। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ ও ভালোবাসা দেখে অন্তরে এই চিন্তা জেগেছে যে, আমিই হয়তো সর্বাধিক প্রিয়। এবার তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রতি আপনার বেশি মহব্বত, নাকি আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকরের প্রতি।

তখন রহস্য উন্মোচিত হলো যে, তাঁর তুলনায় আবু বকরের মহব্বত বেশি। এবার তাঁর অন্তরে চিন্তা জাগলো যে, আবু বকরের তো অনেক উঁচু ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতি তো তাঁর বেশি মহব্বত হবেই। এবার দ্বিতীয় নম্বরে আমি সর্বাধিক প্রিয়। তাই তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রতি আপনার বেশি মহব্বত, নাকি ওমর ফারুক রাযি.-এর প্রতি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমরের প্রতি।

তিনি বলেন, এবার আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করতে ভয় পেয়ে গেলাম যে, বেশি প্রশ্ন করে জানা তো নেই আমি কোন নম্বরে চলে যাই। মোটকথা, তাঁর অন্তরে এ চিন্তা এ জন্যে জেগেছে যে, প্রত্যেক সাহাবীর প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন আচরণ ছিলো যে, প্রত্যেকে মনে করতেন যে, তিনি আমাকে বেশি ভালোবাসেন।

হযরত আরেফী রহ.-এর প্রত্যেকের জন্যে দু'আ করা

আমরা আমাদের বুযুর্গদের মধ্যেও এ পদ্ধতি দেখেছি। হযরত ওয়ালেদ ছাহেবকে, হযরত আরেফী ছাহেবকে, হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ.-কে দেখেছি যে, যতো মুরীদ ছিলো প্রত্যেকে মনে করতো যে, আমার সঙ্গে হযরতের বেশি ভালোবাসা। এমনটি কেন ছিলো? একারণে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা নিজের মহব্বত অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, তখন নিজের মাখলুকেরও এমন মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন যে, প্রত্যেকের কল্যাণকামনা, প্রত্যেকের ভালোবাসা এবং প্রত্যেকের প্রতি তারা লক্ষ রাখতেন। হযরত আরেফী রহ.-এর অবস্থা এই ছিলো যে, যখনই কোনো ঘনিষ্ঠ লোকের সঙ্গে দেখা হতো, তখনই তিনি বলতেন, আরে ভাই! আমি তোমাদের জন্যে খুব দু'আ করি। প্রতিদিন দু'আ করি। এর দ্বারা যদি 'তাউরিয়া' উদ্দেশ্য হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে সব মুসলমানের জন্যে যখন দু'আ করা হয় তখন তোমরাও তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হযরতের উদ্দেশ্য এটা ছিলো না যে, সাধারণভাবে তোমাদের জন্যে দু'আ করি। বরং বাস্তবেই বিশেষভাবে নাম নিয়ে প্রত্যেকের জন্যে দু'আ করতেন। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, হযরত আপনি প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্যে কীভাবে দু'আ করেন?

হযরত বললেন, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে ভাগ করে নিয়েছি। উদাহরণস্বরূপ ফজরের নামাযের জন্যে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি যে, যারা আমার বড়ো- যেমন মা-বাবা, ওস্তাদ, পীর-মাশায়েখ- তাদের সকলের জন্যে ফজরের নামাযের পর দু'আ করবো। যোহরের নামাযের জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, নিজের সমকক্ষ বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠি যারা আছে তাদের জন্যে দু'আ করবো। আর আসরের নামাযের পর নিজের চেয়ে যারা ছোট আছে, মুরীদান আছে, তাদের জন্যে দু'আ করবো। মাগরিবের পরে নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্যে দু'আ করবো। এভাবে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে নিজের ঘনিষ্ঠ জন ও পরিবার-পরিজনের জন্যে ভাগ করে রেখেছি। এর ফলে নিজ নিজ সময়ে প্রত্যেকের জন্যে দু'আ হয়ে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ! এসব দু'আ কেন হচ্ছে? এ জন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহব্বতের বদৌলতে মাখলুকের মহব্বত অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের অন্তরেও এই মহব্বত দান করুন, আমীন।

মোটকথা, এটি ছিলো চতুর্থ নসীহত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্যের জন্যে তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্যে পছন্দ করো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই নসীহতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

পঞ্চম নসীহত

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চম নসীহত এই করেন,

لَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

'অনেক বেশি হেসো না, কারণ অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যুর কারণ হয়। এর ফলে মানুষের অন্তর মরে যায়।'[৩]

এখানে হাসি দ্বারা অট্টহাসি উদ্দেশ্য। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নাত এই যে, তিনি অট্টহাসি হাসতেন না। বেশির ভাগ সময় তিনি মুচকি হাসতেন। কতক বর্ণনায় এসেছে- কখনো কখনো হাসার সময় তাঁর মুখ খুলে যেতো, মাড়ি দেখা যেতো। কিন্তু অট্টহাসি কোথাও প্রমাণিত নেই। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সবসময় হাসবে, হাসাবে, আর ভাঁড় হয়ে যাবে- এটা পছন্দনীয় নয়। তবে সীমার মধ্যে থেকে হাসি-মজাও জায়েয। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মজা করেছেনও। এটা এই হাদীসের সারকথা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদেরকে এই পাঁচটি নসীহতের উপরে আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২০৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭৭৪৮

প্রতিবেশী*

আবু হামযা সুক্কারী রহ. ছিলেন হাদীসের একজন 'রাবী' (বর্ণনাকারী)। আরবী ভাষায় চিনিকে 'সুক্কার' বলা হয়। তাঁর জীবনীকারগণ লিখেছেন যে, তাঁকে 'সুক্কারী' বলার কারণ তাঁর কথাবার্তা, বাকভঙ্গী এবং ধরণ-ধারণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং সুমিষ্ট ছিলো। তিনি কথা বলার সময় শ্রোতাগণ বিমোহিত হয়ে পড়তো। তিনি বাগদাদ নগরীর একটি মহল্লায় বাস করতেন। কিছুদিন পর তিনি বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। বাড়ির ক্রেতার সঙ্গেও কথাবার্তা অনেকটা চূড়ান্ত হয়ে যায়। এমন সময় তাঁর প্রতিবেশী ও মহল্লার লোকেরা বিষয়টি জানতে পারে যে, তিনি এ মহল্লা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন। তখন মহল্লার লোকদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট আসে। তারা তাঁকে মহল্লা ছেড়ে চলে না যাওয়ার জন্যে কাকুতি-মিনতি করে অনুরোধ করে। আবু হামযা সুক্কারী তাঁর সমস্যার কথা তুলে ধরলে মহল্লার সকলে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পেশ করে যে, এ বাড়ি তৈরী করতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, আমরা সে পরিমাণ অর্থ আপনার খেদমতে হাদিয়াস্বরূপ দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনি আমাদেরকে আপনার প্রতিবেশী হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি মহল্লার লোকদের এমন আন্তরিকতাপূর্ণ ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করে মহল্লা ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা মুলতবি করেন।

আবু হামযা সুক্কারীর এই সর্বজনপ্রিয় হওয়ার একটি কারণ তাঁর যাদুকরী ব্যক্তিত্ব তো ছিলোই, তবে তার বড়ো কারণ ছিলো, তিনি প্রতিবেশীর হকের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পবিত্র কুরআন প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করার প্রতি বার বার তাকিদ করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনেক হাদীসে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এমনকি এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন যে, আমার নিকট হযরত জিবরাঈল আলাইহিস

---

* যিকির ও ফিকির, পৃঃ ২৫৫-২৫৯

সালাম আগমন করে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এতো অধিক পরিমাণে তাকিদ করতে থাকেন যে, আমার ধারণা হতে লাগলো যে, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে পৈত্রিক সম্পত্তিতেও উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করবেন।

কুরআন ও হাদীসের এ সমস্ত শিক্ষার ছত্র-ছায়ায় যেই সমাজ প্রবৃদ্ধি লাভ করেছিলো, সেখানে প্রতিবেশীর গুরুত্ব ও মর্যাদা একজন নিকটাত্মীয়ের চেয়ে কম ছিলো না। একই সঙ্গে বসবাসকারীরা পরস্পরের সুখ-দুঃখেরই শুধু শরীক ছিলেন না, বরং তারা পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করে ও কুরবানী করে আনন্দ লাভ করতেন।

১৯৬৩ ঈসায়ীতে আমি যখন সৌদি আরব যাই, তখন সেখানকার এক অধিবাসী নিজে আমাকে তার ঘটনা শুনিয়েছেন যে, 'একবার আমি কাপড় ক্রয় করার জন্যে বাজারে যাই। একটি দোকানে প্রবেশ করে অনেকগুলো কাপড় দেখি। দোকানদার অত্যন্ত ভদ্রজনোচিতভাবে আমাকে অনেকগুলো কাপড় দেখাতে থাকেন। অবশেষে আমি একটি কাপড় পছন্দ করি। দোকানদার আমাকে কাপড়ের মূল্য বলে দেয়। দোকানদারকে আমি বলি- এই কাপড়টি আমাকে এতো গজ কেটে দিন। আমার কথা শুনে দোকানদার এক মুহূর্তের জন্যে নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাপড় কি আপনার পছন্দ হয়েছে? আমি বললাম, জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন, দাম আপনার বুঝমতো হয়েছে কি? আমি বললাম, জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আপনি আমার এই সম্মুখের দোকানে যান এবং সেখান থেকে এই কাপড় একই মূল্যে ক্রয় করুন। তার কথা শুনে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম। আমি তাকে বললাম, আমি ঐ দোকানে কেন যাবো? আমি তো আপনার সাথে কারবার করেছি। তিনি বললেন, এ নিয়ে আপনার বির্তকে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার যে কাপড় প্রয়োজন, তা ঐ দোকানে আছে এবং এই মূল্যেই আপনি পেয়ে যাবেন। আপনি সেখান থেকে নিয়ে নিন। আমি বললাম, প্রথমে আপনি এর কারণ বলুন। ওটি কি আপনারই দোকান? তিনি বললেন, না। এবার আমিও আড়ি ধরলাম। আমি বললাম, যতোক্ষণ আপনি এর কারণ না বলবেন, আমি ঐ দোকানে যাবো না। অবশেষে তিনি নিরুপায় হয়ে বললেন, আপনি অনর্থক কথা বাড়াচ্ছেন। ব্যাপারটি মাত্র এই যে, আমার নিকট সকাল থেকে এ পর্যন্ত অনেক গ্রাহক এসেছে এবং এ পরিমাণ মাল বিক্রি হয়েছে যে, আজকের দিনের জন্যে তা আমার যথেষ্ট হবে। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম যে, আমার প্রতিবেশী দোকানদার সকাল থেকে খালি বসে আছে। তার নিকট কোনো গ্রাহক আসেনি। তাই আমি চাচ্ছি যে, তারও কিছু

বিক্রি হোক। আপনি সেখানে গেলে তার উপকার হবে, এতে আপনার তো কোনো ক্ষতি নেই?

এটি সেই ইসলামী সমাজের যৎসামান্য দীপ্তিমাত্র, যেখানে আনন্দ ও সফলতা শুধুমাত্র পয়সা গণনা করার নাম নয়, বরং আনন্দ ও সফলতা আত্মার সেই প্রশান্তি এবং হৃদয়ের সেই পরিতৃপ্তির নাম, যা নিজের কোনো ভাই বা বোনের দুঃখ দূর করে বা তার মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়ে লাভ হয়। পবিত্র কুরআন মদীনার আনসারদের প্রশংসা করে বলেছে যে, 'তারা দারিদ্র্যের শিকার হলেও অন্যদেরকে নিজেরদের উপর প্রাধান্য দেয়।' তাঁদের এই গুণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মুসলমানদেরকে তাদের অনুকরণ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করাই ছিলো পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য। নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার এ বিষয়টি সবার সঙ্গে প্রশংসনীয়, তবে বিশেষভাবে প্রতিবেশী এর অধিক হকদার। আর তাই কুরআন ও হাদীস এ ব্যাপারে অধিক উৎসাহ প্রদান করেছে।

আধুনিক শহুরে জীবন একদিকে যেখানে আমাদের বহুবিধ মূল্যবোধ বদলে ফেলেছে, অপরদিকে সেখানে প্রতিবেশীর গুরুত্বের বিষয়টিও বড়ো দুঃখজনকভাবে পরিবর্তন করে ফেলেছে। প্রথমত কুঠি ও বাংলোর অধিবাসীরা প্রতিবেশীর অর্থই বিস্মৃত হতে চলেছে। অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরে অপরিচিতই থেকে যায়। আর কোথাও প্রতিবেশীর গুরুত্বের বিষয়টি মনে থাকলেও তা সাধারণত ঐ সমস্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে নির্দিষ্ট করে ফেলা হয়েছে, যারা মর্যাদা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নিজেদের সমমানের বা কাছাকাছি। সুতরাং কুঠি-বাংলোয় বসবাসকারীগণ অন্য কোনো কুঠিতে বাসকারীকেই নিজের প্রতিবেশী বলে মনে করে থাকে। তার পাশেই ঝুপড়ি বা সাধারণ বাড়িতে বাসকারী লোক থাকলে তাদেরকে সাধারণত প্রতিবেশীও মনে করা হয় না এবং তাদেরকে প্রতিবেশীর হকও প্রদান করা হয় না। এমন খুব কমই দেখা গিয়েছে যে, কোনো জমকালো বাংলোর অধিবাসী তার পার্শ্বস্থ কোনো ঝুপড়ির লোকদের খোঁজ-খবর নেওয়া, রোগে-শোকে তাদের দেখাশোনা করা, বা নিছক দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই তাদের নিকট যাওয়া ইত্যাদি করে থাকে। অথচ এমন প্রতিবেশীই ত্যাগ ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিক হকদার।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ. ইলম ও দ্বীনদারীর দিক থেকে উঁচু মাকামের তো ছিলেনই, বংশ-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকেও ছিলেন বিশিষ্ট

ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস ছিলো যে, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্যে দারুল উলূমে যাওয়ার পূর্বে নিকটস্থ সাধারণ বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী বিধবা ও অসহায় মহিলাদের বাড়িতে গিয়ে সবার নিকট থেকে কার কী বাজার-সদাই আনানো প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতেন। বহুসংখ্যক মহিলার সদাইয়ের একটি তালিকা নিয়ে নিজে বাজারে যেতেন। সবার সদাই খরিদ করতেন। প্রত্যেকের নিকট তাদের সদাই পৌঁছে দিতেন। অনেক সময় এমনও হতো যে, কোনো মহিলা বলতেন, মুফতী ছাহেব! আপনি এ জিনিসটি ভুল এনেছেন, আমি তো অমুক জিনিস আনতে বলেছিলাম বা এই পরিমাণ আনতে বলেছিলাম। মুফতী ছাহেব হাসিমুখে বলতেন, আমাকে মাফ করবেন, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি এখনি গিয়ে এ জিনিস পরিবর্তন করে নিয়ে আসছি। এভাবে তিনি কতো ভাঙ্গা হৃদয়ের দু'আ কুড়িয়ে এবং তাদের খেদমতের পুলক দ্বারা হৃদয়কে উজ্জীবিত করে দিনের কর্মব্যস্ততা আরম্ভ করতেন, তার ইয়ত্তা নেই। বর্তমান যুগে আরাম-আয়েশের সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অন্তর এক ধরনের অজানা অস্থিরতা এবং এক ধরনের অজ্ঞাত যন্ত্রণায় আক্রান্ত। জনাব নযর আমরুহীর ভাষায়,

کوئی الجھن نہیں، لیکن کسی الجھن میں رہتا ہے

عجب دھڑکا سا ہر دم دل کی ہر دھڑکن میں رہتا ہے

'কোনো অস্থিরতা না থাকা সত্ত্বেও
এক ধরনের অস্থিরতায় থাকে,
হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনের মাঝে
আশ্চর্যজনক এক ভীতি বিরাজ করে।'

এই অজানা অস্থিরতার বড়ো একটি কারণ এই যে, আমরা টাকা-পয়সা গণনা করাকেই জীবনের লক্ষ্য মনে করেছি। ধনসম্পদের সীমানার বাইরে আমরা আর কিছু ভাবতে তৈরী নই। ফলে আমরা আত্মার সেই প্রশান্তি এবং অন্তরের সেই পুলক থেকে বঞ্চিত হতে চলছি, যা নিজের কোনো ভাই ও বোনের খেদমত করে এবং তাদের জন্যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করার মাধ্যমে লাভ হয়। যা নিজের জীবনকে সৃষ্টিকর্তা প্রভুর হুকুমের অধীন বানানো এবং তাঁর হুকুমের সম্মুখে নিজের নাজায়েয কামনা-বাসনাকে নিষ্পেষিত করার নগদ পুরস্কার। আত্মার প্রশান্তির এই নগদ পুরস্কার অনেক সময় কাঁচা-ঘর এবং ডাল-রুটির সাধারণ জীবনেও লাভ হয়ে থাকে। আর যদি তার শর্তাবলী

পূরণ করা না হয়, তাহলে জমকালো কুঠি এবং মনোরম গাড়ির মধ্যেও তা লাভ হয় না। এমতাবস্থায় কুঠি-বাংলোর ঝলমলে পরিবেশ মনের অন্তরালের ওই অস্থিরতার নিরাময় করতে পারে না।

এতে সন্দেহ নেই যে, বর্তমানের শহুরে জীবন খুবই ব্যস্ত জীবন। কিন্তু এই ব্যস্ততা বেশির ভাগই টাকা-পয়সার অংক বৃদ্ধির জন্যেই হয়ে থাকে। বিধায় অন্তরের প্রশান্তি লাভ করা সত্যিই যদি নেয়ামত হয়ে থাকে এবং তা অর্জনের জন্যে ফিকির করা প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে, তাহলে এ সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে এর জন্যেও সামান্য সময় বের করতে হবে, যে সময়ে নিজের আশেপাশে বসবাসকারীদের জীবনের প্রতি উঁকি মেরে দেখা সম্ভব হবে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার সম্ভাব্য কোনো পথ খুঁজে বের করার সুযোগ হবে। চব্বিশ ঘণ্টার ব্যস্ততার মধ্যে থেকে বের করা যে কয়টি মুহূর্তে এই কাজে ব্যয় হবে, ইনশাআল্লাহ তা এমন কাজ করবে, যা সারাদিনের দৌড়া-দৌড়ির ফলে অর্জিত অগাধ টাকা-পয়সা করতে পারবে না।

(৫ জুমাদাল উলা, ১৪১৬ হিজরী, ১ অক্টোবর, ১৯৯৫ ঈসায়ী)

প্রতিবেশীর হক আদায় করুন*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا [1]

গত চার দিন ধরে একটি হাদীসের বর্ণনা চলছে, যার মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-কে পাঁচটি নসীহত করেছেন, সাথে এই হেদায়েতও করেছেন যে, এগুলো নিজেও মনে রাখবে এবং অন্যের কাছেও পৌঁছে দিবে। এগুলোর উপর নিজেও আমল করবে এবং অন্যদেরকেও আমল কারার জন্যে উদ্বুদ্ধ করবে। নসীহত পাঁচটি বাক্যসম্বলিত। প্রথম বাক্য ছিলো এই-

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ

হারাম জিনিস থেকে, নাজায়েয জিনিস থেকে এবং গোনাহ থেকে বাঁচো তাহলে তুমি সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদতগুজার হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বাক্য ছিলো এই-

وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৬, পৃঃ ১৪৪-১৬৪, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২০৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭৭৪৮

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তার উপর রাজি থাকো, তাহলে তুমি সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ধনী হতে পারবে।

গত তিন দিনে এই দুই বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে।

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ

তৃতীয় বাক্য এই ইরশাদ করেন,

وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا

'নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করো, তাহলে তুমি মুসলমান হতে পারবে।'

এই বাক্যের মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, মুসলমান হওয়ার আলামত যেন এই যে, সে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করবে। কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমান হওয়ার দাবি করে, কিন্তু তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ না করে তাহলে বাস্তবে সে মুসলমান নয়। এজন্যে তিনি বলেছেন, নিজের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণ করো তাহলে মুসলমান হতে পারবে। এ বাক্যে এতো ওজনী শব্দে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণের তাকিদ করেছেন! কুরআন ও হাদীস প্রতিবেশীর হক এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণের তাকিদ দ্বারা পরিপূর্ণ।

জিবরাঈল আলাইহিস সালামের অব্যাহত তাকিদ করা

অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে অব্যাহতভাবে আমাকে তাকিদ করতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হয় যে, হয়তো এমন কোনো বিধান আসবে যে, প্রতিবেশীও ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।[২]

অর্থাৎ, কেউ মরে গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যেমন বণ্টন হয়, হয়তো এমন কোনো হুকুম আসবে যে, এখন প্রতিবেশীকেও পরিত্যক্ত সম্পদে অংশ দিতে হবে।

---

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৫৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭৫৬, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৬৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৮৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৬৬৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৫৩২০

প্রতিবেশী তিন প্রকার

কুরআনে কারীম প্রতিবেশী তিন প্রকার বলেছে।

এক. اَلْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی

দুই. اَلْجَارِ الْجُنُبِ

তিন. اَلصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ[৩]

এই তিন প্রকারের প্রতিবেশীরই হক আদায় করা এবং তাদের সঙ্গে সদাচরণ করার তাকিদ এসেছে। প্রথম প্রকার হলো, اَلْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی। অর্থাৎ, ঐ প্রতিবেশী, যার ঘরের দেয়াল আপনার ঘরের দেয়ালের সঙ্গে মিলিত। দ্বিতীয় প্রকার اَلْجَارِ الْجُنُبِ। অর্থাৎ, ঐ প্রতিবেশী, যার দেয়াল সংযুক্ত তো নয় কিছুটা দূরত্ব রয়েছে তারপরেও সে একেবারে নিকটবর্তী। উভয় শব্দ পৃথকভাবে এনে কুরআনে কারীম বলে দিয়েছে যে, এরূপ মনে করবে না যে, তোমার প্রতিবেশী শুধু সেই, যার দেয়ালের সঙ্গে তোমার দেয়াল মিলিত আছে। বরং কিছুটা দূরে তবে প্রায় একই জায়গায় বসবাসকারী, শুধু পথ আর দেয়াল পৃথক, সেও তোমার প্রতিবেশী। তার প্রতিও লক্ষ রাখো।

অল্প সময়ের সঙ্গী

প্রতিবেশীর তৃতীয় প্রকার এই বর্ণনা করেছে যে, اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ। আমি এর অর্থ করে থাকি- ক্ষণিকের সঙ্গী। এর উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোনো বাহনে- যেমন বাসে- সফর করছেন। আপনার পাশের সীটে একজন এসে বসলো। তাকে اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ বলা হবে। আপনি রেল গাড়িতে বা বিমানে সফর করছেন। পার্শ্ববর্তী সীটে অপর একজন বসেছে, সে اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ। অথচ ঐ ব্যক্তি অপরিচিত, ইতিপূর্বে কখনো তাকে দেখেননি, তার সাথে সাক্ষাত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা নেই, কিন্তু যেহেতু সে অল্প সময়ের জন্যে আপনার সঙ্গী হয়েছে, কুরআনে কারীম বলে যে, তারও হক রয়েছে। তার সঙ্গে সদাচরণ করো। অথবা আপনি কোথাও

---

৩. নিসা : ৩৬

লাইন ধরেছেন। ঐ লাইনে আপনার সামনে আরেকজন লোক দাঁড়ানো। আপনার পিছনে অন্য একজন দাঁড়ানো। এই দুই ব্যক্তি আপনার صَاحِبْ بِالْجَنْبِ। এদেরও হক রয়েছে। এদের সঙ্গেও সদাচরণের নির্দেশ রয়েছে।

ঐ বান্দা আল্লাহর অতি প্রিয়

কুরআনে কারীম প্রতিবেশীদের এই তিন প্রকার পৃথক পৃথক করে এজন্যে বর্ণনা করেছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ বান্দা অতি প্রিয়, যে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণ করে। এতোটুকু তো সব মুসলমান জানে ও মানে যে, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে। কিন্তু কার্যত কতগুলো ভুল বুঝাবুঝি পাওয়া যায়, যেগুলো দূর করা জরুরী। কারণ, আমলের সময় নফস ও শয়তান মানুষকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝায়। সাথে কিছু ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে, যার ফলে এই হুকুমের উপর আমল করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

এটি নতুন সভ্যতা

যতো দিন পর্যন্ত একটানা বাড়ি-ঘর হতো, ততো দিন পর্যন্ত মানুষ নিজেদের প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ রাখতো। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতো। কতক সময় প্রতিবেশীদের সাথে রক্তের সম্পর্কের চেয়েও অধিক শক্তিশালী সম্পর্ক হতো। কিন্তু যখন থেকে এই কুঠি-বাংলো বানানো শুরু হয়েছে, তখন থেকে অনেক সময় বছর বছর একসঙ্গে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও প্রতিবেশী কে তা জানা থাকে না? এই নতুন সভ্যতা প্রতিবেশীর বিষয়টিই বিলুপ্ত করে দিয়েছে। আমরা ব্রাঞ্চ রোডে একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম। যেদিন ঐ ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠলাম, আশে-পাশের মানুষ দেখা করতে আসলো এবং পরস্পরে এমন সুসম্পর্ক হলো, যেমন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হয়ে থাকে। সেখানে পাঁচ বছর থাকার পর লাসবিলা হাউজে স্থানান্তরিত হই। সেখানে একটি প্লটে ওয়ালেদ ছাহেব বাড়ি বানিয়েছিলেন। ঐ বাড়ির চর্তুদিকে দেয়াল ছিলো। চর্তুদিকে ছিলো কুঠি-বাংলোয় বসবাসকারী। এবার সপ্তাহকে সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু একথা জানা যায়নি যে, ডান দিকের বাড়িতে কে থাকে, বাম দিকের বাড়িতে কে থাকে, সামনে কে আছে, আর পিছনেই বা কে আছে? কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত নেই। তাই একদিন ওয়ালেদ ছাহেব অত্যন্ত

গুরুত্বের সাথে পার্শ্ববর্তী লোকদের সঙ্গে দেখা করতে যান, যাতে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠে। তারপর বলেন যে, দেখো! যখন আমি ফ্ল্যাটে বাস করতে গিয়েছিলাম, তখন মহল্লার সব লোক দেখা করার জন্যে জমা হয়ে ছিলো। তারা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিলো। সম্পর্ক ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলো। আর এখানে এই অবস্থা! বিভিন্ন এলাকার মধ্যে এই পার্থক্য হয়ে থাকে। মোটকথা, কুঠি-বাংলোর মধ্যে এ অবস্থাই হয়ে থাকে যে, বছর বছর অবস্থান করার পরও জানা যায় না যে, আমার প্রতিবেশে কে থাকে?

আগুন লাগার ঘটনা

আমি একবার ইসলামাবাদে একটি রেস্ট হাউজে অবস্থান করছিলাম। সেটি ছিলো একটি বাংলো। রাত তিনটায় তাতে আগুন লেগে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি বিশেষ মেহেরবানী করেন। আমাদের প্রাণ রক্ষা করেন। ফায়ার ব্রিগেডের লোক এসে আগুন নিভায়। কিন্তু আমি দেখলাম যে, সকাল আটটা নয়টা পর্যন্ত নিভানোর কাজ চলতে থাকে, কিন্তু পার্শ্ববর্তী বাংলো ওয়ালাদের কোনো খবর ছিলো না। কারো এ তাওফীক হলো না যে, আমাদের পার্শ্ববর্তীতে আগুন লেগেছিলো, দেখি তাদের কি অবস্থা? কেউ মরলো কি না, বা কেউ আহত হলো কি না? তাদের আসার সময়ই হলো না। কারণ, যে বিপদ এসেছে, তা অন্যদের উপর এসেছে। আমাদের উপর আসেনি। আজ আমাদের সমাজে এ অবস্থা হয়েছে যে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক ও সদাচরণের যেসব ফযীলতের কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে তা সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন 'নাফসী' 'নাফসী' অবস্থা। শুধু আমি আছি, আমার ঘর আছে, আমার বাড়ি আছে, আমার পরিবার আছে। এরপর আর কারো দিকে দেখার প্রয়োজন নেই।

কুঁড়ে ঘরওয়ালাও প্রতিবেশী

দ্বিতীয়ত, কারো প্রতিবেশীর হক আদায় এবং তার সঙ্গে সদাচরণ করার চিন্তা জাগলেও প্রতিবেশী কেবল তাকে মনে করা হয়, যে সম্পদের দিক থেকে তার সমপর্যায়ের। আমার পাশেই যদি ঝুপড়ির মধ্যে কেউ থাকে তাহলে সে আমার প্রতিবেশী নয়। আমার যদি বাংলো থাকে তাহলে তারও বাংলো থাকতে হবে, তাহলে সে প্রতিবেশী। সে যদি কুঁড়ে ঘরের অধিবাসী হয় তাহলে তাকে প্রতিবেশীর অধিকার দেওয়ার জন্যে আমি প্রস্তুত নই। তার

ব্যাপারে এ চিন্তাই জাগে না যে, সে আমার প্রতিবেশী। এ কারণেই কি সে তোমার প্রতিবেশী নয় যে, সে বেচারা গরীব, তার বাংলো নেই, তার রয়েছে ঝুপড়ি। এর দলিল এই যে, তোমরা যখন পরস্পরে প্রতিবেশীদের একত্রিত করো, দাওয়াত দাও, তখন শুধু বাংলো ওয়ালাদের দাওয়াত দাও, কুঁড়ে ঘর ওয়ালাদেরকে দাওয়াত দাও না। এজন্যে মন-মগজে এ কথা বসে গিয়েছে যে, প্রতিবেশী সেই, যে সম্পদের দিক থেকে, পদ-পদবীর দিক থেকে, অর্থনীতির দিক থেকে আমার সমকক্ষ। অন্যথায় সে আমার প্রতিবেশী নয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেশী সে, যে তোমার বাড়ির পাশে থাকে। সে যদি তোমার বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে থাকে তাহলে প্রথম প্রকারের প্রতিবেশী। আর যদি একটু দূরে থাকে তাহলে দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিবেশী। উভয়টার কোনো একটার মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত। যদিও সে কুঁড়ে ঘরে বাস করে। বরং কুঁড়ে ঘরে বাসকারী প্রতিবেশীর অধিকার বেশি। কারণ, কোনো দিন যদি তার বাড়িতে খাবার না থাকে, তাহলে তার প্রতিবেশী গোনাহগার হবে। বরং এক হাদীসে আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি মুসলমান নয়, যার প্রতিবেশে কোনো মানুষ ক্ষুধার্থ অবস্থায় ঘুমায়।

মুফতী আ'যম হিন্দ রহ.-এর ঘটনা

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদের নিকট থেকে একথা কয়েকবার শুনেছি যে, হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ.- যাঁর ফতওয়ার দশ ভলিউম 'ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে ছেপে বের হয়েছে। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের 'মুফতিয়ে আ'যম' ছিলেন। ফতওয়া বিষয়ে আমার ওয়ালেদ মাজেদের ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর বাড়ির নিকটে তিন-চার জন বৃদ্ধা মহিলা থাকতেন। তাঁর নিয়ম ছিলো এই যে, দারুল উলূমে যাওয়ার জন্যে যখন বের হতেন, তখন প্রথমে ঐ বৃদ্ধাদের বাড়িতে যেতেন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করতেন যে, বিবি! বাজার থেকে কোনো সদাই আনতে হলে বলো, আমি এনে দিচ্ছি। তখন কোনো মহিলা বলতেন, এতোটুকু ধনে পাতা, এতোটুকু পুদিনা পাতা, এতোটুকু সবজি এবং এতোটুকু টমেটো আনবেন। সব মহিলার কাছে সদাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতেন তারপর বাজারে যেতেন। বাজার থেকে সদাই ক্রয় করতেন। সব বৃদ্ধার বাড়িতে ঐ সদাই পৌঁছিয়ে দিতেন। তারপর দারুল উলূমে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। কতক সময় এমনও হতো যে, কোনো মহিলা বলতেন, মওলবী ছাহেব! আপনি ভুল সদাই

এনেছেন। আমি তো অমুক জিনিসের কথা বলেছিলাম আর আপনি অমুক জিনিস নিয়ে এসেছেন, বা বলতো যে, আমি তো এই পরিমাণ আনতে বলেছিলাম আর আপনি এই পরিমাণ এনেছেন। তিনি বলতেন, আচ্ছা বিবি! কোনো সমস্যা নেই, আমি এখনই বাজারে গিয়ে বদলিয়ে আনছি। সুতরাং পুনরায় বাজারে যেতেন এবং ঐ জিনিস বদলিয়ে এনে বিধবার হাতে দিতেন তারপর দারুল উলূমে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। প্রতিদিন এ কাজ করতেন। তাঁর সর্বপ্রথম কাজ ছিলো প্রতিবেশীদের খবর নেওয়া।

এঁরা কেমন লোক ছিলেন

এমন ব্যক্তি, যাঁর সুনামের ডঙ্কা বাজছে। এমন ব্যক্তি, যাঁর ফতওয়াকে সর্বরীতি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আসছে। কতো মানুষ তাঁর হাত-পা চুম্বন করার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর অবস্থা এই যে, ফতওয়ার কাজ শুরু করার পূর্বে বিধবা মহিলাদের খবর নিচ্ছেন। এসব লোক এমনিতেই বড়ো হননি। আমার ওয়ালেদ মাজেদ বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা এঁদের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবতাও ছিলো তাই। উলামায়ে দেওবন্দের নাম যে আমরা নিয়ে থাকি, তা কেবল এ জন্যে নয় যে, তাঁদের প্রতি আমাদের ভক্তি সৃষ্টি হয়েছে, বরং বাস্তবতা এই যে, তাঁদের একেক সদস্য সুন্নাতে নববীর জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। শুধু নামায-রোযার ব্যাপারে নয়, বরং জীবনের প্রত্যেকটি শাখায় তাঁরা সুন্নাতে নববীর উপর আমলকারী ছিলেন।

সারাজীবন কাঁচা বাড়িতে কাটিয়ে দিলেন

আমার ওয়ালেদ ছাহেবের ওস্তাদ হযরত মিয়াঁ আসগর হোসাইন ছাহেব রহ., যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের হাদীসের ওস্তাদ ছিলেন, সাথে কিতাবের ব্যবসাও করতেন। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন, ধনী ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাড়ি ছিলো কাঁচা। বৃষ্টির মৌসুমে কখনো তাঁর বাড়ির ছাদ ভেঙ্গে পড়তো, কখনো দেয়াল দুর্বল হয়ে যেতো, কখনো বারান্দা পড়ে যেতো, বর্ষার মৌসুম চলে গেলে পুনরায় তা মেরামত করাতেন। ওয়ালেদ ছাহেব বলেন যে, একদিন আমি হযরতকে বললাম, হযরত প্রতি বছর বর্ষাকালে বাড়ি ভেঙ্গে যায়, আপনি কষ্ট করেন, পুনরায় মেরামত করতে হয়, আল্লাহ

তা'আলা আপনাকে সামর্থ দিয়েছেন, আপনি একবার বাড়ি পাকা করে নিন, তাহলে বার বারের এ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করবেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যে রসিকতা ছিলো, তাই উত্তরে বললেন, বাহ, মওলবী শফী ছাহেব! আপনি কতো উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন! আমি তো বুড়ো হয়ে গেলাম, সারাজীবন কেটে গেলো, কিন্তু এতোটুকু বুদ্ধি মাথায় এলো না। বাহ, সুবহানাল্লাহ! কি বুদ্ধির কথা বলেছেন! মাশাআল্লাহ! এতো বার তিনি এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন যে, আমি লজ্জায় ঘেমে উঠলাম। খুব লজ্জিত হলাম। ওয়ালেদ ছাহেব বললেন, হযরত আমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আপনার কাছে এ কথা জানতে চাওয়া যে, বাড়ি পাকা না করার মধ্যে কী হিকমত রয়েছে? অনেক বেশি পীড়াপীড়ি করলে হযরত বললেন যে, আচ্ছা আমার সঙ্গে আসো। আমার হাত ধরলেন, ঘরের দরজায় নিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে গলি তুমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছো, এর মধ্যে কোনো পাকা বাড়ি দেখতে পাচ্ছো কি? কারো বাড়ি পাকা নয়। এখন পুরো গলির সব প্রতিবেশীর বাড়ি হবে কাঁচা, আর আমার বাড়ি হবে পাকা। এমতাবস্থায় বাড়ি পাকা বানিয়ে কি আমার ভালো লাগবে। ওদিকে আমার এই পরিমাণ সামর্থ নেই যে, গলির সবার বাড়ি পাকা করে দিবো। এজন্যে আমার সব প্রতিবেশী যেমন, আমিও তেমন।

শুধু এ জন্যে সারা জীবন কাঁচা বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছেন, যাতে প্রতিবেশীদের অন্তরে এই আক্ষেপ না জন্মে যে, মিয়াঁ ছাহেবের বাড়ি পাকা, আর আমাদের বাড়ি কাঁচা। অথচ বাড়ি বানানো কোনো গোনাহের কাজ ছিলো না। শরীয়ত নিষেধ করেনি। হারাম সাব্যস্ত করেনি। কিন্তু প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণের একটা দাবি এও ছিলো যে, তাদের অন্তরে যেন এই আক্ষেপ না জাগে যে, মিয়াঁ ছাহেবের বাড়ি পাকা, আর আমাদের বাড়ি কাঁচা।

প্রতিবেশীদের যেন আক্ষেপ না হয়

আমার বড়ো ভাই জনাব যাকী কাইফী মরহুম তার ঘটনা শুনাতেন যে, আমি একবার হযরত মিয়াঁ ছাহেবের কাছে গেলাম। আমের মৌসুম ছিলো। মিয়াঁ ছাহেব আম দিয়ে বললেন, খাও। ঐ যুগে আম চুষে খাওয়া হতো। যখন ছিলকা ও আঁটি একত্রিত হলো তখন আমি বললাম যে, এগুলো বাইরে ফেলে দেই এবং তুলে নিয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিলাম। হযরত জিজ্ঞাসা

করলেন- কোথায় যাচ্ছো? আমি বললাম, হযরত বাইরে ফেলতে যাচ্ছি। হযরত বললেন, না, এগুলো বাইরে ফেলো না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনি বললেন, বাইরের দরজায় যখন এতোগুলো ছিলকা ও আঁটি মহল্লার ছেলেরা দেখবে, তাদের মধ্যে অনেকে গরিব আছে, যাদের আম খাওয়ার সামর্থ নেই, তখন হতে পারে তাদের অন্তরে আক্ষেপ জাগবে! এই আক্ষেপ জাগা ভালো বিষয় নয়। এজন্যে এগুলো বাইরে ফেলবে না। বরং ছিলকা ছাগলকে খাইয়ে দেই। এই হলো প্রতিবেশীর হক। যাদের সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا

এ হাদীসে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণ করাকে মুসলমান হওয়ার আলামত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পার্শ্ববর্তী দোকানদার প্রতিবেশী

প্রতিবেশী শুধুমাত্র ঘরে বসবাস করার ক্ষেত্রেই হয় না, দোকানের ক্ষেত্রেও প্রতিবেশী হয়। আপনার দোকানের সঙ্গে অন্যের দোকান থাকলে সেও আপনার প্রতিবেশী। তারও হক রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে হলো প্রতিযোগিতার যুগ। এজন্যে আমাদের উপর পার্শ্ববর্তী দোকানদারের হক থাকার প্রশ্ন আসে না। যে কোনোভাবে আমি তার চে' এগিয়ে যাবো। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে সে প্রতিবেশী। প্রতিবেশী হওয়ার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের ভিত্তিতে সে তোমার সদাচরণের হকদার। যে সমাজে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন ছিলো, যে সমাজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে পার্শ্ববর্তী দোকনদারও প্রতিবেশীর হক পেতো। তার সঙ্গেও অসাধারণভাবে সদাচরণ করা হতো।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বের ১৯৬৬ সালের ঘটনা। মক্কা মুকাররমায় আমি ওমরার জন্যে যাই। আমার বড়ো ভাই জনাব ওলী রাযী ছাহেব সাথে ছিলেন। সে সময় মক্কা মুকাররমায় প্রাচীনতার ছাপ ছিলো। এমন আধুনিকতা তখন আসেনি। আমরা সেখানে প্রায় দুই মাস অবস্থান করি। তখন আমাদের তারুণ্য ছিলো। সব জায়গায় যাওয়ার এবং পুরান

পুরান জায়গা দেখার আগ্রহ ছিলো। এক বাজারে আমরা গেলাম। তখন সেখানের এক অধিবাসী বললেন যে, এখানে তো বিস্ময়কর দৃশ্য। আযান হতেই সামানার উপর কাপড় দিয়ে দোকান খোলা রেখে নামাযের জন্যে চলে যায়। চুরি-ডাকাতির কোনো ভয় নেই। একজন বলতে লাগলো আমি এরচে' বিস্ময়কর অবস্থা দেখেছি। এ বাজারেই আমি একবার এক দোকানে কাপড় কিনতে যাই। কাপড় দেখে আমি পছন্দ করি। দামও ছিলো উপযুক্ত। আমি বললাম, এ পরিমাণ কাপড় ছিড়ে দাও! দোকানদার জিজ্ঞাসা করলো- এ কাপড় আপনার পছন্দ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, দাম ঠিক আছে? আমি বললাম, ঠিক আছে। তারপর দোকানদার বললো, এ কাপড়ই সামনের দোকান থেকে নিন। আমি বললাম, ওখান থেকে কেনো নিবো? দরদাম তো আপনার সঙ্গে হয়েছে। দোকানদার বললো, এই বিতর্কে জড়ানোর দরকার নেই, এ কাপড়ই এ দামেই আপনি ওখানে পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে নিন। আমি বললাম, ওটা কি আপনার দোকান? সে বললো, না, আমার দোকান না। আমি বললাম, আমার দরদাম তো আপনার সঙ্গে হয়েছে। আমি তো আপনার থেকেই নিবো। আমি আরো বললাম, যে পর্যন্ত কারণ না বলবেন, সে পর্যন্ত নিবো না। দোকানদার বললো, আসল কথা এই যে, সকাল থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত আমার নিকট আট-দশ জন গ্রাহক এসেছে, আর সামনের দোকানে সকাল থেকে এ পর্যন্ত কোনো গ্রাহক আসেনি। তাই আমি চাইলাম তারও বিক্রি হোক। এজন্যে আমি আপনাকে তার কাছে পাঠাচ্ছি। এই হলো মুসলমান সমাজের একটি দ্যুতি, যা তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলো।

আজ দুনিয়া উপার্জনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে

আমাদের মধ্যে আজ যেই মসিবত এসেছে যে, অন্যে পাক চাই না পাক, আমাকে পেতে হবে। বরং অন্যেরটা ছিনিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করতে হবে। অন্যেরটা লুট করতে হবে। এই আপদ এসেছে দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতার কারণে। উপরের ঘটনায় লক্ষ করুন! দোকানের প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে সদাচরণ করা হচ্ছে। যে মুসলমানের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে, যার অন্তরে আল্লাহর রাসূলের আযমত ও মহব্বত থাকবে, কেবল সেই এমন আচরণ করতে পারবে। অন্যে তা করতে পারবে না। কারণ, ব্যবসায়ী তো বলবে যে, আমি লাভের জন্যে এখানে বসেছি।

দ্রব্যের মাল বিক্রির জন্যে এখানে বসেছি। অন্যের দোকানের মাল বিক্রির জন্যে বসিনি। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং আল্লাহর রাসূলের এই বাণীর উপর ঈমান রাখে যে, নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করো তাহলে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে, সে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করতে পারবে, অন্যে পারবে না।

উপমহাদেশে ইসলামের সূচনা কীভাবে হয়েছে

আমরা যদি আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে, এ অঞ্চলে ইসলামের যে আলো এসেছে, আল্লাহ তা'আলা এখানে ইসলামের যে নূর ছড়িয়ে দিয়েছেন, তা মূলত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর উপর আমলের ফল। শুরুতে কোনো ইসলামী সেনাবাহিনী এ অঞ্চল জয় করার জন্যে আসেনি। এমন কোনো তাবলীগ জামাতও এখানে আসেনি, যারা তাবলীগ করে মানুষকে মুসলমান বানিয়েছে। বরং এখানে সর্ব প্রথম মালাবার অঞ্চলে কতিপয় তাবেঈ- কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা জানা যায়- কিছু সাহাবীও মালাবারের উপকূলে অবতরণ করেন। সেখানে তারা ব্যবসা আরম্ভ করেন। সেই ব্যবসায় তারা যে সততা, আমানতদারী, দিয়ানতদারী ও মানব-প্রেমের প্রমাণ দেন, তার ফলে মানুষের মন তাদের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। মানুষের মাথায় এ কথা আসে যে, যেই দীন তাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে, তা আমাদেরও গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং সেই ব্যবসায়ীদেরকে দেখে মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে সর্বপ্রথম মালাবারে ইসলাম আসে। তারপর মালাবার থেকে পুরো উপমহাদেশে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করো তাহলে তুমি মুসলমান হয়ে যাবে, এর অর্থ হলো, তোমার মুসলমান হওয়ার একটি নিদর্শন দুনিয়ার সামনে আসবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করবেন।

দেয়ালের উপর শাহতীর রাখার অনুমতি

মোটকথা, তোমার দেয়ালের সঙ্গে যাদের দেয়াল মিলিত আছে, তারা হলো প্রথম প্রকারের প্রতিবেশী। দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিবেশী তারা, যারা একটু দূরে আছে, তারপরেও নিকটে। এই উভয় প্রকারের প্রতিবেশীর হক রয়েছে।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমার প্রতিবেশী যদি তোমার দেয়ালের উপর তার শাহতীর রাখতে চায় তাহলে তাকে নিষেধ করবে না। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এই হাদীস মানুষদেরকে শুনাচ্ছিলেন। হাদীস শুনে মানুষ খুব বিস্মিত হলো যে, দেয়াল আমার, আমার মালিকানাধীন, এমতাবস্থায় এটা কি আমার উপর ফরয যে, তার উপর প্রতিবেশীর শাহতীর রাখতে আমি নিষেধ করবো না? তাদের বিস্ময় দেখে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। তোমাদের যতোই খারাপ লাগুক না কেন আমি তো এ বাণীকে তোমাদের কাঁধের মাঝে নিক্ষেপ করে ছাড়বো।[৪]

উদ্দেশ্য হলো আমি তোমাদেরকে এ বাণী শোনাবোই। অথচ নিজের দেয়ালের উপর প্রতিবেশীর শাহতীর রাখার অনুমতি দেওয়া ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, তুমি যদি মুসলমান হয়ে থাকো তাহলে তোমাকে এ কাজ করতে হবে।

প্রতিবেশীর হকের মধ্যে অমুসলিমও অন্তর্ভুক্ত

আরেকটি বিষয় বুঝুন যে, প্রতিবেশীর হকের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম সকলে সমান। অর্থাৎ, প্রতিবেশী হওয়ার দিক থেকে সকলে সমান। আপনার যদি কোনো অমুসলিম প্রতিবেশী থাকে, তাহলে তার সঙ্গে সদাচরণ করা আপনার দায়িত্বে। কতক সময় এই ভুল বুঝাবুঝি হয় যে, সে তো কাফের। তার সঙ্গে কেন সদাচরণ করবো? এ কথা ঠিক নয়। কারণ, প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে তার সঙ্গে সদাচরণ করা আপনার জন্যে সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ। প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে আপনি যদি তার সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাকে হাদিয়া-তোহফা দেন, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তাহলে এসব কিছু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণ হবে। আর হতে পারে আপনার সদাচরণের ফলে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে ঈমান ঢেলে দিবেন। কতো অমুসলিমকে মুসলমানদের প্রতিবেশী হওয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের তাওফীক দান করেছেন। তাই প্রতিবেশী মুসলমান হোক বা অমুসলিম, গরিব হোক বা ধনী, নেককার হোক বা বদকার, তারা বদকারীর কারণে প্রতিবেশী

---

৪ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৮৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০১৯, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১২৭৩, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৫০

হওয়ার হক থেকে বঞ্চিত হবে না। হ্যাঁ, সুযোগ মতো উপযুক্ত সময়ে তাকে নেক কাজের শিক্ষা দিন।

অল্প সময়ে সঙ্গী

প্রতিবেশীর তৃতীয় প্রকার হলো- اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ। অর্থাৎ, অল্প সময়ের সঙ্গী। যেমন বাসে, জাহাজে, রেলগাড়িতে আপনার পার্শ্ববর্তী সীটে উপবিষ্ট ব্যক্তি اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ। কোনো মজলিসে, মসজিদে, শ্রেণিকক্ষে, সভা-সমাবেশে আপনার পাশে উপবেসনকারী ব্যক্তি اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ। আমরা নিজেদের উপরে জরিপ চালিয়ে দেখি যে, ইসলামী শিক্ষা থেকে আমরা কতো দূরে চলে গিয়েছি। রেলগাড়ি এবং জাহাজে সফর করার সময় সর্বত্র আপনি স্বার্থপরতার ঝোঁক দেখতে পাবেন। আমি ভালো জায়গা পাই, অন্যে পাক চাই না পাক। আমার আরাম মিলুক, অন্যের মিলুক বা না মিলুক। এই মেজাজ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কুরআনে কারীম বলে যে, যে ব্যক্তি اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ, সে তোমার সঙ্গী। যদিও অল্প সময়ের সঙ্গী। ঐ সাথীরও তোমার উপর হক রয়েছে।

পশ্চিমাদের একটি ভালো গুণ

আমরা পশ্চিমাদেরকে খুব গাল-মন্দ করে থাকি এবং তারা এর উপযুক্তও। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু গুণ রয়েছে, যা তারা মুসলমানদের মতো বাস্তবায়ন করেছে। এ দুনিয়া আমলের জায়গা। উপকরণের ভিত্তিতে চলে। যে ব্যক্তি কোনো উপকরণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে তার ভালো ফল দান করবেন। পশ্চিমাদের একটি মেজাজ হলো, কোনো এক কাজের জন্যে তিন ব্যক্তি কোথাও একত্রিত হলে সাথে সাথে তারা সারিবদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন টিকিট ক্রয় করতে হলে, বাস, রেল বা জাহাজে আরোহণ করতে হলে লাইন ধরে আরোহণ করবে। তিন ব্যক্তি একত্রিত হলে নিজেরাই লাইন বানিয়ে নিবে। একে অপরের আগে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। এটা সেখানকার সাধারণ নিয়ম। এরই ফল যে, এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কখনো ঝগড়া হয় না। ধাক্কা-ধাক্কি হয় না। ঠেলা-গুতা হয় না। সব কাজ আরামে হয়ে যায়। পুরো জাতির এই মেজাজ হয়ে গিয়েছে।

আমাদের স্বার্থপরতার ঘটনা

আমি আমার নিজের ঘটনা বলছি। একবার আমাকে পি.আই.এ.-এর বিমানে নিউইয়র্ক থেকে করাচী আসতে হয়। যে পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের নিয়ন্ত্রণ ছিলো, সে পর্যন্ত তো সব জায়গায় লাইন ছিলো। লাইন ধরে সব কাজ হয়ে যেতো। কিন্তু যখন বাসের মধ্যে বসার সময় এলো- তা যেহেতু আমাদের পাকিস্তানী ভাইদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো, বৃষ্টি হচ্ছিলো, বিমান বিলম্ব হয়েছিলো, এজন্যে বাস যোগে হোটেলে যেতে হবে- তখন বাসে ওঠার জন্যে এমন ধাক্কা-ধাক্কি হয় যে, আল্লাহ রক্ষা করুন! দুর্বল মানুষের তো বাসে উঠার প্রশ্নই আসে না! প্রত্যেকেই চাচ্ছিলো যে, অন্যদেরকে পিছে হটিয়ে আমি আগে বাসে আরোহণ করবো। আমি মনে মনে বললাম, তারা ছিলো কাফের, আর এরা মাশাআল্লাহ মুসলমান। এটা হলো স্বার্থপরতা যে, আমি আগে জায়গা পাই। আমি আরোহণ করি। আমার কাজ হোক। আমি সামনে অগ্রসর হই। অন্যদরকে পিছে ফেলে দেই। এসব এজন্যে হচ্ছে যে, আমরা এগুলোকে দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছি। আমরা মনে করি যে, দ্বীন শুধু নফল পড়া ও তাসবীহ পাঠ করার নাম।

মুসাফাহা করার একটি ঘটনা

দেখুন! মুসাফাহা করা কোনো ফরয ওয়াজিব নয়। বেশির চে' বেশি সুন্নাত। এই মুসাফাহা করার জন্যে কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া, ক্ষতি করা, ধাক্কা দেওয়া হারাম। হারাম কাজ করে আমরা সুন্নাতের উপর আমল করতে চাই। একবার সীমান্ত প্রদেশের এক এলাকায় আমার যাওয়া হয়। সেখানকার মসজিদে সমাবেশ হয়। আমার বয়ান হয়। ঐ মসজিদের দরজা ছিলো ছোট। উভয় দিকে জানালা ছিলো। বারান্দাও ছিলো। আঙ্গিনাও ছিলো। মানুষ অনেক দূর থেকে বয়ান শুনতে এসেছিলো। মসজিদের হল, বারান্দা ও আঙ্গিনা সব মানুষ দিয়ে পরিপূর্ণ ছিলো। যখন বয়ান শেষ হলো এবং মুসাফাহার পালা এলো- আপনাদেরকে আমি সত্য বলছি- বারান্দা ও আঙ্গিনার মানুষ জানালা দিয়ে ভিতরে আসার চেষ্টা করছিলো। এর ফলে মসজিদের জানালা ভেঙ্গে যায়। তাদের উদ্দেশ্য কেবল এই ছিলো যে, মুসাফাহা করার সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়। মাথায় এ কথা তো বদ্ধমূল ছিলো যে, মুসাফাহা করা সুন্নাত। মুসাফাহা করার ফযীলত মন-মগজে বসা ছিলো। কিন্তু এ কথা মাথায় ছিলো না যে, মসজিদের মধ্যে ধাক্কা-ধাক্কি করা

এবং অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আসল কথা এই যে, আমাদের জাতির সঠিক তারবিয়াত হয়নি। এর ফলে এই বিপর্যয় ছড়িয়ে আছে।

হাজরে আসওয়াদে ধাক্কাধাক্কি

হাজরে আসওয়াদে গিয়ে দেখুন কি হচ্ছে? সকল আলেম ও ফকীহ এ মাসআলা লিখে গিয়েছেন যে, হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা অনেক বড়ো ফযীলতের কাজ। কাউকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া যদি চুম্বন করা সম্ভব হয় তাহলে দাও, অন্যথায় চুম্বন করা কোনো জরুরী নয়। ফরয-ওয়াজিব নয়। কিন্তু আজকাল সেখানে ধাক্কা-ধাক্কি হচ্ছে। অন্যকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। ফযীলতলাভের জন্যে গোনাহ করা হচ্ছে। এসব কেন হচ্ছে? এজন্যে যে, আজকাল এগুলোকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না যে, অন্যকে কষ্ট দেওয়া গোনাহের কাজ এবং হারাম। যাই হোক, আমরা সকলে মিলে যদি এক কাজের জন্যে যাই তাহলে আমরা সকলে পরস্পরের জন্যে اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ। তখন প্রত্যেকের অপরের উপর হক রয়েছে। যদি লাইন বানিয়ে নেই তাহলে সবাই সুযোগ লাভ করবে, কিন্তু এদিকে কারো মনোযোগই নেই।

একটি সোনালী বাণী

আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. একটি সোনালী কথা বলতেন, যা অন্তরে অঙ্কন করে নেওয়ার মতো। তিনি বলতেন যে, বাতিলের মধ্যে উন্নতির কোনো যোগ্যতাই নেই। কুরআনে কারীম বলে-

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'নিশ্চয়ই বাতিল বিলুপ্ত হবেই।'[৫]

বাতিল তো বিলুপ্ত হওয়ার জন্যে এবং অবদমিত হওয়ার জন্যে এসেছে। তা কখনোই মাথা উঁচু করতে পারে না। কোনো বাতেল সম্প্রদায়কে যদি তোমরা দেখো যে, তারা দুনিয়াতে মাথা উঁচু করছে, উন্নতি করছে, তাহলে বুঝবে যে, তার সঙ্গে কোনো হক জিনিস যুক্ত হয়েছে। ঐ হক জিনিস তাকে উঁচু করছে। অন্যথায় বাতিলের মধ্যে উঁচু হওয়ার যোগ্যতা নেই। আজ আমরা আমেরিকা, বৃটিশ ও পশ্চিমা শক্তিসমূহকে যতো গাল-মন্দ করি,

---

৫. বানী ইসরাঈল : ৮১

তাদের উপর যতো অভিশম্পাত করি, কিন্তু তাদের উন্নতি তাদের অশ্লীলতা ও নগ্নতার কারণে নয়, তাদের গলদ আকীদার কারণে নয়, বরং তাদের উন্নতি হচ্ছে ঐ সব গুণের কারণে, যেগুলো মূলত ইসলামের শিক্ষা দেওয়া গুণ। তারা ঐসব গুণ গ্রহণ করেছে। যেমন পরিশ্রম, কষ্ট-সাধনা, সাধুতা, ব্যবসায় আমানতদারী, মানুষের হকের প্রতি লক্ষ রাখা- এসব বিষয় তাদেরকে দুনিয়াতে উন্নত করেছে। আখেরাতে তো তাদের কোনো অংশ নেই। তবে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের সঙ্গে এই আচরণ করেন যে, যে ব্যক্তি যেমন উপকরণ অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি দুনিয়াতে তেমন ফল লাভ করবে।

ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো

মূলত আমরা দ্বীনকে বিভিন্ন ঘরে বিভক্ত করে দিয়েছি। এক জাতি এক ঘরকে নিয়েছে এবং তাকে দ্বীন মনে করছে। এ ঘরের বাইরের জিনিস তার নিকট দ্বীন নয়। অথচ কুরআনে কারীম বলে যে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হও।'[৬]

এমন নয় যে, রমাযানুল মোবারকে তো খুব নফল নামায পড়বো, ই'তিকাফও করবো, রাত্রি জাগরণও করবো, তিলাওয়াতও করবো, যেই রমাযান শেষ হলো, মসজিদ থেকে বের হলাম, সেই কথাই হয়ে যাবো। মানুষের সঙ্গে মুআমালায় ও মুআশারায় খিয়ানত করতে আরম্ভ করবো। আজকের পৃথিবী অন্যায়-অপকর্মে ভরা। এর পরিণতিতে আমাদের উপর আযাব আসবে না তো কি আসবে? আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন। আমীন। মোটকথা, এ হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-কে বলছেন যে, যদি তুমি মুসলমান হতে চাও তাহলে তুমি নিজে এসব বিষয় শোনো এবং অন্যদের পর্যন্ত পৌছাও। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

৬. বাকারাহ ঃ ২০৮

ক্ষণিকের সঙ্গী*

জীবনে মানুষকে পদে পদে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এর মধ্যে কিছু সম্পর্ক হয় স্থায়ী, যেমন আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝের সম্পর্ক। আর কিছু সম্পর্ক স্থায়ী না হলেও দীর্ঘ সময়ের জন্যে হয়, যেমন প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক। আর কিছু সম্পর্ক হয়ে থাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা তার চেয়েও অল্প সময়ের জন্যে, যেমন সফরসঙ্গী। বাস, রেল বা বিমানে সফরকালে যাদের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

পবিত্র কুরআন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এই সম্পর্কত্রয়ের কিছু হক নির্ধারণ করেছে এবং সেগুলোর প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্যে তাকিদ করেছে। প্রথম দুই প্রকারের সম্পর্ক অর্থাৎ, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীর হকসমূহকে মানুষ কিছুটা হলেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তার কারণ এই যে, তাদের সাথে খারাপ আচরণের ফলে মানুষের বদনাম হয়। এ দুই প্রকারের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় বিধায় এ বদনামও হয় দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের সম্পর্ক অর্থাৎ, অল্প সময়ের সঙ্গীদের হক পালনের প্রতি খুব কম মানুষই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তার কারণ এই যে, এ সমস্ত লোক সাধারণত অপরিচিত হয় এবং কিছু সময় পর তারা যখন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন অনেক সময় সারা জীবনেও আর তাদের মুখোমুখি হতে হয় না। তাই তাদের সাথে কোনো অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার হয়ে গেলে তার ফলে স্থায়ী কোনো বদনামের আশঙ্কা থাকে না। এক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত মনে করে যে, অল্পক্ষণের জন্যে তাদের মনে আমার সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা জন্মালেও তাতে কি আসে যায়? পরবর্তীতে তো তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। তাই তাদের কিছু মনে করার খারাপ কোনো প্রভাব আমার জীবনে পড়বে না। ফলে বাস, রেল ও অন্যান্য সাধারণ যানবাহনসমূহ এবং এখন তো বিমানেও এমন ধাক্কাধাক্কি আর 'নাফসী' 'নাফসী' অবস্থা (স্বার্থ উদ্ধারের তৎপরতা) দৃষ্টিগোচর হয় যে, প্রত্যেকে অপরকে কনই মেরে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চিন্তায় থাকে। এটা এই স্বার্থপর মানসিকতারই আযাব।

---

* যিকির ও ফিকর পৃঃ ২৬০-২৬৫

এ জন্যেই পবিত্র কুরআন যেখানে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণের উৎসাহ দান করেছে, সেখানে ক্ষণিকের সঙ্গীদের হকসমূহ আদায় করার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। অল্প সময়ের সঙ্গীর জন্যে পবিত্র কুরআন الصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ শব্দ ব্যবহার করেছে।[১] এর অর্থ করা যায় 'পার্শ্বস্থ লোক'। আর এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে অল্প সময়ের জন্যে কারো সঙ্গী হয়। চাই তা কোনো সফরে হোক বা কোনো সাধারণ মজলিসে। বাস বা রেলে সফরকালে যে লোকটি আমার পাশে বসেছে, সে আমার জন্যে 'পার্শ্বস্থ লোক'। কোনো দাওয়াত, সভা বা সাধারণ সমাবেশে যে ব্যক্তি আমার পাশে রয়েছে, সে আমার জন্যে 'পার্শ্বস্থ লোক'। পবিত্র কুরআন বিশেষভাবে তার সঙ্গে সদাচারী হওয়ার হুকুম করার কারণ এই যে, মানুষের ভদ্রতা ও সদাচরণের আসল পরীক্ষা এ সমস্ত জায়গায়ই হয়ে থাকে। বড়ো বড়ো শিক্ষিত এবং বাহ্যত সভ্য-শালীন লোককে দেখা গিয়েছে যে, তাদের দৈনন্দিন জীবনে তারা বড়োই সদাচারী ও পরিশীলিত, কিন্তু যখন তারা সফরে বের হয়, তখন তাদের সমস্ত ভদ্রতা ও সদাচার লাপাত্তা হয়ে যায়। তারা নিজের সফরসঙ্গীর সাথে চরম পর্যায়ের স্বার্থপরতা ও পাষাণ-হৃদয়ের আচরণ করতে আরম্ভ করে দেয়।

এ জন্যেই হযরত ওমর ফারুক রাযি. একবার ইরশাদ করেন- কোনো মানুষের সৎকর্মশীল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত সাক্ষ্য তখন প্রদান করবে, যখন হয় তোমার সাথে তার আর্থিক কোনো লেনদেন হয়েছে, আর তুমি সে ক্ষেত্রে তাকে নির্ভেজাল পেয়েছো, কিংবা তুমি তার সাথে সফর করছো, আর সেই সফরে তুমি তাকে বাস্তবিকই সদাচারী পেয়েছো।

আসল কথা হলো, দুর্নামের ভয়ে যেই সদাচরণ করা হয়, তা সদাচরণই বা হয় কীভাবে? সেটা তো লৌকিকতা মাত্র। তাই যখন দুর্নামের ভয় থাকে না, তখন মানুষের মূল চরিত্র অসদাচরণের আকারে প্রকাশ পায়। সদাচরণ মূলত অভ্যন্তরীণ গুণের নাম, যা সুনাম ও দুর্নামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কোনো ভালো কাজকে কেবলমাত্র ভালো হওয়ার কারণেই করা হয়ে থাকে। আর এরূপ আমলই আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়। যখন কোনো মানুষের মধ্যে এ ভালো গুণ অর্জিত হয়, তখন তার আচরণ সব জায়গায় ঐ গুণের আবেদন অনুপাতেই হয়ে থাকে। এমনকি যে জায়গায় তাকে কেউ দেখছে না,

---

১. নিসা ঃ ৩৬

সেখানেও সে তার সৎপ্রকৃতির কারণে ঐ কাজটিই করে, যা তার করা উচিত। তার সম্মুখে সর্বদাই এ বাস্তবতা জাগ্রত থাকে যে, অন্য কেউ দেখুক বা না দেখুক, তিনি অবশ্যই দেখছেন, যাঁর দেখার উপর জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে থাকে।

ইসলাম যেই সূক্ষ্মতার সাথে 'পার্শ্বস্থ লোক'-এর হকসমূহের প্রতি লক্ষ রেখেছে, নিম্নের দৃষ্টান্তসমূহের দ্বারা সে সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

১. জুমুআর দিন জুমুআর নামায ও খুৎবার উদ্দেশ্যে লোকজন মসজিদে সমবেত হওয়ার পর নতুন করে কেউ এলে তার জন্যে শরীয়তের বিধান এই যে, সে সমবেত লোকদের পিছনে যেখানে জায়গা পাবে, সেখানে বসে যাবে। মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কাজের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

২. জুমুআর দিন গোসল সেরে ভালো কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দান করা হয়েছে। যেন এই বিশাল সমাবেশের লোকজন পরস্পরের দ্বারা কষ্টের পরিবর্তে আরাম, আনন্দ ও পুলক অনুভব করে।

৩. ফকীহগণ বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো রোগে আক্রান্ত, যার দ্বারা তার পার্শ্বস্থ লোকের কষ্ট হতে পারে বা ঘৃণা হতে পারে, তার জন্যে জামাআতের নামায মাফ। সে তার ঘরে নামায পড়লেই ইনশাআল্লাহ মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার সওয়াব পেয়ে যাবে।

৪. একাধিক ব্যক্তি একত্রে বসে কোনো কিছু খাওয়ার সময় শরীয়তের বিধান এই যে, অন্যদের প্রতি লক্ষ রেখে খাবে। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এসেছে যে, অন্যরা একটি করে খেজুর খেলে তুমি দুটি করে নিও না। এ হাদীসে এ মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শুধু নিজের চিন্তা করা এবং যা হাতে আসে তাই তুলে নেওয়া একজন মুমিনের স্বভাব নয়। বরং এদিকেও লক্ষ রাখতে হবে যে, আরো কিছু লোকও খাবারে তোমার সঙ্গে শরীক আছে। তোমার অংশ পুরোপুরি নিক্তির মাপে না হলেও অন্যদের সাথে পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত। (আজকাল বুফে ধরনের দাওয়াতের মধ্যে অনেক সময় যেই ছড়াছড়ি দেখা যায় এবং অনেকে যেভাবে একবারেই প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী নিজের পাত্রে তুলে নেয়, তা শরীয়তের এ সমস্ত বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।)

এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ শুধু একথা বলার জন্যে তুলে ধরলাম যে, ইসলামী শিক্ষায় 'ক্ষণিকের সঙ্গীর' গুরুত্ব কতো অধিক। এই গুরুত্বকে মনে রেখে আমাদের সমাজের কিছু খন্ড চিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিন।

যেখানে অনেক লোককে পালাক্রমে কোনো কাজ সম্পাদন করতে হয়, সেখানে সহজাত পন্থা হলো, আগত লোকেরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে এবং প্রত্যেকে নিজের পালা আসলে কাজ সম্পন্ন করবে। এতে সকলেই উপকৃত হবে এবং সবার কাজ সহজে সম্পন্ন হবে। এমন পরিস্থিতিতে (যুক্তিসঙ্গত অপারগতা ছাড়া) লাইন ভেঙ্গে সম্মুখে যাওয়ার চেষ্টা করা বা সে জন্যে হুড়াহুড়ি করার দ্বারা অন্যের হক মারাত্মকভাবে হনন করা হয়। যা অসদাচরণ ও অভদ্রতা ছাড়াও একটি গোনাহের কাজ।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ অমুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখে, বরং এটা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে যে, যেখানেই তারা একাধিক লোক একত্র হয়, সেখানেই আগে-পিছে হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আমরা, যারা 'ক্ষণিকের সঙ্গী' সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর উপরোক্ত শিক্ষার আলো রাখি, তারা লাইন ভেঙ্গে সম্মুখে অগ্রসর হওয়াকে বাহাদুরীর একটি শিল্প মনে করে থাকি। এ কথা তো খুব কম মানুষের অন্তরেই জাগে যে, এতে করে আমি গোনাহের কাজ করছি।

বাস ও রেলগাড়িতে প্রত্যেকে সীটের এ পরিমাণ জায়গা ব্যবহার করার অধিকার রাখে, গাড়িওয়ালাদের পক্ষ থেকে একজন যাত্রীর জন্যে যে পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে দু'ধরনের সীমালংঘন হয়ে থাকে।

প্রথম সীমালংঘন তো এই হয়ে থাকে যে, যে সমস্ত গাড়িতে সীট বুকিং হয় না, সেগুলোতে যে আগে গিয়ে পৌঁছে, সে একাই কয়েকজনের বসার জায়গা আটকে ফেলে, সেগুলো দখল করে নেয়। আর অন্যান্য যাত্রী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সফর করতে বাধ্য হয়। এখন চিন্তা করে দেখুন যে, এটা কতো বড়ো অবিচার যে, আপনি একটা টিকিট নিয়ে আরামে শুয়ে আছেন, আর অপর ব্যক্তি ঐ মূল্যেই টিকিট নিয়ে বসারও সুযোগ পাচ্ছে না। আমি আমার কতিপয় বুযুর্গ আলেম সম্পর্কে তো এ পর্যন্ত শুনেছি যে, গাড়ি সম্পূর্ণ খালি থাকলে এবং অন্য যাত্রী না থাকলেও তারা নিজের সীটের চেয়ে অধিক জায়গা ব্যবহার করতেন না। তারা বলতেন যে, আমি এক সীটের ভাড়া দিয়েছি, তাই আমার এক সীটই ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে, তার অধিক

নয়। এতে সন্দেহ নেই যে, এটি তাকওয়া এবং সতর্কতার উচ্চ স্তর। গাড়িওয়ালাদের পক্ষ থেকে যেহেতু এমন পরিস্থিতিতে খালি জায়গা ব্যবহারের সাধারণত অনুমতি থাকে, তাই একে নাজায়েয বলা যাবে না। কিন্তু যেখানে অন্য যাত্রীরা দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, সেখানে অতিরিক্ত জায়গা দখল করে নেওয়ার কোনো বৈধতা নেই।

এর বিপরীতে আরেক সীমালংঘন এই হয় যে, যে সীট চারজন লোকের বসার জন্যে নির্ধারিত, তার মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি জোর করেই নিজেকে ঢুকানোর চেষ্টা করে এবং পূর্ব থেকে উপবিষ্ট লোকদেরকে চেপে বসে তাকে জায়গা দিতে বাধ্য করে। ফল এই দাঁড়ায় যে, যে সমস্ত লোক পূর্ব থেকে বৈধ এবং যথার্থভাবে নিজের জায়গায় উপবিষ্ট ছিলো, তারা সংকুচিত অবস্থায় কষ্টের সাথে সফর করতে বাধ্য হয়। এমন পরিস্থিতিতে তারা নিজেরা যদি ত্যাগ স্বীকার করে নব আগন্তুককে জায়গা করে দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই এটা উঁচু মনের কাজ হবে এবং সওয়াবের কারণ হবে, কিন্তু কোনো নব আগন্তুকের এ অধিকার নেই যে, সে তাদেরকে এই উঁচু মনের পরিচয় দানে বাধ্য করবে।

আমরা দ্বীনকে শুধুমাত্র নামায-রোযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি, বিধায় এ জাতীয় আচরণ করতে এ কথা মনেও হয় না যে, আমরা গোনাহের কাজ করছি। অথচ যে কাজ দ্বারা অন্যের হক নষ্ট হয়, অথবা অন্যায়ভাবে অন্যে কষ্ট পায় তা হারাম। এমন হারাম যে, তার গোনাহ শুধুমাত্র তওবা করার দ্বারা মাফ হয় না, যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি মাফ না করবে, যার হক নষ্ট করা হয়েছে।

বাহ্যত এগুলো ছোটখাট বিষয়, কিন্তু এ সমস্ত ছোট ছোট বিষয় দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের রুচি ও প্রকৃতি বিগড়ে যায়। আর যখন কোনো সমাজের মেজাজ বিগড়ে যায়, তখন এমন সব কিছুই হয়ে থাকে, যার জন্যে আজ আমরা সবাই অশ্রু বিসর্জন করছি। কিন্তু তখন লাভ হয় না কারো, ক্ষতি হয় সবার। আরাম কারো ভাগ্যে জোটে না, কিন্তু কষ্ট হয় সবার।

এর বিপরীতে আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, যার সঙ্গে আমার ক্ষণিকের সাহচর্য লাভ হবে, তাকে সুখ-সুবিধা দানের জন্যে আমি কিছুটা কষ্ট স্বীকার করবো। তাহলে এই কষ্ট তো হবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে, যা খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের ত্যাগের চিত্র আমাদের সাথীর অন্তর থেকে সহজে মুছে যাবে না।

আর সবচে' বড়ো কথা হলো, এতে মহান আল্লাহ খুশি হবেন। আমাদের এই সামান্য কষ্ট ইনশাআল্লাহ সেখানকার সঞ্চয় হবে, যেখানে টাকা-পয়সার সঞ্চয় কাজে আসবে না। আর এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজের মেজাজও পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। তখন আমরা পরস্পরের জন্যে আপাদমস্তক রহমত ও অনুকম্পা হতে পারবো।

১২ জুমাদাল উলা, ১৪১৬ হিজরী
৮ অক্টোবর, ১৯৯৫ ঈসায়ী

প্রত্যেক সংবাদ যাচাই করা জরুরী*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ[1]

শ্রদ্ধেয় সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ভাইগণ! কয়েক জুমা ধরে সূরা হুজরাতের তাফসীর চলছে। যার মধ্যে আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা আমাদের সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দান করেছেন। এ সূরারই একটি আয়াত এখন আমি আপনাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করেছি। এ আয়াতের তরজমা এই যে, হে ঈমানদারগণ! কোনো পাপী ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ নিবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক কথার উপর বিশ্বাস করে কোনো পদক্ষেপ নিবে না। বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করার অর্থ হলো, বিষয়টি যাচাই করবে যে, এ সংবাদ বাস্তবিক সত্য কি না? তোমরা যদি এমনটি না করো তাহলে হতে পারে যে, অজ্ঞতার ভিত্তিতে তোমরা কিছু

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১৬, পৃঃ ২৬৮-২৮৪, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. হুজরাত : ৬

মানুষকে কষ্ট দিবে। পরবর্তীতে তোমাদের নিজেদের কর্মের কারণে লজ্জা ও অনুতাপ হবে যে, আমরা এ কি কাজ করলাম! এটা হলো আয়াতের তরজমা। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমানকে এ হেদায়েত দান করেছেন যে, তারা প্রত্যেক শোনা কথার উপর ভরসা করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, বরং যে সংবাদ পাবে তা পুরোপুরি যাচাই না করা এবং সঠিক প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার ভিত্তিতে কোনো কথা বলা জায়েয নেই এবং তার ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নেই।

আয়াতের শানে নুযূল

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, পবিত্র এই আয়াত বিশেষ এক ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো, পরিভাষায় যাকে 'শানে নুযূল' বলা হয়। ঘটনা হয়েছিলো এই যে, আরবে বণু মুস্তালিক নাকে এক গোত্রের বসবাস ছিলো। বণু মুস্তালিকের সর্দার হারেস বিন যাররার- যাঁর মেয়ে জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস উম্মাহাতুল মুমিনীনের একজন- তিনি নিজের এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হই। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং যাকাত আদায় করার হুকুম দেন আমি ইসলাম কবুল করি এবং যাকাত আদায়ের কথা স্বীকার করি। আমি আরো নিবেদন করি যে, আমি আমার কওমের মধ্যে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলামের এবং যাকাত প্রদানের দাওয়াত দিবো। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত প্রদান করবে তাদের যাকাত সংগ্রহ করবো। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার কোনো দূত পাঠিয়ে দিবেন, যাতে যাকাতের যেই অর্থ আমার কাছে জমা হবে তা তার কাছে দিয়ে দিতে পারি।

দূতের সংবর্ধনায় জনগণের বাইরে চলে আসা

ওয়াদা মতো হযরত হারেস বিন যাররার রাযি. ঈমানদারদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করলেন। দূত পাঠানোর নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো দূত পৌঁছলো না, তখন হযরত হারেস রাযি.-এর মনে এ আশঙ্কা জাগলো যে, হয়তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, অন্যথায় ওয়াদা মোতাবেক লোক না পাঠানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। হযরত হারেস রাযি. ইসলাম গ্রহণকারী সর্দারদের নিকট এ আশঙ্কার কথা

আলোচনা করলেন এবং এঁরা সকলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছা করলেন। কতক বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, বণু মুস্তালিক গোত্রের লোকদের জানা ছিলো যে, অমুক তারিখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত আসবে। ঐ তারিখে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক দূতকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে তারা জনপদের বাইরে চলে আসেন।

হযরত ওলীদ ইবনে উকবা রাযি.-এর ফিরে যাওয়া

অপরদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত তারিখে হযরত ওলীদ ইবনে উকবা রাযি.-কে নিজের দূত বানিয়ে যাকাত উসূল করার জন্যে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু হযরত ওলীদ ইবনে উকবা রাযি. পথের মধ্যে চিন্তা করেন যে, ঐ গোত্রের লোকদের সঙ্গে আমার পুরাতন শত্রুতা রয়েছে, তারা আবার আমাকে হত্যা করে না ফেলে। যেহেতু তারা স্বাগত জানানোর জন্যে জনপদের বাইরেও চলে এসেছিলো, এজন্যে হযরত ওলীদ ইবনে উকবার রাযি.-এর আরো দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এসব লোক হয়তো পুরাতন শত্রুতার কারণে আমাকে হত্যা করতে এসেছে। সুতরাং তিনি রাস্তা থেকেই ফিরে আসেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে, এজন্যে আমি ফিরে চলে এসেছি।

যাচাই করার ফলে বাস্তবতা প্রকাশ পায়

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে রাগান্বিত হন এবং মুজাহিদদের একটি বাহিনী হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি.-এর নেতৃত্বে পাঠিয়ে দেন। এদিকে মুজাহিদবাহিনী যাত্রা করে, ওদিকে হযরত হারেস ইবনে যাররার রাযি. নিজের সঙ্গীদের নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যখন তারা মুখোমুখি হন, তখন হযরত হারেস রাযি. জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্যে কেন এসেছেন? কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিলো যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোনো একজন যাকাত উসূল করার জন্যে আসবে। সৈন্যবাহিনীর লোকেরা উত্তর দিলো যে, যাকাত উসূল করার জন্যে এক ব্যক্তি এসেছিলো,

কিন্তু আপনারা তার উপর আক্রমণ করার জন্যে সৈন্যসমাবেশ ঘটান। বণু মুস্তালিকের লোকেরা উত্তর দেয় যে, আমাদের নিকট কোনো লোক আসেনি এবং আমরা সৈন্যসমাবেশও ঘটাইনি। বরং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূতকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে আমরা প্রতিদিন বাইরে এসে একত্রিত হতাম। তখন বাস্তবতা সামনে চলে আসে এবং হযরত খালেদ বিন ওলীদ রাযি. ফিরে এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো ঘটনা শুনান যে, এই ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। ফলে এ পরিস্থিতির অবসান ঘটে। এক্ষেত্রে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২]

শোনা কথার উপর বিশ্বাস করা উচিত নয়

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে কোনো দায়িত্বহীন ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে প্রথমে তা যাচাই করবে। যাচাই করা ছাড়া ঐ সংবাদের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। এ ঘটনায় যতো ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে তার কারণ এই হতে পারে যে, হযরত ওলীদ ইবনে উকবা রাযি.-কে কেউ এসে হয়তো বলেছে যে, এরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে একত্রিত হয়েছে। এর ফলে তিনি রাস্তা থেকেই ফিরে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে সবসময়ের জন্যে মুসলমানদেরকে হেদায়েত দেওয়া হয় যে, একটি কথা শুনে তার উপর বিশ্বাস করে সামনে চালিয়ে দেওয়া এবং তার ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হারাম।

ভিত্তিহীন প্রচার হারাম

একে বর্তমানের পরিভাষায় ভিত্তিহীন প্রচার বলে। আফসোস যে, আমাদের সমাজে এ মন্দ চরিত্র এতো মারাত্মকভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, আল্লাহ হেফাজত করুন! কোনো কথা সামনে প্রচার করতে ও বর্ণনা করতে কোনো প্রকার সতর্কতা ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রশ্নই নেই। কোনো উড়ো কথা কানে এলো অবিলম্বে তা সামনে চালিয়ে দিলো। বিশেষ করে যদি কারো সাথে বিরোধিতা থাকে, কারো সাথে শত্রুতা থাকে, কারো সাথে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংঘর্ষ থাকে, বা ব্যক্তিগত বিরোধ থাকে, আর তার সম্পর্কে সামান্য

---

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর খণ্ডঃ ৪, পৃঃ ২৬৫-২৬৬

কোনো কথাও কানে পড়ে তাহলে তাই বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যে ছড়াতে আরম্ভ করে।

বর্তমানের রাজনীতি

বর্তমানের নোংরা রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে ভিত্তিহীন কথা বানানো এবং বিনা যাচাইয়ে তা প্রচার করা আজকাল ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, যাচাই ছাড়া এই অপবাদ চাপিয়ে দিলো যে, অমুক ব্যক্তি এতো লক্ষ টাকা নিয়ে নিজের নীতি-আদর্শকে বিক্রি করে দিয়েছে। মনে রাখবেন! কোনো ব্যক্তি যতো খারাপই হোক না কেন, তার উপর মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দেওয়ার কোনো বৈধতা নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন করা হারাম।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের গীবত জায়েয নেই

এক মজলিসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বসা ছিলেন। এক ব্যক্তি সেখানে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিন্দা আরম্ভ করলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একজন জালেম শাসক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলো। বলা হয় যে, সে শত শত বড়ো বড়ো আলেমকে হত্যা করেছে। এক ব্যক্তি ঐ মজলিসের মধ্যে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের উপর দোষারোপ করে যে, সে এই কাজ করেছে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রাযি. বলেন, চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলো। এরূপ মনে করবে না যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জালেম হয়ে থাকলে তার গীবত করা হালাল বা তার উপর অপবাদ আরোপ করা হালাল। আল্লাহ তা'আলা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ থেকে শত শত মানুষের খুনের বদলা নিলে, তোমার থেকেও তার সম্পর্কে মিথ্যা বলার বদলা নিবেন। এরূপ মনে করবে না যে, সে জালেম বলে তার সম্পর্কে তুমি যা ইচ্ছা মিথ্যা বলতে থাকবে, মিথ্যা দোষারোপ করতে থাকবে, তোমার জন্যে এটা হালাল নয়।

শোনা কথা প্রচার করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত

মোটকথা, কারো সম্পর্কে যাচাই করা ছাড়া কোনো কথা বলা এতো বড়ো রোগ, যার দ্বারা পুরো সমাজে বিকৃতি ও বিপর্যয় ঘটে। শত্রুতার সৃষ্টি হয়, ঝগড়া বিবাদ হয়। এজন্যে কুরআনে কারীম বলছে যে, যখনই তুমি কোনো সংবাদ পাবে প্রথমে তা যাচাই করবে। একহাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

'মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, যা সে শোনে তাই বর্ণনা করতে আরম্ভ করে।'[৩]

এজন্যে যে ব্যক্তি যাচাই না করে সব শোনা কথাই বলে বেড়ায়, সেও মিথ্যুক। তারও মিথ্যা বলার গোনাহ হবে। তাই যাচাই না করে কোনো কথা বর্ণনা করবে না।

প্রথমে যাচাই করো তারপর মুখ দিয়ে বের করো

আফসোস যে, আজ আমাদের সমাজ এই গোনাহে নিমজ্জিত। কোনো ব্যক্তির কথা বর্ণনা করতে কোনো প্রকার সতর্কতা নেই। বরং নিজের পক্ষ থেকে তার মধ্যে লবণ-মরিচ লাগিয়ে আরো বাড়িয়ে বর্ণনা করা হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি শুনে সে নিজের পক্ষ থেকে আরো কিছু যোগ করে বর্ণনা করে। বিষয়টি ছিলো সামান্য, কিন্তু বিস্তৃত হতে হতে তা বিরাট হয়ে যায়। পরিণতিতে শত্রুতা, বিরোধ, ঝগড়া-বিবাদ, খুন-খারাবি ও ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। মোটকথা, কুরআনে কারীম আমাদেরকে এই সবক দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেই জিব দিয়েছেন, তা এ জন্যে দেননি যে, এর দ্বারা মিথ্যা কথা ছড়াবে। এজন্যে দেননি যে, এর দ্বারা তোমরা মানুষের উপরে মিথ্যা দোষারোপ করবে। বরং কোনো বিষয় পরিপূর্ণরূপে যাচাই না করে মুখ দিয়ে তা বের না করা তোমাদের জন্যে ফরয। আফসোস! আজ আমরা আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম ভুলে গিয়েছি। এর ফলে আমরা বিভিন্ন ধরনের মসিবতের শিকার হচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে এ গোনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন।

উড়ো কথায় কান দিবেন না

মানুষের কানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা পড়তে থাকে। একজন এসে এক খবর দেয়, আরেকজন এসে আরেক খবর শুনায়, আরেকজন আরেক কথা বলে। মানুষ যদি সবগুলো কথাকে সত্য মনে করে সে অনুপাতে পদক্ষেপ নিতে আরম্ভ করে, তাহলে ফেৎনা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। সুতরাং আরেক সময় এমন হয়েছিলো যে, মুনাফিকরা বিভিন্ন প্রকারের উড়ো কথা

---

৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৩৫০

ছড়াতো। সরলমনা মুসলমানগণ তাদের কথা সত্য মনে করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে আরেকটি আয়াত নাযিল হয়। তাতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

'আর যখন তাদের কাছে কোনো সংবাদ পৌছে নিরাপত্তা বা ভীতিকর, তখন তারা তা (যাচাই না করে) ছড়াতে আরম্ভ করে। যদি তারা এ সংবাদকে রাসূলের নিকট বা দায়িত্বশীলদের নিকট নিয়ে যেতো তাহলে তাদের মধ্যে যাচাইকারীগণ তার বাস্তবতা জানতে পারতো।'[৪]

অর্থাৎ মুনাফিকদের কাজ এই যে, সামান্য কোনো উড়ো কথা কানে পড়তেই- নিরাপত্তার অবস্থায় হোক বা যুদ্ধের অবস্থায়- তা প্রচার করতে আরম্ভ করে। নিজেদের পক্ষ থেকে তার মধ্যে লবণ-মরিচ লাগিয়ে ছড়িয়ে দেয়, ফলে ফেৎনা বিস্তার লাভ করে। মুসলমানদেরকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, এ ধরনের কোনো সংবাদ তোমাদের নিকট পৌছলে তার উপর নির্ভর না করে আল্লাহর রাসূলকে এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বলো যে, এ খবর ছড়াচ্ছে। এর মধ্যে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা যাচাই করুন এবং যাচাইয়ের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। নিজেদের পক্ষ থেকে এর উপর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। এটা একটা বিরাট হেদায়েত। কুরআনে কারীম যা দান করেছে।

যার থেকে কষ্ট পেয়েছেন, তাকে জিজ্ঞাসা করুন

আফসোস এই যে, আমাদের সমাজে এই হেদায়েতকে এড়িয়ে চলা হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন প্রকারের ফেৎনা ছড়িয়ে পড়ছে। ঝগড়া-বিবাদ চলছে, শত্রুতা হচ্ছে, হিংসা-বিদ্বেষ হচ্ছে, একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এসব কিছুর ভিত্তি উড়ো কথা। পরিবার বা ঘনিষ্ঠ জনদের মধ্যে থেকে কেউ বললো যে, তোমার ব্যাপারে অমুক একথা বলছিলো। এখন আপনি তার কথা শুনে বিশ্বাস করলেন যে, আচ্ছা অমুক ব্যক্তি আমার ব্যাপারে একথা বলেছে! এখন এর ভিত্তিতে

---

৪. নিসা ঃ ৮৩

অন্তরে তার প্রতি শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। অথচ একজন মুসলমানের কাজ এই যে, যদি কোনো ভাইয়ের পক্ষ থেকে অভিযোগের কোনো কথা পৌছে তাহলে সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করবে। আমি শুনেছি যে, আপনি আমার সম্পর্কে একথা বলেছেন। তা ঠিক কি না? তখন সঠিক বিষয় সামনে চলে আসবে।

কথাকে বাড়িয়ে বলা

আজকাল অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ একজনের কথা অন্যজন পর্যন্ত পৌছানোর ক্ষেত্রে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করে না। সামান্য বিষয়কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করে। নিজের পক্ষ থেকে তার মধ্যে যুক্ত করে। আমি একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এক ব্যক্তি আমার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে যে, টেপ রেকর্ডারে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত শুনলে সওয়াব হবে কি না? আমি জওয়াব দেই- যেহেতু কুরআনে কারীমের শব্দ পাঠ করা হচ্ছে তাই তা শুনলেও আল্লাহর রহমতে সওয়াব লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ। তবে সরাসরি পড়লে ও শুনলে অধিক সওয়াব লাভ হবে। এখন সে গিয়ে অন্য কাউকে বলেছে, দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে বলেছে, তৃতীয়জন ব্যক্তি চতুর্থজনকে বলেছে, ব্যাপার এতো দূর গড়ায় যে, একদিন আমার কাছে একজনের চিঠি আসে। তাতে সে লিখেছে- এখানে আমাদের মহল্লায় এক ব্যক্তি বয়ানের মধ্যে বলছিলো যে, মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব একথা বলেছেন যে, টেপ রেকর্ডারে তিলাওয়াত শোনা এমন, যেমন টেপ রেকর্ডারে গান শোনা। এখন আপনারা অনুমান করুন যে, কথাটি কি ছিলো? আর হতে হতে কতো দূর পৌছিয়েছে। তারপর প্রকাশ্য বক্তব্যে আমার দিকে সম্পৃক্ত করে বলা হচ্ছে যে, আমি একথা বলেছি। আমি উত্তরে লিখলাম যে, আমার ফেরেশতারাও জানে না যে, আমি একথা বলেছি।

মাপা কথা মুখ দিয়ে বের করবে

মোটকথা, কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সতর্কতা নেই। অথচ মুসলমানের কাজ হলো, যে কথা তার মুখ দিয়ে বের হবে তা পাল্লায় মাপা হতে হবে। এক শব্দ বেশিও নয়, এক শব্দ কমও নয়। বিশেষ করে আপনি যদি অন্যের কথা বর্ণনা করেন, সে ক্ষেত্রে আরো অধিক সতর্কতার প্রয়োজন।

কারণ, আপনি তার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বৃদ্ধি করলে অন্যের উপর অপবাদ দেওয়া হবে, তাতে দ্বিগুন গোনাহ হবে।

হযরাতে মুহাদ্দিসীনে কেরামের সতর্কতা

কুরআনে কারীম বলছে যে, যখন তুমি কোনো ব্যক্তির থেকে কোনো কথা শুনলে আর অবস্থা এই যে, মানুষ কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করছে না, তাহলে এমতাবস্থায় আরো অধিক সতর্কতা প্রয়োজন। যা শুনলে তাই বলবে না। হযরাতে মুহাদ্দিসীনে কেরাম- যাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ সংরক্ষণ করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন- তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, শব্দের মধ্যে সামান্যও হেরফের হলে তা বর্ণনা করতেন না। বরং বলতেন যে, এতোটুকু কথা আমার স্মরণ আছে, আর এতোটুকু স্মরণ নেই। অথচ অর্থ একই। কিন্তু তারপরেও বলতেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দ বলেছেন, বা এই শব্দ বলেছেন।

এক মুহাদ্দিসের ঘটনা

আপনারা শুনে থাকবেন যে, মুহাদ্দিসগণ যখন কোনো হাদীস বর্ণনা করেন তখন বলেন, حَدَّثَنَا فُلَانٌ অর্থাৎ, আমাকে অমুক এ হাদীস শুনিয়েছে। একবার এক মুহাদ্দিস যখন হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন حَدَّثَنَا فُلَانٌ এর পরিবর্তে ثَنَا فُلَانٌ বলছিলেন। লোকেরা বললো যে, হযরত ثَنَا فُلَانٌ এর তো কোনো অর্থ নেই। আপনি حَدَّثَنَا فُلَانٌ কেন বলছেন না? তিনি উত্তর দিলেন- আমি যখন ওস্তাদের দরসে পৌঁছি, তখন আমি তাঁর মুখ থেকে ثَنَا فُلَانٌ শব্দ শুনেছিলাম। প্রথমের حَدَّ শব্দ শুনতে পাইনি। এজন্যে আমি ثَنَا فُلَانٌ শব্দ দিয়ে হাদীস শুনাচ্ছি। অথচ এটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, ওস্তাদ حَدَّثَنَا فُلَانٌ-ই বলেছিলেন, শুধু ثَنَا فُلَانٌ বলেননি। কিন্তু যেহেতু নিজের কানে শুধু ثَنَا فُلَانٌ শুনেছিলেন حَدَّثَنَا فُلَانٌ শুনেননি, এজন্যে বর্ণনা করার সময় حَدَّثَنَا فُلَانٌ বলতেন না। যাতে

মিথ্যা হয়ে না যায়। যতোটুকু শুনেছি, ততোটুকুই বর্ণনা করবো। এমন সতর্কতার সাথে মুহাদ্দিসীনে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

হাদীসের বিষয়ে আমাদের অবস্থা

আজ আমাদের অবস্থা এই যে, শুধু সাধারণ কথা-বার্তায় নয়, বরং হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। হাদীসের শব্দ ছিলো কিছু, আর মানুষ বর্ণনা করে যে, আমি শুনেছি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন। অথচ এ হাদীসের কোথাও অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। যাচাই না করে বর্ণনা করে।

সরকারের উপর অপবাদ দেওয়া

আজ রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে এবং ধর্মীয় দলাদলির মধ্যে এ বিষয় ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, একে অপরের উপর অপবাদ দিতে কোনো প্রকার ভর-ভয় অনুভব করে না। সামান্য কিছু শুনেই তা বর্ণনা করে দেয়। সরকারের প্রতি অসন্তুষ্টি রয়েছে, সরকারের বিরুদ্ধে ভিতরে ক্ষোভ রয়েছে, এজন্যে তার বিরুদ্ধে যে সংবাদ পায় তাই ছড়িয়ে দেয়। এটা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করে না যে, কথাটা ঠিক না অঠিক।

মনে রাখবেন সরকারের মধ্যে হাজার দোষ থাকুক, কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে, আপনি তার উপর অপবাদ দিতে শুরু করবেন। আফসোস এই যে, একই আচরণ আজ সরকার জনসাধারণের সঙ্গে করছে। সরকারের বড়ো মাপের দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যিনি পুরো দেশের দায়িত্বশীল, তিনি মানুষের উপর অপবাদ দিতে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ করেন না।

মাদরাসার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হওয়ার অপপ্রচার

আজকাল প্রোপাগাণ্ডা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। জার্মানির এজন রাজনীতিবিদ দার্শনিক ছিলেন। তিনি এই দর্শন পেশ করেছিলেন যে, মিথ্যাকে এতো তীব্রভাবে প্রচার করতে থাকো, যেন দুনিয়া তা সত্য মনে করতে আরম্ভ করে। আজ দুনিয়াতে সমস্ত প্রোপাগাণ্ডার উৎকর্ষতা এই দর্শনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। যার উপর যা ইচ্ছা অপবাদ লাগিয়ে তার সম্পর্কে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ পৃথিবীতে এ প্রোপাগাণ্ডা

আরম্ভ হয়েছে যে, মাদরাসাগুলো সন্ত্রাসী তৈরী করে। মাদরাসাতে ছাত্রদেরকে সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখান থেকে সন্ত্রাসী বের হয়। এই প্রোপাগাণ্ডা তিন বছর হলো আরম্ভ হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ নয়, বরং সরকারের দায়িত্বশীলগণ প্রকাশ্যে বলছে যে, মাদরাসাগুলোতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হচ্ছে। মাদরাসাকর্তৃপক্ষ তাদেরকে একাধিকবার বলেছে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে মাদরাসার ভিতরে এসে দেখুন। আপনাদের নিকট অস্ত্র উদঘাটনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি রয়েছে, সন্ত্রাস উদঘাটনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপকরণ রয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করে দেখুন- কোনো মাদরাসার মধ্যে সন্ত্রাসের কোনো কিছু পান কি না। কোনো মাদরাসার মধ্যে এর অস্তিত্ব পাওয়া গেলে আমাদের পক্ষ থেকে সাধারণ অনুমতি রয়েছে যে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমরাও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে আপনাদের সহযোগিতা করবো। কিন্তু এই অপপ্রচার চালিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মাদরাসাগুলো সন্ত্রাসী তৈরী করে। এই অপপ্রচারের ভিত্তিতে সমস্ত দ্বীনি মাদরাসা- যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কালাম শিক্ষা দেওয়া হয়- তাদেরকে সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করা এবং পশ্চিমাদের প্রোপাগাণ্ডাকে বিস্তৃত করা কি করে ইনসাফ ও সাধুতার কথা হতে পারে?

মাদরাসাসমূহ পরিদর্শন করুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অপরাধপ্রবণ লোক ঢুকে পড়ে। ইউনিভার্সিটি ও কলেজসমূহে কি অপরাধী নেই? এমতাবস্থায় ঐ সব অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একথা বলা হয় না যে, সব ইউনিভার্সিটি সন্ত্রাসী, সব কলেজ অপরাধী। 'মিথ্যাকে এতো তীব্রভাবে প্রচার করো, যেন দুনিয়ার মানুষ তা সত্য মনে করতে আরম্ভ করে'- এই মূলনীতির ভিত্তিতে পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে যেহেতু অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তাই আজ দ্বীনি মাদরাসা এবং সন্ত্রাসকে এভাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, একটি অপরটির সমার্থক হয়ে গিয়েছে। কুরআনে কারীম বলে যে, এমন যেন না হয় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো জাতির অহেতুক ক্ষতি করলে। তাহলে পরবর্তীতে তোমাদের লজ্জিত হতে হবে। এজন্যে প্রথমে যাচাই করো। যাচাইয়ের সমস্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি তোমাদের রয়েছে। এসে দেখো। মাদরাসার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারী তারা, যারা আজ পর্যন্ত মাদরাসার চেহারা দেখেনি। এসে দেখেনি যে, সেখানে কি হচ্ছে? সেখানে কী পড়ানো হচ্ছে? কীভাবে শিক্ষা

দেওয়া হচ্ছে? অথচ মাদরাসার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালু আছে, যা বন্ধ করার কোনো নাম নেই।

মিথ্যা কল্পনার ভিত্তিতে অপবাদ দেওয়া

লন্ডনের লোকেরা বলেছে- এখানে যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে তাতে এমন এক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে, যে সেখানের মাদরাসায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলো। আরে ভাই! সে ব্যক্তি সেখানেই বড়ো হয়েছে, সেখানেই বৃটেনের কোনো মাদরাসাতে নয়, বরং মডার্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেছে। একথা যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, সে কয়েক দিনের জন্যে পাকিস্তান এসেছিলো। পাকিস্তান আসার দ্বারাই কি এটা আবশ্যক হয়ে যায় যে, সে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই শিক্ষা লাভ করেছে এবং সেখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। এর ভিত্তিতে কাল্পনিকভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে তার ভিত্তিতে রাজ-হুকুম জারী করা হয়েছে যে, যতো বিদেশী ছাত্র মাদরাসায় পড়ে তাদেরকে দেশ থেকে বিদায় করে দেওয়া হোক।

প্রথমে সংবাদ যাচাই করুন

আমার ভাইগণ! এটা আমাদের সমাজের এমন একটা সমস্যা যে, জনসাধারণ হোক বা সরকার, রাজনৈতিক পার্টি হোক বা ধর্মীয় দল, সবাই এর মধ্যে আক্রান্ত যে, কানে কোনো উড়ো কথা পড়লেই তা কেবল বিশ্বাসই করে না, বরং তা প্রচার করে এবং তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলে সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার করা হয়েছে। অথচ কুরআনে কারীম এ আয়াতে এই পয়গাম দিয়েছে যে, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট কোনো দায়িত্বহীন ব্যক্তি কোনো খবর নিয়ে এলে প্রথমে তা যাচাই করো। এমন যেন না হয় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা মানুষের ক্ষতি করলে। ফলে তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হলো। আমরা যদি কুরআনে কারীমের এই হুকুম মোতাবেক চলি এবং জীবনের প্রত্যেক শাখায় একে ব্যবহার করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সমাজের নব্বই শতাংশ বিবাদ মিটে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে কুরআনে কারীমের এ হেদায়েতকে বোঝার এবং সে অনুপাতে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ন্যায়সঙ্গতভাবে অন্যের সঙ্গ দাও*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ اِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞[১]

শ্রদ্ধেয় সুধীমন্ডলী ও প্রিয় ভাইগণ! এখন আমি আপনাদের সম্মুখে সূরা হুজরাতের দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। বিগত কয়েকমাস ধরে সূরা হুজরাতের তাফসীরের ধারা চলে আসছে। মাঝে সাময়িক প্রয়োজনে এ ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। আমি দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। প্রথমে সেগুলোর তরজমা পেশ করছি, তারপর তার সামান্য ব্যাখ্যা তুলে ধরবো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টি মতো বয়ান করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খন্ডঃ ১৬, পৃঃ ৩০৮-৩১৮, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. হুজরাত ঃ ৯-১০

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে যদি বিবাদ হয়, তাহলে অন্যান্য মুসলমানের জন্যে হুকুম হলো, তারা তাদের মধ্যে আপোস করাবে। অর্থাৎ যখন মুসলমানদের দুটি দল পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন অন্যান্য মুসলমানের দায়িত্বে সর্বপ্রথম যেই কাজ জরুরী তা এই যে, উভয় দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করে সন্ধি করাবে। যথাসাধ্য তাদেরকে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। এভাবে যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে তো খুবই ভালো, উদ্দেশ্য লাভ হলো।

অন্যথায় মাজলুমকে সঙ্গ দাও

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰٓى أَمْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যদি বলা-কওয়ার মাধ্যমে ঝগড়া বন্ধ না হয় এবং আপোসের কোনো পন্থা দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহলে এটা দেখবে যে, তাদের মধ্যে মাজলুম কে এবং জালেম কে? কে অত্যাচার করছে, আর কে অত্যাচারের শিকার হচ্ছে? যদি এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের মধ্যে একটি দল অত্যাচার করছে এবং জুলুম করছে, তখন তোমাদের উপর ফরয মাজলুমকে সঙ্গ দেওয়া এবং জালেমের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যখন আপোসের চেষ্টা কার্যকর হবে না, তখন জালেমকে প্রতিহত করা এবং মাজলুমের পক্ষে দাঁড়ানো প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। আল্লাহর হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জালেমের সঙ্গে লড়তে থাকবে।[২]

বংশ বা ভাষার ভিত্তিতে সঙ্গ দিও না

এখানে হাদীস শরীফের আলোকে দুটি বিষয় বুঝে আসে। এক. কুরআনে কারীম পুরো বিষয়টির ভিত্তি রেখেছে এটা দেখার উপর যে, কে ন্যায়ের উপরে আছে, আর কে অন্যায়ের উপর। কে জালেম, আর কে মাজলুম? এ ভিত্তিতে কারো সঙ্গ দিও না যে, সে আমার দেশী, সে আমার ভাষাভাষি, বা সে আমার দলের লোক। এর ভিত্তিতে সঙ্গ দিও না। বরং সঙ্গ দেওয়া বা লড়াই করা উভয়টা এই ভিত্তির উপর হওয়া উচিত যে, কে জালেম, আর কে

---

২. হুজরাত : ৯

মাজলুম। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে যেই চিন্তা মাথায় চলে আসছে- আফসোস এই যে, আজও তা মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান- তা হলো, যে ব্যক্তি আমার বংশের লোক, সে আমার লোক। যে আমার ভাষায় কথা বলে, সে আমার। যে কোনো মূল্যে আমাকে তাকে সঙ্গ দিতে হবে। এটা দেখবে না যে, সে জালেম, না মাজলুম। সে ন্যায়ের উপর আছে, না অন্যায়ের উপর। এটা জাহেলিয়াতের চিন্তাধারা। যার সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- আজ আমি এ চিন্তা-ধারাকে আমার পায়ের নিচে পদদলিত করলাম। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, আজও আমাদের মধ্যে এ অবস্থা বিদ্যমান যে, মানুষ নিজের ভাষার ভিত্তিতে, নিজের বংশের ভিত্তিতে এবং নিজের দেশের ভিত্তিতে দল বানিয়ে নিয়েছে এবং মনে করছে যে, যে কোনো মূল্যে আমাকে এর সঙ্গ দিতে হবে।

এমন চুক্তির অনুমতি নেই

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ[৩]

অর্থাৎ, জাহেলিয়াতের যুগে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হতো যে, যে কোনো মূল্যে আমি তোমাকে সঙ্গ দিবো, ইসলামে এ ধরনের চুক্তির কোনো সুযোগ নেই। একজন মুমিনের কাজ হলো, সে ন্যায় ও অন্যায় দেখবে এবং জালেম ও মাজলুমকে চিনবে। যদি তুমি দেখো যে, মুসলমান জুলুম করছে তাহলে এই জুলুম থেকে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা তোমার উপর ফরয।

জালেমকে জুলুম থেকে বাধা দাও

একদিকে তো এই মূলনীতি বলেছেন যে, জালেমকে সঙ্গ দিও না, বরং মাজলুমের পক্ষ অবলম্বন করো। সেই জালেম তোমার বংশের হোক, তোমার দেশের হোক, বা তোমার ভাষাভাষি হোক। এই মূলনীতি বর্ণনার পর একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময়কর এই বক্তব্য দিলেন যে,

---

৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৩০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৯৩, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৩৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৬৭

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

'নিজের ভাইয়ের সাহায্য করো, সে যদি জালেম হয় তবুও সাহায্য করো, আর যদি মাজলুম হয় তবুও সাহায্য করো।'[৪] সাহাবায়ে কেরাম এ কথা শুনে খুবই অবাক হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! মাজলুমকে সাহায্য করা তো বুঝে আসে, আমরা মাজলুমকে সাহায্য করবো, কিন্তু জালেমকে সাহায্য করার অর্থ কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, জালেমের সাহায্য এই যে, তাকে জুলুম থেকে প্রতিহত করবে।

যেহেতু সে জুলুম করার কারণে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে, নিজের আখেরাত বরবাদ করছে, আল্লাহ তা'আলার গযব মাথা পেতে নিচ্ছে, এখন তাকে সাহায্য করা এই যে, তাকে জুলুম থেকে বাধা দাও। তাকে বলো যে, তুমি যে পথে চলছো, তা জুলুমের পথ, দোযখের পথ, এথেকে বাঁচো। মানুষকে জাহান্নামে যাওয়া থেকে বাধা দেওয়া এবং আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে বাঁচানো হলো প্রকৃত সাহায্য।

উভয়ের মধ্যে আপোস করিয়ে দাও

পবিত্র আয়াত যেই মূলনীতি বর্ণনা করেছে তা এই যে, মানুষ দেখবে জালেম কে, আর মাজলুম কে। জালেম যদি তার জুলুম থেকে ফিরে না আসে তাহলে তোমার উপর ফরয তার সঙ্গে লড়াই করা। যতোক্ষণ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। এরপর বলেন, যদি সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে অর্থাৎ তোমার কথা শোনে এবং জুলুম ছেড়ে দেয়, তাহলে এমতাবস্থায় এই দুই দলের মধ্যে আপোস করিয়ে দাও। জালেম অস্ত্র সমর্পন করলো এবং জুলুম থেকে ফিরে এলো, কিন্তু উভয় দলের অন্তরের মধ্যে এখনো ক্লেদ রয়েছে। এই ক্লেদ দূর করার জন্যে ইনসাফের সাথে উভয়ের মধ্যে আপোস করিয়ে দাও। এ কারণে যে, দুই দলের মধ্যে যখন বিবাদ হয় এবং উভয় পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হয়, তখন মোটের উপর একদল হকের উপর এবং অপরদল অন্যায়ের উপর থাকলেও লড়াইয়ের সময় উভয়ের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, একহাতে তালি বাজে না। মাজলুম ব্যক্তির পক্ষ থেকেও কোনো না

৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৬৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৮১, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২১৮১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১১৫১১

কোনো ভুল অবশ্যই হয়েছে, যে কারণে লড়াইয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই জালেম যখন তার জুলুম থেকে ফিরে এলো, এবার প্রত্যেক দলকে ন্যায়সঙ্গতভাবে তার ভুল বুঝানোর চেষ্টা করো যে, তোমার এই অবস্থান ঠিক ছিলো, কিন্তু অমুক কথাটি ভুল ছিলো। আগামীতে তা থেকে বিরত থাকবে। এজন্যে সম্মুখে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপোস করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারকারীদেরকে পছন্দ করেন। প্রথম আয়াতে এই মূলনীতি বর্ণনা করেছেন।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি ঈমানের উপর

এরপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরচে' বড়ো মূলনীতি বর্ণনা করেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

'সব ঈমানদার পরস্পরে ভাই ভাই।'

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখে, আল্লাহর কিতাবের উপর এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, সে-ই তোমার ভাই। এর মাধ্যমে এই মূলনীতি বলেছেন যে, ইসলামে যেই ভ্রাতৃত্ব রয়েছে, তা মূলত ঈমান ও আকীদার ভিত্তিতে। বর্ণ, বংশ, দেশ ও গোত্রের ভিত্তিতে নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অহমিকা, গর্ব ও অহংকারের সমস্ত উপকরণ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন,

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

'কোনো আরবের কোনো আজমের উপর কোনো প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোনো সাদার কোনো কালোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কারো ফযীলত থাকলে তা কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে রয়েছে।'[৫]

যে মুত্তাকী সে শ্রেষ্ঠ, সে একটি সাধারণ গোত্রের লোক হলেও। যে মুত্তাকী নয়, বাহ্যিকভাবে তার খুব শান-শওকত দেখা গেলেও সে অন্যদের তুলনায় নিকৃষ্ট।

---

৫. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২৩৯১

মুসলমানকে নিঃস্বভাবে ছেড়ে দিবে না

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মূলনীতি যেমন বলেছেন যে, সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই, তেমনি তার ফলাফলও নিজেই বলেছেন যে,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

'প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তাই এক মুসলমান অন্য মুসলমানের উপর জুলুম করবে না এবং তাকে নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে দিবে না।'[৬]

তার উপর জুলুম অত্যাচার হতে থাকলে তাকে জালেমের দয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া মুসলমানের কাজ নয়। বরং তোমার উপর ফরয তার সঙ্গ দেওয়া, তাকে সাহায্য করা। এটা কেবল নৈতিক নির্দেশনা নয়, বরং তোমার ধর্মীয় দায়িত্ব যে, তোমার সাধ্য মতো জুলুম থেকে রক্ষা করবে।

ধনী সমাজের অবস্থা

আজ আমাদের সমাজে এই দৃশ্য দেখা যায় যে, যারা গরীব কিসিমের লোক, তারা তো একে অপরের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত হয়, কিন্তু ধনী সমাজের মধ্যে কারো এর পরোয়াই নেই যে, আমার প্রতিবেশীর কি অবস্থা হচ্ছে? তার উপর দিয়ে কি পরিস্থিতি অতিবাহিত হচ্ছে? বরং প্রত্যেকে নিজের অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত। একবার আমি নিজে এই দৃশ্য দেখেছি যে, একটি কার এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। লোকটি সড়কের উপর পড়ে যায়। গাড়িওয়ালা তাকে আঘাত করে চলে যায়। সে এ কথা চিন্তা করে না যে, আমার দ্বারা সীমালঙ্ঘন হয়েছে, তাই আমার কর্তব্য, তাকে কিছু চিকিৎসা বাবৎ সাহায্য করা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে, একজন মুমিনের এ কাজ নয় যে, সে অন্য মুমিনকে নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে, বরং যেখানে সুযোগ আছে এবং যতোটুকু সাধ্য আছে, অন্য মুমিনকে সাহায্য করবে।

যাই হোক, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

---

৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৬২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৫০, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৪৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৪৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৫১০৩

সমস্ত মুমিন পরস্পরে ভাই, সে তোমার ভাষায় কথা না বললেও এবং তোমার বংশের লোক না হলেও। যদি মুমিন হয়ে থাকে তাহলে সে তোমার ভাই।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার সম্পর্ক

আল্লাহ তা'আলা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার এমন মজবুত সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন যে, এটা কোনো ভাষার মুখাপেক্ষী নয়। আমি ঐ দৃশ্য কখনোই ভুলতে পারি না যে, আজ থেকে প্রায় পনের-বিশ বছর পূর্বে আমার চীনে যাওয়ার সুযোগ হয়। সে সময় চীনে বাইরের লোকদের নতুন আসা-যাওয়া শুরু হয়েছিলো। এখনো সেখানে বিরাট সংখ্যক মুসলমানের বাস রয়েছে। মুসলমানদের একটি অঞ্চল দিয়ে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়। তখন সেখানে তুষার পড়ছিলো। তাপমাত্রা ষোল ডিগ্রি মাইনাস ছিলো। ফজরের সময় আমাদের এক এলাকা অতিক্রম করতে হয়। সেখানে মুসলমানদের অধিবাস রয়েছে। ঐ অঞ্চলের মুসলমানরা জানতে পারে যে, পাকিস্তানের মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল আসছে। সুতরাং তারা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকে পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্যে তুষারপাতের মধ্যে শুধুমাত্র বাইরের মুসলমানদেরকে এক ঝলক দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলো। যখন আমাদের কাফেলা তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তখন তাদের মুখে শুধু একটি শ্লোগান ছিলো- 'আসসালামু আলাইকুম'। সালাম করতেই তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিলো। কারণ, তারা জীবনে এই প্রথম বাইরের কোনো মুসলমানের চেহারা দেখছিলো। আমি চিন্তা করছিলাম যে, আমরা না তাদের ভাষা জানি, না তাদের সাথে কথা বলতে পারি, না এরা আমাদের কথা বুঝবে, না আমরা এদের কথা বুঝবো। পারিবারিকভাবে, বংশীয়ভাবে, ভাষার দিক থেকে তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু শুধু এ জন্যে অন্তরে ভালোবাসার সাগর তরঙ্গায়িত হচ্ছিলো যে, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করে। إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ-এর এক দৃশ্য আল্লাহ তা'আলা সেখানে আমাকে দেখিয়েছেন।

কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরত্বের ফল

মন-মগজে যদি একথা বসে যায় যে, প্রত্যেক মুসলমান আমার ভাই, তাহলে না জানি কতো ঝগড়া, কতো ফাসাদ, কতো লড়াই ও কতো

হত্যাকাণ্ড খতম হয়ে যায়। আফসোস এই যে, আজ আমরা এ শিক্ষা ভুলে যাচ্ছি। আজ মুসলমান মুসলমানের গলা কাটছে। আজ মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ। আজ মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করার চিন্তায় লিপ্ত। মাযহাবের নামে, দ্বীনের নামে, ইবাদতের নামে এসব কাজ হচ্ছে। ইবাদতখানাও নিরাপদ নয়। সেগুলোর উপরও আক্রমণ করা হচ্ছে। এসব বিপর্যয় একারণে হচ্ছে যে, আজ আমরা কুরআনে কারীমের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

মুসলমানকে হত্যা করার শাস্তি

আজ আমরা অভ্যাসগত কিছু ইবাদতের নাম দিয়েছি দ্বীন। কিন্তু দ্বীনের বিস্তৃত যেই শিক্ষা কুরআনে কারীম আমাদেরকে দান করে, আমরা তা থেকে কেবল গাফেলই নই, বরং তাকে দ্বীনের অংশ বলে স্বীকার করতেও প্রস্তুত নই। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا

'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে জেনে-শুনে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, তার মধ্যে সে চিরদিন অবস্থান করবে।'[৭]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

'যদি কোনো ব্যক্তি কোনো একজন মানুষকে কাউকে হত্যা করা বা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ব্যতীত হত্যা করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি এমন, যেমন কি না সে সমস্ত মানুষকে হত্যা করেছে।'[৮]

যেই দ্বীনের মধ্যে এমন সব হেদায়েত রয়েছে, সেই দ্বীনের অনুসারী হয়ে একে অপরকে হত্যা করার কাজে জড়িত। এতো বড়ো আপদ আজ আমাদের উপর চেপে বসেছে! আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে এ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন।

এসময় কাউকে সঙ্গ দিবে না

এ সম্পর্কে শেষ কথা এই বলছি যে, কুরআনের আয়াতে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, জালেমের পক্ষ অবলম্বন করবে না, বরং মাজলুমের পক্ষ অবলম্বন

৭. নিসা ঃ ৯৩
৮. মায়েদা ঃ ৩২

করবে এ হুকুম তখন, যখন একথা স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, এ ব্যক্তি ন্যায়ের উপর আছে এবং অপর ব্যক্তি আছে অন্যায়ের উপর। তখন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে সঙ্গ দেওয়া ফরয। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, সেখানে হক পরিষ্কার হয় না। যেমন দুই দল পরস্পরে লড়ছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে, কে হকের উপর, আর কে বাতিলের উপর আছে? এমন অবস্থা সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইরশাদ করেছেন যে, এমন এক সময় আসবে, যখন দুই দল পরস্পরে লড়বে এবং উভয় দলকে মুসলমান বলা হবে এবং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হবে যে, কে হকের উপর আছে, আর কে বাতিলের উপর? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, এসব লোক অন্ধ পতাকার নিচে লড়বে। এমন সময়ের ব্যাপারে তিনি এ হেদায়েত দিয়েছেন যে,

فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا

তোমরা সেসময় সমস্ত দল থেকে পৃথক থাকবে।[১] কাউকে সঙ্গ দিবে না। কাউকে সাহায্য করবে না। কারো বিরোধিতাও করবে না। বরং নীরব থেকে নিজের কাজ করতে থাকবে। কারণ, তোমরা যদি কাউকে সঙ্গ দাও, তখন এমন হতে পারে যে, কোনো মাজলুমের উপর তোমাদের পক্ষ থেকে জুলুম হয়ে গেলো। মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমতাবস্থায় পৃথক থাকার হুকুম দিয়েছেন এবং এমন অবস্থাকে ফেতনা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ফেৎনার সময় নিজের ঘরে বসে থাকো

ফেৎনা এরই নাম যে, মানুষের কাছে হক স্পষ্ট হবে না। এটা জানা যাবে না যে, হকের উপর কে আছে, আর বাতিলের উপর কে আছে? যদি হক স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা ফেৎনা নয়। আর যদি হক স্পষ্ট না হয় তাহলে তা ফেৎনা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেৎনা থেকে পৃথক থাকার হুকুম দিয়েছেন। বরং এ পর্যন্ত বলেছেন যে, নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকবে। বাইরে বের হয়ে বিবাদমান দলকে দেখবেও না। কারণ, ফেৎনা এমন জিনিস, তার দিকে তুমি যদি দেখো, তাহলে ফেৎনা তোমাকে ছোঁ

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৩৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪৩৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৬৯

মেরে নিয়ে যাবে। এজন্যে তা থেকে দূরে থাকো। আমাদের দেশে অনেক ঝগড়া, অনেক বিবাদ বিশেষ করে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এমন হয়ে থাকে যে, সাধারণত সেগুলোতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ এই যে, এ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদের সকলকে এসব বিধান এবং শিক্ষার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বান্দার হক থেকে তওবা করার পদ্ধতি*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ،

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ!

এক মালফুযে হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন, 'আ'মালে সালেহা' (সৎকর্ম) কিংবা তওবা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার হক মাফ হয় না। সুতরাং যতোদূর সম্ভব (বান্দার হক) আদায় করবে এবং সবটুকু শোধ করার পরিপক্ক সংকল্প রাখবে। যদি কিছু অনাদায়ী থেকে যায় এবং সে অবস্থায় মারা যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশা রয়েছে যে, তিনি দায়মুক্ত করে দেবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মাজলুমকে খুশি করে জালেমের মাগফিরাত করে দেবেন।'[১]

গোনাহে সগীরা মাফ করার পদ্ধতি

এই মালফূযে হযরত থানভী রহ. প্রথমে একথা বর্ণনা করেন যে, আ'মালে সালেহা অর্থাৎ, সৎকর্ম দ্বারা গোনাহ মাফ হয় এবং তওবা দ্বারাও মাফ হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যে এই যে, নেক আমল দ্বারা শুধু গোনাহে সগীরা মাফ হয়, আর তওবা দ্বারা গোনাহে কবীরাও মাফ হয়। গোনাহে সগীরা আল্লাহ তা'আলা নেক কাজের বদৌলতে এমনিতেই মাফ করে থাকেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে যে, মানুষ যখন ওযু করে এবং হাত ধোয়, তখন হাত দ্বারা কৃত গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। চেহারা ধোয়ার দ্বারা চোখ দ্বারা কৃত গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। পা ধোয়ার দ্বারা চলাফেরার সময় হওয়া গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। অবশ্য উক্ত হাদীসে বর্ণিত গোনাহ দ্বারা গোনাহে সগীরা উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ পাক এভাবে মাফ করে থাকেন।

---

* ইসলাহী মাজালিস, খণ্ডঃ ৬, পৃঃ ৫২-৭০, যোহরের নামাযের পর, রমাযানুল মোবারক, জামে মসজিদ দারুল উলূম, করাচী

১. আনফাসে ঈসাঃ ১৯৮ পৃষ্ঠা

ইবাদত দ্বারা গোনাহে সগীরা মাফ হয়ে যায়

হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষ যখন নামায পড়ার জন্যে মসজিদে যায় তখন প্রতিটি কদমে আল্লাহ পাক গোনাহ মাফ করে দেন। এর দ্বারাও উদ্দেশ্য সগীরা গোনাহ। এভাবে নামায পড়ার দ্বারাও সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

একবার জনৈক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মারাত্মক ভুল করে ফেলিছি। পরে একটি গোনাহে সগীরার কথা বর্ণনা করে বললেন, আমার থেকে গোনাহটি হয়ে গিয়েছে।

তিনি ইরশাদ করলেন, ঐ গোনাহের পরে তুমি কী আমার সাথে মসজিদে নামায পড়োনি?

তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায তো পড়েছি। ইরশাদ হলো, ব্যস, নামায পড়ার দ্বারা তোমার ঐ গোনাহ মাফ হয়ে গিয়েছে। পরে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন,[২]

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

'নেক কাজ বদ কাজকে খতম করে দেয়।'[৩]

মানুষ নেককাজ করামাত্রই তার গোনাহে সগীরা মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার রহমতের ব্যবস্থাপনা এমনই যে, গোনাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমা হতে থাকে। তবে এগুলো সবই সগীরা গোনাহের বেলায় প্রযোজ্য।

গোনাহে কবীরার জন্যে তওবা জরুরী

কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। তবে আল্লাহ পাক স্বীয় করুণা বলে তওবা ব্যতিরেকে যদি কাউকে মাফ করে দেন, সেটা রুখবে কে? কিন্তু নিয়ম ও পদ্ধতি এই যে, গোনাহে কবীরা তওবা ছাড়া মাফ হয় না। উক্ত বাণীতে হযরত থানভী রহ. যে বলেছেন, 'আ'মালে সালেহা' বা 'তওবা' দ্বারা গোনাহ মাফ হয়ে যায়- এর মর্ম এই যে, আ'মালে সালেহা দ্বারা সগীরা গোনাহ, আর তওবা দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

---

২. সহীহ বুখারীঃ হাদীসঃ ৪৯৫,সহীহ মুসলিমঃ হাদীসঃ ৪৯৬৩, সুনানে তিরমিযীঃ হাদীসঃ ৩০৩৭, সুনানে ইবনে মাজাহঃ হাদীসঃ ১৩৮৮

৩. হুদ ঃ ১১৪

'বান্দার হক' এবং 'আল্লাহর কিছু হক' শুধু তওবা দ্বারা মাফ হয় না

তিনি আরো বলেন, কিন্তু 'আ'মালে সালেহা' বা 'তওবা' দ্বারা 'অন্যের হক' মাফ হয় না। 'অন্যের হক' দ্বারা উদ্দেশ্য 'বান্দার হক' আর 'আল্লাহর এমন কিছু হক' যা পুরা করা সম্ভব। যেমন কোনো সুস্থ ব্যক্তির নামায ছুটে গেলো। এ নামায কাযা করা সম্ভব। সুতরাং নামায মাফ হবে না। কিংবা যাকাত ওয়াজিব হয়েছে অথচ যাকাত আদায় করা হয়নি, তাহলে যাকাত মাফ হবে না। হজ্ব ওয়াজিব হয়েছিলো, আদায় করা হয়নি, তা মাফ হবে না। রোযা ওয়াজিব হয়েছিলো, আদায় করা হয়নি- তাও মাফ হবে না। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার যে সব হক পুরা করা সম্ভব তা তওবা দ্বারা মাফ হবে না। আর বান্দার হক বান্দা ক্ষমা করা ছাড়া কিংবা হক পুরা করা ছাড়া মাফ হবে না।

অতীতের আদায়যোগ্য সব হক আদায় শুরু করে দাও

হযরত থানভী রহ. বলেন, মানুষ তওবা করার পর যদি মনে করে যে, ব্যস, আমার উদ্দেশ্য লাভ হয়েছে, আমাকে আর কিছু করতে হবে না- এটা হবে নিছক ভুল ধারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনা। তওবা করার পর বরং দেখতে হবে আমার জিম্মায় আল্লাহর কিংবা বান্দার কী কী হক রয়েছে। তওবা করার পর সে সমস্ত হক পরিশোধ করতে আরম্ভ করো। যার পদ্ধতি তওবার বয়ান শুরু করতে গিয়ে আরয করেছিলাম যে, একটা খাতা বানাবে, ওই খাতায় লেখবে- আমার জিম্মায় অমুকের অমুকের পাওনা আছে। এ পরিমাণ নামায অনাদায়ী আছে। এ পরিমাণ রোযা ও যাকাত অনাদায়ী আছে। অমুকে এতো ঋণ পাবে। আজ থেকে আমি সে সব পরিশোধ করতে আরম্ভ করেছি। সমপূর্ণ পরিশোধ করার পূর্বেই যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ওই ইবাদতের ফিদ্ইয়া ও ঋণ আদায় করে দিতে হবে।

সব হক মেটানোর পূর্বেই মৃত্যু এসে গেলে

যদি এ লোক নামায আদায় শুরু করে দেয়, রোযা-যাকাত আদায় শুরু করে দেয়, মানুষের প্রাপ্য অধিকারসমূহ শোধ করতে থাকে, তার সম্পর্কে থানভী রহ. বলেন, এই প্রচেষ্টাকালীন লোকটা যদি মারা যায়, অর্থাৎ, সব ইবাদতের কাযা আদায় করা এবং সব হক পরিশোধ করার পূর্বেই যদি

লোকটা মারা যায়, তাহলে আল্লাহর রহমতের উপর আশা রেখে বলা যায়- তিনি একে মাফ করে দেবেন। মাফ করার পদ্ধতি এই হবে যে, যে সব লোকের অধিকার তার জিম্মায় ছিলো ওই সব বান্দাকে বলে দেবেন যে, ও আমার বান্দা। ওর দায়িত্বে থাকা হকসমূহ আদায় করা শুরু করেছিলো। চেষ্টার কোনো কমতি করেনি, কিন্তু ওর হায়াত ফুরিয়ে গিয়েছিলো, যদ্দরুন সব হক আদায় করতে পারেনি। তবে যেহেতু নিষ্ঠার সাথে আদায় শুরু করেছিলো এজন্যে আরো বড়ো অনুদান দিয়ে তোমাদের রাজী-খুশি করে দিচ্ছি। সুতরাং তাকে তোমরা মাফ করে দাও।

বান্দার হক মাফ করানোর উপায়

হযরত থানভী রহ. তাঁর মালফূযে সংক্ষেপে এ কথাগুলো বলেছেন। আরেকটি ওয়াজে তিনি একথা বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। সেখানে আছে- হক আদায় করা কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া ছাড়া বান্দার হক আদায়ের কোনো উপায় নেই। এর দরুণ অনেক সময় মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় যে, আমার কাছে এতো এতো মানুষ পাওনাদার আছে। আজ থেকেও যদি এই পাওনা মেটানো শুরু করি, তাহলেও সারা জীবনে তা মেটানো সম্ভব নয়। অন্তরে যখন এ ধরনের হতাশা একবার সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন সামান্য কিছু যা মেটানো সম্ভব হতো, তা থেকেও মানুষ নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে।

নিরাশ হওয়া ঠিক নয়

এ জন্যেই আমাদের হযরত থানভী রহ.-এর রুচি-প্রকৃতি এই ছিলো যে-

سوئے نا امیدی مرو امید ہاست

سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست

'হতাশা, অন্ধকার ও তমাসার দিকে

যাত্রা করো না,

কারণ, অনেক আশা ও আলো রয়েছে।'

এজন্যে এ ধারণা ভুল যে, বান্দার হক আদায়ের কোনো রাস্তাই নেই। কেননা একজন বান্দা যখন অপর বান্দার হক আদায়ের জন্যে উদ্যোগী হয়, এমনকি আদায় শুরুও করে দেয়, সম্ভাব্য সব চেষ্টা ব্যয় করে, আর এর মধ্যে

তার ইন্তিকাল হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা পাওনাদারদেরকে রাজি ও সন্তুষ্ট করে দিবেন।

শত মানুষ হত্যাকারী ব্যক্তির কাহিনী

এ সম্পর্কে হযরত থানভী রহ. বিখ্যাত একটি ঘটনাকে দলিলস্বরূপ পেশ করেন, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জনৈক উম্মত একশ' মানুষ হত্যা করে। ৯৯ জনকে হত্যা করার পর তার মনে অনুশোচনা জাগে। আল্লাহর ভয়ে লজ্জিত হয়। বলে- হায় আল্লাহ! আমি এ কি করেছি! একজন মানুষকে হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। মানব হত্যার সাজা কুরআনুল কারীমে যে আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য কোনোও সাজা এভাবে বর্ণনা করা হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيْمًا

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে তার পরিণতি জাহান্নাম। অনন্তকাল সে ওখানে থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে মারাত্মক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[৪]

কুফর ও মানবহত্যা ছাড়া এমন শব্দ আর কোনোও শাস্তির বেলায় প্রয়োগ করা হয়নি।

শতক পুরা করলো

মোটকথা, ৯৯জন লোক হত্যার পর তার চিন্তা হলো এখন আমি কী করবো। সুতরাং সে জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রীর কাছে গেলো। বললো, আমি ৯৯ জন মানুষ হত্যা করেছি। আমার নাজাতের কোনো রাস্তা থাকলে বলুন। পাদ্রী বললেন, তোমার নাজাতের কোনো পথ নেই। কেননা, একজন লোককে হত্যা করাই মহাপাপ, আর সেখানে তুমি ৯৯ জনকে হত্যা করেছ। কাজেই নাজাতের কোনোও পথ নেই। জাহান্নাম অবধারিত তোমার। লোকটা রেগে

---

৪. নিসা : ৯৩

গেলো। ভাবলো, এলাম নাজাতের পথ খুঁজতে, আর সে কি-না বলছে পথ নেই। নাজাতের পথ যখন নেই, তখন আর শতক পুরা করতে অসুবিধে কী? সুতরাং সে পাদ্রীকেও হত্যা করলো।

পথে আরেক পাদ্রীর কাছে গেলো। বললো, আমি একশ লোক হত্যা করেছি, নাজাতের পথ বাতলে দিন। ওই পাদ্রী বললো, তুমি তওবা করো, ক্ষমা চাও। আরেকটি কাজ করো, অমুক জনপদে বহু নেককার লোক আছেন, সেখানে গিয়ে বসবাস করো। পাদ্রীর আশা, লোকটা জনপদের নেককার লোকদের সংসর্গে থাকলে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং কৃত গোনাহের প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করবে। লোকটা পাদ্রীর কথামতো ঐ জনপদের উদ্দেশে রওনা হলো।

রহমত ও আযাবের ফেরেশতার ঝগড়া

পথিমধ্যে লোকটার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো এবং সে মরে গেলো। হাদীস শরীফে এসেছে, এ ব্যাপারে রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের মাঝে ঝগড়া হলো। আযাবের ফেরেশতাগণ বললেন, এ লোক একশ মানুষের হত্যাকারী। অতএব সে আমাদের অধীন, তাকে আমরা জাহান্নামে নিয়ে যাবো। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, লোকটা তওবা করে নেককার হওয়ার জন্যে চলছিলো। সুতরাং সে আমাদের অধীন, তাকে আমরা জান্নাতে নিয়ে যাবো।

আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা

উভয় দল ঝগড়ায় লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত দিলেন, যেখান থেকে এই লোক চলা শুরু করেছিলো এবং যে জনপদে যাচ্ছিলো এর মধ্যেকার দূরত্ব পরিমাপ করো। আর দেখো, যে বসতি থেকে রওয়ানা করেছিলো তা কাছে, নাকি যে বসতির দিকে যাচ্ছিলো তা কাছে? যে বসতির নিকটবর্তী সে অনুযায়ী কাজ করো।

সুতরাং উভয় বসতির দূরত্ব পরিমাপ করা হলো। দেখা গেলো, যে বসতির দিকে সে যাচ্ছিলো সেটা নিকটবর্তী। যে গন্তব্যের উদ্দেশ্য সে যাচ্ছিলো সে দিকে অর্ধেকের চেয়ে এক গজ বেশি অতিক্রম করেছিলো। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রহমতের ফেরেশতাগণ তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন।

এ ঘটনা দ্বারা হযরত থানভী রহ.-এর দলিল উপস্থাপন

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. উপরোক্ত ঘটনা দলিলস্বরূপ পেশ করে বলেন, ঐ লোক যে একশ মানুষকে হত্যা করেছিলো, তা ছিলো বান্দার হক। যেহেতু সে বান্দার হক আদায়ের জন্যে পরিপক্ক ইরাদা করেছিলো সেজন্যে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে যাদেরকে হত্যা করেছিলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে সন্তুষ্ট করে দিবেন।

পরিমাপ করার কী দরকার ছিলো

উক্ত ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, উভয় দিক থেকে রাস্তা পরিমাপ করে দেখো কোন বসতি অধিক নিকটবর্তী। এর দ্বারা প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলার যখন ক্ষমা করার ইচ্ছাই ছিলো তখন পরিমাপ করার কী দরকার ছিলো? ঐ লোকের মৃত্যু যদি এক-দুই গজ পূর্বে হতো, তাহলেও তো সে তওবার ইচ্ছা করে ছিলো এবং চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলো। সুতরাং পরিমাপ করানো এবং দূর ও নিকটের মানদণ্ডে ফয়সালা করার কী প্রয়োজন ছিলো? প্রশ্নটি আমার মনে বহুদিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছিলো এবং আমি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরছিলাম।

'বান্দার হক' শোধ করার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ শর্ত

পরবর্তীতে আল্লাহ পাক আমার অন্তরে এই উত্তর ঢেলে দেন যে, পরিমাপ করানোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, তার পর ফয়সালা করা হবে, বরং ক্ষমার ফয়সালা তো আগেই করা হয়েছে। তার প্রতি দয়ার ফয়সালা পূর্বেই হয়েছে। কিন্তু মানুষকে একথা বলার জন্যে পরিমাপ করানো হয় যে, ক্ষমার ফয়সালা তখন হবে, যখন মানুষ আত্ম-সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এমনটি নয় যে, কেউ আত্মসংশোধন ও পরিবর্তনের দায়সারা পদক্ষেপ নিয়ে অলসতা করতে থাকলো। তাহলে ক্ষমার ব্যাপার আসবে না। সুতরাং উক্ত ঘটনা দ্বারা বলা হচ্ছে, ইসলাহের সংকল্প নিয়ে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হবে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পথ অতিক্রম করতে হবে। তবেই কেবল আল্লাহর রহমত আসবে। এমন নয় যে, কারো ওয়ায-নসীহত শুনে ওই নসীহতের উপর আমল করার ইচ্ছা করলো, কিন্তু বাস্তবে কিছুই করলো না। এ ধরনের সংকল্পের কোনো মূল্য নেই। সুতরাং

বান্দাদেরকে একথা বুঝানোর জন্যে আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছেন যে, জমিনটি পরিমাপ করো এবং দেখো সে সন্তোষজনক পরিমাণ রাস্তা অতিক্রম করেছে কি না? পরিমাপ করার পর জানা গেলো সে সন্তোষজনক পরিমাণ রাস্তা অতিক্রম করেছে। এরপরই তার ক্ষমার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।

সারকথা

সারকথা হলো, নেক আমলকে আল্লাহ তা'আলা সগীরা গোনাহ ক্ষমার রাস্তা সাব্যস্ত করেছেন। যে সমস্ত কবীরা গোনাহের সম্পর্ক আল্লাহর হকের সাথে এবং যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়, এর ক্ষমা পেতে তওবা করতে হবে। আর যে কবীরা গোনাহের সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে, কিংবা যার সম্পর্ক আল্লাহর এমন হকের সঙ্গে যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব, তা থেকে দায়মুক্তির জন্যে গুরুত্ব সহকারে দায়মুক্তির পদক্ষেপ শুরু করে দিবে। এর পাশাপাশি এই অসীয়তও করবে যে, আমি যদি মানুষের হকসমূহের সব শোধ না করতে পারি তাহলে আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তা আদায় করে দিবে। এতোটুকু করলে বান্দা তার করণীয় সবটুকু করলো। এরপর আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে বলা যায়, তিনি সকল বাধা দূর করে দিবেন।

গোনাহের চাহিদা গোনাহ নয়

অপর এক মালফূযে হযরত থানভী রহ. বলেন,

'প্রকৃতিগত চাহিদার কারণে পাকড়াও করা হবে না, তবে সে অনুপাতে কাজ করলে পাকড়াও করা হবে। তাও ওই সময় যখন ইচ্ছাকৃতভাবে সে অনুপাতে কাজ করবে। আর স্বভাবগত অসহিষ্ণুতায় পরাভূত হয়ে যদি কোনো সময় অসমীচীন কোনো কথা মুখ ফুটে বেরিয়ে যায় এবং পরে এর জন্যে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন।'[৫]

এ মালফূযে হযরত থানভী রহ. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি বয়ান করেছেন। যার সংক্ষিপ্তসার এই যে, গোনাহের বহিঃপ্রকাশ হয় প্রকৃতিগত চাহিদা অথবা মানুষের ভিতর যে মন্দ চরিত্র আছে তাই মানুষকে গোনাহের প্রতি উৎসাহিত করে। কিছু লোক এরূপ মনে করে যে, গোনাহের ইচ্ছা ও চাহিদা অন্তরে সৃষ্টি হওয়াই গোনাহ। হযরত থানভী রহ. এই ভুল ধারণার

---

৫. আনফাসে ঈসা ঃ পৃষ্ঠা ১৯৮

অপনোদনপূর্বক বলছেন, অন্তরে চাহিদা বা ইচ্ছা জাগার দ্বারা গোনাহ হয় না, যতোক্ষণ না মানুষ সে চাহিদা অনুপাতে কাজ করে।

সবার আগে রাগের চিকিৎসা

যেমন রাগ করা খারাপ। এটি এমন একটি ব্যাপার তাসাওউফ ও তরীকতে সবার আগে এর চিকিৎসা করানো হয়। রাগ মানুষের ভিতরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। এজন্যে কোনো আল্লাহর বান্দা যখন ইসলাহের জন্যে কোনো শাইখের নিকট যায়, তখন সবার আগে তার রাগের ইসলাহ করা হয়, যাতে তার রাগ সংবরণ হয়ে যায়।

রাগ ও জৈবিক চাহিদার উপর আমল করা গোনাহ

কিছু লোক মনে করে যে, অন্তরে রাগ সৃষ্টি হওয়াই গোনাহ। হযরত থানভী রহ. ইরশাদ করেন, অন্তরে রাগ সৃষ্টি হলেই গোনাহ হয় না, বরং গোনাহ তখনই হবে যখন সেই রাগের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করবে। জৈবিকচাহিদার ব্যাপারটিও এমন। জৈবিক চাহিদা মনে উদ্রেক হওয়ায় গোনাহ হয় না। কিন্তু যদি জেনে-বুঝে মনে এ ধরনের চাহিদা সৃষ্টি করে কিংবা জেনে-বুঝে সে চাহিদা স্থিতিশীল রাখে বা এর বশবর্তী হয়ে শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করে, তবেই কেবল গোনাহ হবে। যেমন জৈবিক চাহিদার কল্পনা মনে আসায় নাজায়েয জায়গায় নজর দিলো, তাহলে গোনাহগার হবে। সকল বাতেনী রোগ ও মন্দ চরিত্রের ব্যাপার এমনই।

হিংসারবশবর্তী হয়ে কাজ করা গোনাহ

যেমন হিংসা। আপনার মনে কারো বিরুদ্ধে হিংসা জাগলো। তার সম্পর্কে কোনো ভালো খবর আসায় অন্তরে চিন্তা জাগলো যে, এ এতো উন্নতি করছে কেন? তার টাকা-পয়সা এতো বাড়ছে কেন? তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? তার এতো নাম-যশ কেন? মানুষ তাকে এতো মান্য করে কেন? ইত্যাদি। অন্তরে এ ধরনের চিন্তা জাগ্রত হওয়া গোনাহ নয়। কেননা এ চিন্তা ও কল্পনা অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে চলে আসে। গোনাহ তখন হবে, যখন এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে আপনি ঐ লোকের সাথে কোনো মন্দ ব্যবহার করবেন। উদাহরণস্বরূপ আপনার মনে চিন্তা জাগলো, অমুক লোক আমার চেয়ে অনেক উন্নতি লাভ করছে- ব্যাপারটি পীড়াদায়ক! এক্ষণে আপনি ভাবলেন যে, তার

কুৎসা গাইবো, মানুষের সম্মুখে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করবো, তার গীবত করবো। এ সব কাজ করার দ্বারা হিংসা গোনাহে পরিণত হবে। শুধু অন্তরে খেয়াল উদ্রেকের দ্বারা গোনাহ হবে না।

হিংসার দুটি চিকিৎসা

অবশ্য 'হিংসা' সম্পর্কে ইমাম গাযালী রহ. বলেন, যে লোকের অন্তরে অপরের ব্যাপারে অকল্যাণের চিন্তা জাগবে, তাকে তৎক্ষণাৎ দুটি কাজ করতে হবে। নতুবা হিংসার ফলশ্রুতিতে গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রথমতঃ মনে মনে ভাববে, আমার এ চিন্তা খুবই খারাপ। আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলবে- হে আল্লাহ! আমার অন্তর থেকে এ চিন্তা দূর করে দিন। দ্বিতীয়তঃ যার ব্যাপারে মনে এই মন্দ চিন্তা জাগবে তার কল্যাণের জন্যে দু'আ করবে। উদাহরণস্বরূপ আপনার অন্তরে এ ব্যাপারে দুঃখ হচ্ছে যে, অমুক লোক আমার চেয়ে উন্নতি লাভ করছে কেন? তার জন্যে দু'আ করবেন- হে আল্লাহ! তাকে আরো উন্নতি দান করুন। এমন করতে আপনার অন্তরে প্রচন্ড কষ্ট হবে। অন্তরে এ চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্য তার চিকিৎসা করা। যদি কারো ধন-দৌলতের কারণে মনে হিংসা আসে, তখন তার উদ্দেশ্য এই দু'আ করবেন- হে আল্লাহ! তার ধন-সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিন। যদি কারো পদমর্যদা সম্পর্কে মনে হিংসা আসে, তাহলে এই দু'আ করবেন- হে আল্লাহ! তার পদমর্যদা আরো বাড়িয়ে দিন। উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। সুতরাং যে কারণে হিংসার উদ্রেক হবে তা বৃদ্ধির জন্যে দু'আ করবেন। হিংসা এলে এ দুটি কাজ করবেন, নয়তো হিংসা কোনো না কোনো সময় মানুষকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

মোটকথা, যতো মন্দ চরিত্র আছে, সবগুলোর মূলনীতি হযরত থানভী রহ এ মালফূযে বর্ণনা করেছেন যে, 'শুধুমাত্র প্রকৃতিগত চাহিদার কারণে পাকড়াও করা হবে না। বরং চাহিদামাফিক কাজ করলে পাকড়াও করা হবে। আর তাও তখন, যখন ইচ্ছাকৃতভাবে চাহিদা পূরণ করবে।'

প্রকৃতিগত অনীহায় পরাভূত হয়ে মুখ থেকে বের হওয়া বাক্যসমূহ

এরপর হযরত থানভী রহ. একটি পরিত্রাণধর্মী কথা এই বলেছেন যে, যদি প্রকৃতিগত অনীহায় পরাভূত হয়ে কোনো অসমীচীন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে

যায় এবং পরে এর জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ, যদি রাগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায় এবং কোনো আল্লাহওয়ালার সংসর্গের কারণে এবং তার ঘষা-মাজার পরিণতিতে প্রকৃতিতে এ ধরনের ভারসাম্য পয়দা হতে থাকে এবং সেই সাথে রাগও সংবরণ হতে থাকে, কিন্তু এরপরও অনেক সময় রাগ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। যেমন কোনো কাজে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হলো এবং রাগ চরম আকার ধারণ করার দরুণ মুখ থেকে অসমীচীন কোনো কথা বের হয়ে গেলো। এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এর দ্বারা এরূপ মনে করবে না যে, এটা অসম্ভব ও অসংশোধনযোগ্য কাজ। এমনটি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে মাফ চাইবে, কিন্তু একথা ভাববে না যে, আমার রাগ সংশোধনযোগ্য নয়। বরং রাগ সংশোধনের চিন্তা-চেষ্টা করতে থাকবে।

জনৈক সাহাবীকে রাগ না করার নসীহত

হাদীস শরীফে এসেছে, জনৈক সাহাবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সংক্ষিপ্ত কিছু নসীহত করুন। একে তো নসীহতের কথা বললেন, তা আবার সংক্ষিপ্তও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে খারাপ মনে করলেন না যে, নসীহতের কথা বলে আবার এর পেছনে শর্ত জুড়ে দেওয়া কেন? তিনি অসন্তোষও প্রকাশ করলেন না, বরং তিনি এই সাহাবীর আরজ পুরা করলেন। এতে জানা গেলো যে, কেউ যদি সংক্ষিপ্ত নসীহত চায়, তাহলে তাকে সংক্ষেপেই নসীহত করতে হবে। কেননা তার হাতে সময় কমও থাকতে পারে। তারও আশা সামান্য সময়ে কিছু দ্বীন শিখবে। সুতরাং তার চাহিদা ঐভাবেই পূরণ করতে হবে যেভাবে সে কামনা করেছে। আর দ্বীনি আলোচনা সংক্ষেপেও হওয়া সম্ভব। মোটকথা, ঐ সাহাবীর আর্জি মোতাবেক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

لَاتَغْضَبْ

'রাগ করো না'

এর দ্বারা বুঝা গেলো, রাগ এমন একটি বিষয়, যার গুরুত্ব তার কাছে এতো বেশি যে, সংক্ষিপ্ত নসীহতের সময় এ বিষয়টিকেই বেছে নিয়েছেন।

প্রাথমিক অবস্থায় রাগ পুরোপুরি পরিহার করো

আমাদের হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর তরীকায় রাগ ঐ সমস্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর চিকিৎসা সবার আগে করা হতো। যখন কোনো লোক কোনো শাইখের নিকট ইসলাহের উদ্দেশ্য যায়, তখন শুরুতেই তাকে বলা হয় যে, তুমি মোটেই রাগ করবে না। এমনকি যেখানে রাগ প্রকাশ বৈধ সেখানেও না। আর যেখানে রাগ বৈধ নয়, সেখানে তো প্রশ্নই আসে না। যেখানে রাগ করার অধিকার আছে, ওখানেও রাগ করো না। যাতে তোমার স্বভাবের মধ্যে ভারসাম্য চলে আসে।

তবে এতদসত্ত্বেও যদি কখনও অনিচ্ছাকৃত মুখ থেকে কারো বিরুদ্ধে অসমীচীন কোনো কথা কথা বের হয়ে পড়ে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে। ওজর পেশ করবে। বলবে, ভাই! আমার মুখ থেকে এ কথা বেরিয়ে গেছে। ভুল করে ফেলেছি। মাফ করে দাও। এমনটা করলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতের জন্যে রাস্তা খুলে যাবে।

ক্ষমা চাইতে শরম করতে নেই

ক্ষমা চাওয়ায় লাঞ্ছনা নেই। কিছু লোক মনে করে, জীবন যায় যাক, নাক কাটা না যায়। মাথা যেন কোথাও নীচু না হয়। এ চিন্তা খুবই খারাপ। কারণ, এর ভিত্তি অহংকার। অতএব এমন পরিস্থিতি আসলে ক্ষমা চেয়ে নেবে। ক্ষমা চাইলে কী হয়? দুনিয়ায় ক্ষমা চাইলে আখেরাতে পার পেয়ে যাবে। খোদা না করুন, এখানে মাফ করিয়ে নিতে না পারলে আখেরাতে মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে, আপনাকে ও সকলকে এ কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মুসলমানের উপর মুসলমানের হক*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সহীহ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوٰى هٰهُنَا، وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

'হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তার উপর ওয়াজিব সে তার উপর কোনো জুলুম অত্যাচার করবে না, (সাহায্যের প্রয়োজন হলে) তাকে নিঃস্বভাবে ছেড়ে দিবে না, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না এবং তার সঙ্গে হেকারতের আচরণ করবে না। তারপর তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করে ইরশাদ করেন, তাকওয়া এখানে থাকে। (অর্থাৎ, হতে পারে তুমি কোনো ব্যক্তিকে তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে সাধারণ মনে করছো, কিন্তু সে তার অন্তরের পরহেযগারীর কারণে আল্লাহর কাছে সম্মানিত। একারণে কখনো মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না।) একজন মানুষ খারাপ হওয়ার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং তার

---

* নাশরী তাকরীরেঁ পৃঃ ৮৫-৮৮

সঙ্গে তাচ্ছিল্যের আচরণ করবে। মুসলমানের সব জিনিস অন্য মুসলমানের জন্যে সম্মানের- তার রক্ত, তার সম্পদ এবং তার সম্মান।'[১]

এ হাদীসে সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের ভাই সাব্যস্ত করে তার কিছু সামাজিক হক বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হক এই যে, তার উপর কোনো প্রকারের জুলুম করা যাবে না। এর মধ্যে সব ধরনের জুলুম অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক, আর্থিক, মৌখিক ও মানসিক। অর্থাৎ, কোনো মুসলমানকে যেমন অন্যায়ভাবে দৈহিক কষ্ট দেওয়া বা আর্থিক ক্ষতিতে ফেলা হারাম, তেমনিভাবে তাকে খারাপ বলা বা লোক সমাজে যে কোনোভাবে লজ্জিত করাও নাজায়েয। এটা কোনো মুসলমানের জন্যে উপযুক্ত কাজ নয়।

দ্বিতীয় হক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোনো মুসলমানের সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তখন অন্য মুসলমানের উপর ওয়াজিব তাকে নিজের সাধ্যমত সাহায্য করা, তাকে নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে না দেওয়া। তবে শর্ত হলো সে হকের উপর থাকতে হবে এবং মাজলুম হতে হবে। অন্য ভাইয়ের উপর যেমন জুলুম করা হারাম, তেমনিভাবে জুলুম হতে দেখবে আর শক্তি থাকা সত্ত্বেও মাজলুমকে সাহায্য করবে না, এটাও কোনো মুসলমানের জন্যে সমীচীন নয়। অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِىْ مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ مَوْضِعٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ

'যে মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে এমন জায়গায় নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে দিবে, যেখানে তাকে অসম্মান করা হচ্ছে এবং তার সম্মানের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে এমন জায়গায় নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে দিবেন, যেখানে সে নিজের জন্যে সাহায্য চায়।'[২]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় হক এই বর্ণনা করেছেন যে, কোনো মুসলমান অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না এবং তার সঙ্গে তাচ্ছিল্যের

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৬২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৫০, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৪৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৪৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৫১০৩

২. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৪০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৭৭৩, জামউল ফাওয়ায়েদ, খণ্ডঃ ২, পৃঃ ৫৫

আচরণ করবে না। কোনো ব্যক্তিকে তার অভাব, দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কারণে হেয় জ্ঞান করা তো নিতান্তই ছোটলোকী আচরণ। কিন্তু এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসের দিকে ইশারা করেছেন তা এই যে, কাউকে দ্বীনের দিক থেকে সাধারণ অবস্থায় দেখা গেলেও তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা জায়েয নেই। আর এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, তাকওয়ার অবস্থান অন্তরে। তাই এটা খুবই সম্ভব যে, কোনো ব্যক্তিকে তার বাহ্যিক দিক থেকে সাধারণ দেখা গেলেও তার অন্তর তাকওয়ার সম্পদে সমৃদ্ধ। বরং অন্যান্য হাদীস দ্বারা আরো জানা যায় যে, কোনো গোনাহগার ব্যক্তিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা জায়েয নেই। কারণ, হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবার তাওফীক দান করবেন আর সে তার গোনাহ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার থেকে সম্মুখে অগ্রসর হবে। গোনাহের কাজকে খারাপ মনে করা যথার্থ, কিন্তু এর কারণে কোনো মুসলমানকে হেয় জ্ঞান করা স্বতন্ত্র এক বড়ো গোনাহ। একারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কোনো মানুষের মধ্যে যদি অন্য কোনো খারাপ দিক নাও থাকে তাহলে এটাও কম খারাপ দিক নয় যে, সে অন্যান্য মুসলমানকে হেয় জ্ঞান করে।

পরিশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মৌলিক হেদায়েত এই দান করেছেন যে, মুসলমানের সব জিনিসই অন্য মুসলমানের জন্যে সম্মানযোগ্য- তার জান, মাল, সম্মান সবই।

অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একজন মুসলমানের মর্যাদা কাবা শরীফের মর্যাদার চেয়েও অধিক।[৩]

একারণে যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের জান, মাল বা সম্মানের উপর আক্রমণ করে তার গোনাহ ঐ ব্যক্তির চেয়েও বড়ো, যে (নাউযুবিল্লাহ) কাবা শরীফকে ধ্বংস করার জন্যে তার উপর চড়াও হয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ভাইয়ের মতো থাকার এবং একে অপরের হক চেনার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯২২

মুমিন আয়না স্বরূপ*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ

'হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্যে আয়নাস্বরূপ।'[১]

হাদীসটি যদিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং মাত্র তিন শব্দবিশিষ্ট, কিন্তু হাদীসটির মধ্যে আমাদের এবং আপনাদের জন্যে শিক্ষার এক জগত লুকিয়ে আছে। হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ তো এই যে, যেভাবে একজন মানুষ আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার ভিতরে নিজের চেহারা দৃষ্টি গোচর হয়। আয়না তার চেহারার ভালো-মন্দ সব কিছু বলে দেয়। এমন অনেক খারাপ জিনিস আছে, যা মানুষ নিজে জানতে পারে না, কিন্তু আয়না বলে দেয় যে, তোমার মধ্যে এই খারাবি আছে। উদাহরণস্বরূপ, তোমার চেহারায় কালো দাগ লেগে থাকলে আয়না বলে দিবে যে, তোমার চেহারায় কালো দাগ লেগে আছে। এমনিভাবে এক মুমিনও অন্য মুমিনের জন্যে আয়না স্বরূপ। একজন মুমিনের মধ্যে কোনো দোষ বা খারাপ দিক থাকলে অন্য মুমিন তাকে বলে দিবে যে,

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ৮, পৃঃ ২৯৪-৩০৬, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী, আসরের নামাযের পর

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৭২

তোমার মধ্যে এই খারাবি আছে, তুমি তা দূর করো, সংশোধন করো। এভাবে বলার ফলে সে তার খারাবি দূর করার চিন্তা করবে। এই হলো 'এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্যে আয়না স্বরূপ' হাদীসের মর্ম।

যে তোমার ভুল ধরে দেয় সে তোমার প্রতি কৃপাশীল

এই হাদীসের মধ্যে উভয়ের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখে তাকে বলে দেয় যে, তোমার মধ্যে এই দোষ রয়েছে তার জন্যেও শিক্ষা রয়েছে এবং যাকে বলা হচ্ছে তার জন্যেও এ হাদীসে শিক্ষা রয়েছে। যাকে বলা হচ্ছে যে, তোমার মধ্যে এই দোষ আছে তা দূর করো, এ হাদীসে তার জন্যে এই শিক্ষা রয়েছে যে, যে দোষ ধরে দিলো তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনকে আয়নার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্যে আয়না স্বরূপ। কোনো ব্যক্তি যদি আয়নার সামনে দাঁড়ায় আর আয়না তাকে বলে যে, তোমার চেহারায় এ দাগ রয়েছে তা দূর করো, তাহলে ঐ ব্যক্তি আয়নার উপর অসন্তুষ্ট হবে না এবং তার উপর রাগ করবে না যে, তুমি আমাকে এ দাগের কথা কেন বললে? বরং আয়নার প্রতি সে কৃতজ্ঞ হবে যে, ভালো হয়েছে তুমি আমার চেহারার দাগের কথা বলে দিয়েছো। এখন আমি তা ছাফ করে নিবো। ঠিক একইভাবে এক মুমিনও অন্য মুমিনের জন্যে আয়না স্বরূপ। তোমার কোনো মুমিন ভাই যদি তোমাকে বলে যে, তোমার মধ্যে এই দোষ রয়েছে বা তোমার নামাযের মধ্যে এই ভুল রয়েছে বা তোমার মুআমালার মধ্যে এই ভুল রয়েছে তাহলে তার এ বলাকে তোমার খারাপ মনে করা উচিত নয়। তার উপর রাগ হওয়া উচিত নয় যে, তোমাকে সে দোষের কথা কেন বললো? তার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। বরং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, সে তোমার ভুলের কথা বলে দিয়েছে এবং এ কথা বলা উচিত যে, ইনশাআল্লাহ, এখন আমি নিজের সংশোধনের জন্যে চেষ্টা করবো এবং নিজের দোষ দূর করার চেষ্টা করবো।

যে সব আলেম ভুল ধরে দেন তাদের উপর আপত্তি কেন

আজকাল মানুষ আলেমদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলে যে, এই আলেমগণ প্রত্যেককে কাফের ও ফাসেক বানিয়ে থাকে। কারো উপর কাফের হওয়ার ফতওয়া দেয়, কারো উপর ফাসেক হওয়ার ফতওয়া দেয়, কারো

উপর বিদআতী হওয়ার ফতওয়া দেয়। তাদের সারাজীবন অন্যদেরকে কাফের বানানোর কাজেই কাটে। এর উত্তরে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী রহ. বলেন, আলেমগণ মানুষকে কাফের বানান না, কাফের বলেন। কোনো মানুষ যখন কুফরী কাজ করে, তখন সে নিজেই মূলত কুফরী কাজে লিপ্ত হয়। তারপর ওলামায়ে কেরাম শুধু বলেন যে, তোমার এ কাজটি কুফরী। আয়না যেমন তোমাকে বলে যে, তুমি কদাকার, তোমার চেহারায় দাগ লেগেছে। আয়না কদাকার বানায় না এবং দাগ লাগায় না, তেমনিভাবে ওলামায়ে কেরামও শুধু বলেন যে, তুমি যে আমল করেছো তা কুফরী কাজ, ফাসেকী কাজ বা বিদআতী কাজ। তাই যেভাবে আয়নাকে গাল-মন্দ করা হয় না এবং আয়নার উপর দোষারোপ করা হয় না যে, আয়না আমার চেহারায় দাগ লাগিয়ে দিয়েছে, ঠিক একইভাবে ওলামায়ে কেরামের উপরেও এই দোষ চাপানো উচিত নয় যে, তারা কাফের বা ফাসেক বানিয়েছে। তাদের প্রতিও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা উচিত নয়। বরং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তারা আমার দোষ বলে দিয়েছে। এখন আমি তা সংশোধন করে নিবো।

ডাক্তার রোগী বানায় না, রোগ বলে দেয়

উদাহরণস্বরূপ, কতক সময় মানুষের নিজের রোগের কথা জানা থাকে না যে, আমার মধ্যে এই রোগ রয়েছে। কিন্তু যখন সে কোনো ডাক্তারের কাছে যায়, আর সে বলে দেয় যে, তোমার মধ্যে এই রোগ রয়েছে, তখন ডাক্তারকে বলা হয় না যে, তুমি এ ব্যক্তিকে রোগী বানিয়ে দিয়েছো। বরং বলা হবে যে, তোমার মধ্যে পূর্ব থেকে যেই রোগ ছিলো, আর তুমি সে ব্যাপারে গাফেল ছিলে, ডাক্তার শুধু সেই রোগ সম্পর্কে বলে দিয়েছে যে, তোমার মধ্যে এই রোগ রয়েছে, এর চিকিৎসা করো।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. তাঁর নিজের এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একবার আমার ওয়ালেদ ছাহেব (অর্থাৎ, আমার দাদা) অসুস্থ ছিলেন। দেওবন্দে অবস্থান করছিলেন। সে সময় দিল্লীতে একজন বিখ্যাত অন্ধ হাকীম ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষ এবং বিজ্ঞ হাকীম ছিলেন। তার মাধ্যমে চিকিৎসা চলছিলো। আমি ওয়ালেদ ছাহেবের অবস্থা বলে ঔষধ আনার জন্যে দেওবন্দ থেকে দিল্লী যাই। আমি তার

দাওয়াখানায় পৌঁছি। ওয়ালেদ ছাহেবের অবস্থা বলে ঔষধ দিতে বলি। হাকীম ছাহেব ছিলেন অন্ধ। তিনি আমার আওয়াজ শুনে বললেন, আমি তোমার ওয়ালেদ ছাহেবের ঔষধ তো পরে দেবো, প্রথমে তুমি নিজের জন্যে ঔষধ নাও। আমি বললাম, আমি তো ঠিক আছি, কোনো রোগ নেই। হাকীম ছাহেব বললেন, না, তুমি নিজের জন্যে এ ঔষধ নাও। সকালে এটা খাবে, দুপুরে এটা খাবে এবং সন্ধ্যায় এটা খাবে। এক সপ্তাহ পরে যখন আসবে তখন তোমার অবস্থা জানাবে। সুতরাং তিনি প্রথমে আমাকে ঔষধ দিলেন তারপর ওয়ালেদ ছাহেবের ঔষধ দিলেন। আমি যখন বাড়িতে ফিরে আসলাম এবং ওয়ালেদ ছাহেবকে বললাম, হাকীম সাহেব এভাবে আমাকেও ঔষধ দিয়েছেন। ওয়ালেদ ছাহেব বললেন, যেভাবে হাকীম ছাহেব বলেছেন সেভাবে করো। তার ঔষধ ব্যবহার করো। এক সপ্তাহ পর যখন পুনরায় হাকীম সাহেবের কাছে গেলাম তখন আমি বললাম যে, হাকীম সাহেব এখনো পর্যন্ত আমার এ রহস্য বুঝে আসেনি এবং কোনো রোগ ধরা পড়েনি। হাকীম সাহেব বললেন, গত সপ্তাহে তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমার আওয়াজ শুনে আমার অনুমান হয় যে, তোমার ফুসফুসে সমস্যা হয়েছে এবং পরবর্তীতে টিবি রোগ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্যে আমি তোমাকে ঔষধ দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! এখন তুমি এ রোগ থেকে বেঁচে গিয়েছো।

দেখুন! রোগীর খবর নেই যে, আমার মধ্যে কী রোগ রয়েছে? ডাক্তার বলে দিচ্ছে যে, তোমার মধ্যে এই রোগ রয়েছে, এটা তার দয়া। তাই একথা বলা হবে না যে, ডাক্তার রোগী বানিয়ে দিয়েছে। বরং সে বলে দিয়েছে যে, তোমার মধ্যে এই রোগ আছে, যাতে তুমি চিকিৎসা করতে পারো। এখন এভাবে বলার দ্বারা ডাক্তারের প্রতি রাগান্বিত হওয়া এবং অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই।

যে রোগ বলে দেয় তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়

তবে রোগ বলার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কেউ আপনার দোষের কথা এবং আপনার খারাবীর কথা উত্তম পদ্ধতিতে বললো, আর কেউ খারাপভাবে বললো। কেউ যদি আপনার দোষের কথা এমন পদ্ধতিতে বলে, যেভাবে বলা সমীচীন নয়, তারপরও সে আপনাকে আপনার একটি রোগ সম্পর্কে অবগত করলো। এজন্যে তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আরবী ভাষার একটি কবিতার অর্থ এই- আমার প্রতি সবচে' বড়ো কৃপাশীল সেই, যে আমাকে দোষের হাদিয়া দেয়। যে বলে দেয় আমার মধ্যে কী দোষ রয়েছে?'

আর যে ব্যক্তি প্রশংসা করছে- তুমি এমন, তুমি তেমন। যে ব্যক্তি উপরে তুলে ধরছে, যার ফলে অন্তরে অহংকার ও গর্ব সৃষ্টি হচ্ছে, বাহ্যিকভাবে দেখতে তো এটা ভালো মনে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে সে ক্ষতি করছে। যে ব্যক্তি আপনার দোষ বলছে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। মোটকথা, এ হাদীস একদিকে তো এ কথা বলছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি তোমাকে তোমার দোষ বলে তাহলে তার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে তার এ বলাকে গণীমত মনে করো। যেমন আয়নার বলাকে গণীমত মনে করে থাকো।

যে ভুল ধরে দিবে সে তিরস্কার করবে না

এ হাদীসে দ্বিতীয় শিক্ষা রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে ভুল ধরে দেয়। হাদীসে যে ভুল ধরে দেয় তাকে আয়নার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আয়নার কাজ এই যে, কোনো ব্যক্তি তার সামনে এসে দাঁড়ালে সে বলে যে, তোমার চেহারায় এতো বড়ো দাগ লেগে আছে। একথা বলার ক্ষেত্রে সে কম-বেশি করে না এবং ঐ ব্যক্তিকে তিরস্কারও করে না যে, এই দাগ কোত্থেকে লাগিয়েছো, বরং শুধু দাগের কথা বলে দেয়। এমনিভাবে যে মুমিন ভুল ধরে দিবে, সে আয়নার মতো শুধু ততোটুকু ভুলের কথা বলবে, যতোটুকু তার মধ্যে বাস্তবেই বিদ্যমান রয়েছে। বাড়িয়ে বলবে না, অতিরঞ্জন করবে না। এমনিভাবে শুধু তাকে বলবে যে, তোমার মধ্যে এই দোষ রয়েছে। কিন্তু এই দোষের কারণে তাকে তিরস্কার করা বা মানুষের সামনে তাকে লাঞ্ছিত করা, এটা ঈমানদারের কাজ নয়। কারণ, ঈমানদার তো আয়নার মতো। এজন্যে ততোটুকু ভুলের কথাই বলবে, যতোটুকু তার মধ্যে রয়েছে। তাকে তিরস্কার করবে না।

যে ভুল করে তার সহমর্মী হও

একজন মুমিন যখন অন্য মুমিনের দোষ বলে দেয়, তখন সে তার প্রতি সহমর্মী হয় যে, এ বেচারা এই ভুলের মধ্যে রয়েছে। কোনো মানুষ অসুস্থ হলে সহমর্মিতার উপযুক্ত হয়, ক্রোধের পাত্র হয় না। কেউ অসুস্থ ব্যক্তির উপরে ক্রোধান্বিত হয়ে বলে না যে, তুমি অসুস্থ হলে কেন? বরং তার প্রতি সহমর্মী হয় এবং তাকে চিকিৎসার পরামর্শ দেয়। তেমনিভাবে একজন মুমিন ভুলের মধ্যে বা গোনাহের মধ্যে লিপ্ত হলে সে সহমর্মিতার উপযুক্ত, সে ক্রোধের পাত্র নয়। তাকে স্নেহের সাথে এবং নম্রতার সাথে বলো যে, তোমার

মধ্যে এই দোষ রয়েছে, যাতে সে সংশোধন করে নেয়। তার উপর রাগ করো না, তাকে তিরস্কার করো না।

যে ভুল করে তাকে লাঞ্ছিত করো না

আজকাল আমরা এ বিষয়ে লক্ষই করি না যে, অন্য মুমিনকে তার ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করা আমার একটি দায়িত্ব। একজন মুসলমান ভুল পদ্ধতিতে নামায পড়ছে এবং তোমার জানা আছে যে, এ পদ্ধতি ভুল, তখন তাকে তার ভুল সম্পর্কে বলে দেওয়া তোমার উপর ফরয। কারণ, এটাও 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটা সব মুসলমানের উপর ফরয। আজকাল কারো এ কথার অনুভূতিই জাগে না যে, তার ভুল ধরে দেই, বরং মনে করে যে, ভুল পড়ছে পড়ুক। আর যদি কারো ভুল ধরার অনুভূতি হয়ও তাহলে তার এতো তীব্র অনুভূতি হয় যে, সে নিজেকে আল্লাহর সৈন্য মনে করে। অন্যের ভুল যখন সে ধরে দেয়, তখন ধমকাতে আরম্ভ করে। মানুষের সামনে তাকে লজ্জিত করতে আরম্ভ করে। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, তুমি হলে আয়না। তুমি ধমক দিবে না, তিরস্কার করবে না, তাকে লাঞ্ছিত করবে না। বরং এমন পদ্ধতিতে বলবে, যেন তার অন্তরে কথা গেঁথে যায়।

হাসান-হুসাইন রাযি.-এর একটি ঘটনা

ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি. সম্ভবত ফুরাত নদীর তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন। দু'জনে দেখলেন- নদীর তীরে এক বুড়ো মানুষ ওযু করছে, কিন্তু ভুল পদ্ধতিতে। তাদের চিন্তা হলো- তার ভুল ধরে দেওয়া উচিত। কারণ, অন্যের ভুল ধরে দেওয়াও একটি দ্বীনি দায়িত্ব। কিন্তু তিনি হলেন বড়ো আর আমরা হলাম ছোট, তাকে কীভাবে বলা উচিত, যাতে তার মন ভেঙ্গে না যায় এবং অসন্তুষ্ট না হয়? সুতরাং উভয়ে পরামর্শ করলেন এবং উভয়ে মিলে বুড়ো লোকটির কাছে গেলেন। কাছে গিয়ে বসলেন। কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন। তারপর বললেন, আপনি আমাদের বড়ো, আমরা ওযু করলে আমাদের সন্দেহ হয় যে, ওযু সুন্নাত মোতাবেক হয় কি না, এজন্যে আমরা আপনার সামনে ওযু করি, আপনি একটু দেখুন, আমাদের ওযুর মধ্যে কোনো ভুল-ভ্রান্তি বা সুন্নাতের খেলাফ কিছু নাই তো? থাকলে বলে দিন। সুতরাং দুই ভাই তাদের সামনে ওযু করলেন। তারপর তাকে

জিজ্ঞাসা করলেন- এবার বলুন- আমরা এতে কোনো ভুল তো করিনি। বুড়ো লোকটি তার ভুল বুঝতে পারলেন যে, আমি যে পদ্ধতিতে ওযু করেছি তা ভুল ছিলো এবং এদের পদ্ধতি সঠিক। বুড়ো লোকটি বললেন, আসলে আমিই ভুল পদ্ধতিতে ওযু করেছি। এবার তোমাদের বলায় আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, এখন থেকে সঠিক পদ্ধতিতে ওযু করবো।[২]

এই হলো সেই পদ্ধতি, এ আয়াতে যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

'নিজের প্রভুর পথের দিকে হিকমতের সাথে আহবান করো।'[৩]

তুমি আল্লাহর ফৌজদার নও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দারোগা বানিয়েছেন। তাই তুমি মানুষকে ধমক দিতে থাকবে আর তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে থাকবে। বরং তুমি হলে আয়না। আয়না যেমন শুধু বাস্তব অবস্থা বলে দেয়, ধমক দেয় না, কঠোরতা করে না, তোমাদেরও তেমনই করা উচিত। এ শিক্ষাটিও اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ হাদীস থেকে পাওয়া যায়।

একের দোষ অন্যের কাছে বলবে না

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এ হাদীসের অধীনে একটি রহস্য এই বলেছেন যে, আয়নার কাজ হলো, যে ব্যক্তি তার সামনে আসবে তার চেহারায় যদি কোনো দাগ থাকে তাহলে আয়না শুধু তাকেই বলবে যে, তোমার মধ্যে এই দাগ রয়েছে। আয়না অন্যদেরকে বলবে না যে, অমুকের মধ্যে এই দাগ রয়েছে। অন্যদের সামনে এই দোষের কথা আলোচনাও করবে না। এমনিভাবে মুমিনও একটি আয়না। সে যদি অন্যের মধ্যে কোনো দোষ দেখে তাহলে শুধু তাকেই নির্জনে-নীরবে বলে দিবে যে, তোমার মধ্যে এই দোষ রয়েছে। অন্যের নিকট গিয়ে বলা যে, অমুকের মধ্যে এ দোষ রয়েছে এবং অন্যের সামনে এর আলোচনা করা ঈমানদারের কাজ নয়। এটা তো প্রবৃত্তির কাজ। অন্তরে যদি এ চিন্তা থাকে যে, আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্যে তার এ দোষের কথা বলে দিচ্ছি, তাহলে কখনোই সে অন্যের সামনে এর আলোচনা করবে না। আর মনে

---

২. মানাকেবে ইমামে আজম কুরদরী কৃত খণ্ডঃ ১, পৃঃ ৩৯-৪০

৩. নাহাল ঃ ১২৫

প্রবৃত্তির তাড়না থাকলে এই দোষের কারণে তাকে লাঞ্ছিত করার চিন্তা জাগবে। অথচ মুসলমানকে লাঞ্ছিত করা হারাম।

আমাদের কর্মপদ্ধতি

আজ আমরা আমাদের সমাজে জরিপ চালিয়ে দেখলে এমন লোক খুব কম চোখে পড়বে, যে অন্যের ভুল দেখে তার কল্যাণ কামনা করে বলবে যে, তোমার এ বিষয়টি আমার পছন্দ হলো না বা এ কাজ শরীয়তবিরোধী। কিন্তু বিভিন্ন মজলিসের মধ্যে তার ভুলের আলোচনা করার লোক অসংখ্য দেখা যাবে। যার ফলে গীবতের গোনাহে লিপ্ত হচ্ছে। অপবাদের গোনাহে লিপ্ত হচ্ছে। মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের গোনাহ হচ্ছে। একজন মুসলমানের দুর্নাম করার গোনাহ হচ্ছে। পক্ষান্তরে উত্তম পদ্ধতি এই ছিলো যে, নির্জনে তাকে বুঝিয়ে দিবে- তোমার মধ্যে এই দোষ রয়েছে তা দূর করো। তাই কোনো মুসলমান ভাইয়ের মধ্যে কোনো দোষ দেখলে অন্যদেরকে বলবে না, শুধু তাকে বলবে। এই শিক্ষাও اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ হাদীস দ্বারা জানা যায়।[৪]

ভুল ধরে দিয়ে নিরাশ হয়ে বসে পড়ো না

এ হাদীস থেকে একটি শিক্ষা এই লাভ হয় যে, আয়নার কাজ হলো, যে ব্যক্তি তার সামনে এসে দাঁড়ায় আয়না তার দোষের কথা বলে দেয় যে, তোমার মধ্যে এই দোষ রয়েছে। দ্বিতীয়বার যদি ঐ ব্যক্তি আয়নার সামনে আসে তাহলে দ্বিতীয়বারও বলে দেয়। যখন তৃতীয়বার সামনে আসে তখন তৃতীয়বারও বলে। কিন্তু ঐ আয়না তোমার পিছনে লাগবে না যে, তোমার এই দোষ অবশ্যই দূর করো। ঐ ব্যক্তি যদি তার দোষ দূর না করে তাহলে আয়না রাগ হয়ে এবং ক্লান্ত হয়ে হার মেনে বসে যায় না। তুমি তোমার দোষ দূর করো না, তাই আর তোমাকে বলবো না। বরং ঐ ব্যক্তি যতোবার আয়নার সামনে আসবে আয়না ততোবারই তাকে বলবে যে, এই দোষ এখনো বিদ্যমান আছে। সে বলা ছাড়বে না এবং মনও খারাপ করবে না। দারোগা হয়ে বলবে না যে, এ ব্যক্তি যতোক্ষণ পর্যন্ত নিজের দোষ দূর না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্ক রাখবো না।

---

৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৭২

নবীগণের কর্মপদ্ধতি

নবীগণের পদ্ধতিও এই যে, তারা মন খারাপ করে বা হার মেনে বসে যান না, বরং যখনই সুযোগ হয় নিজের কথা বলতে থাকেন। কিন্তু নিজেকে দারোগা মনে করেন না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ [৫]

অর্থাৎ, আপনাকে দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয়নি, বরং আপনার কাজ শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। যে ভুল করে তাকে বলে দিন এবং সতর্ক করুন। এখন তার কাজ হলো আমল করা। যদি সে আমল না করে তাহলে দ্বিতীয়বার বলুন, তৃতীয়বার বলুন, কিন্তু হতাশ হয়ে বা অসন্তুষ্ট হয়ে বসে যাবেন না যে, এ ব্যক্তি তো মানেই না। তাকে আর কি বলবো? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু উম্মতের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন এজন্যে কাফের ও মুশরিকরা যখন তাঁর কথা মানতো না তখন তাঁর খুব কষ্ট হতো। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

আপনি কি নিজের জানকে ধ্বংস করবেন এ বেদনায় যে, তারা ঈমান আনে না কেন?[৬] এটা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার কাজ শুধু কথা পৌঁছিয়ে দেওয়া। মানা বা না মানার জিম্মাদারী আপনার নয়।

এ কাজ কার জন্যে করেছিলে

আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব বলতেন যে, যারা দাওয়াত ও তাবলীগ করে এবং 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' করে তাদের কাজ হলো নিজের কাজের মধ্যে লেগে থাকা। মানুষ না মানার কারণে ছেড়ে বসে থাকবে না। হতাশ হয়ে, অসন্তুষ্ট হয়ে বা ক্রোধান্বিত হয়ে বসে যাবে না যে, আমি তো অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু তারা আমার কথা মানেনি, এজন্যে আমি আর বলবো না- এমন করবে না। বরং চিন্তা করবে যে, আমি এ কাজ কার জন্যে করেছিলাম। আল্লাহকে রাজি করার জন্যে করেছিলাম। আগামীতেও যতোবার করবো আল্লাহকে রাজি

---

৫. গাশিয়া ঃ ২২
৬. শুআ'রা ঃ ৩

করার জন্যে করবো এবং প্রতিবার আমি বলার সওয়াব লাভ করবো। এজন্যে আমার উদ্দেশ্য তো লাভ হলো। অন্যে মানছে কি মানছে না, তার সাথে আমার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। এটা আল্লাহর ব্যাপার যে, তিনি কাকে হেদায়েত দান করবেন, আর কাকে দান করবেন না।

পরিবেশ সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি

বাস্তবতা এই যে, একজন মুমিন যখন ইখলাসের সাথে কথা বলে, বার বার বলে এবং সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আও করে যে, হে আল্লাহ! আমার অমুক ভাই গোনাহে লিপ্ত, আপনি তাকে হেদায়েত দান করুন। তাকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করুন। যখন এই দুই কাজ করে তখন সাধারণত আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই হেদায়েত দান করেন। আমরা যদি এ কাজ করতে থাকি তাহলে এর বরকতে পুরো পরিবেশ আপনাআপনি শুধরে যাবে। আমার ওয়ালেদ মাজেদ বলতেন, এটা সয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা যে, এক মুমিন অন্য মুমিনকে এসব শর্ত ও আদবের সাথে যদি তার ভুল ধরতে থাকে তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংশোধন করে দেন।

সারকথা

যাই হোক, এ হাদীসে যে বলা হয়েছে, এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্যে আয়না স্বরূপ, এর দ্বারা এই শিক্ষা লাভ হয় যে, মুমিনের কাজ বার বার বলা। না মানলে ব্যথিত হওয়া, কষ্ট পাওয়া বা হার মেনে বসে যাওয়া মুমিনের কাজ নয়। বাস্তবতা এই যে, একজন মুমিন যখন ইখলাসের সাথে কথা বলে এবং বার বার বলে তখন একদিন না একদিন তার কথা ফসপ্রসূ হয়। তাই তুমি আয়না হয়ে কাজ করো এবং যখন অন্য কেউ আয়না হয়ে কাজ করে এবং তোমাকে তোমার কোনো ভুলের কথা বলে দেয় তখন তুমি ব্যথিত হয়ো না এবং অসন্তুষ্ট হয়ো না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মৃত ব্যক্তির দোষ চর্চা করো না*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْاَحْيَاءَ[১]

মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে মন্দ বলো না

'হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মৃত লোকদের দোষ চর্চা করো না। কারণ, তাদের দোষ চর্চা করার দ্বারা জীবিতদের কষ্ট হয়।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ

'নিজেদের মৃত ব্যক্তিদের গুণ আলোচনা করো এবং তাদের দোষ চর্চা থেকে বিরত থাকো।'[২]

---

* ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ডঃ ১০, পৃঃ ১০৮-১১৪, আসরের নামাযের পর, বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ, করাচী

১. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯০৫, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৪১১

২. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৯৪০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৫৪

এ উভয় হাদীসের বিষয়বস্তু প্রায় এক রকম যে, কারো মৃত্যু হয়ে গেলে এবং তার সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে তার ভালো বিষয়সমূহ আলোচনা করবে। খারাপভাবে তার আলোচনা করবে না। বাহ্যিকভাবে তার আমল খারাপ থাকলেও তার গুণ চর্চা করো, তার দোষ চর্চা করো না।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, এই হুকুম তো জীবিতদের ক্ষেত্রেও যে, জীবিতদের পশ্চাতে তাদের দোষ চর্চা করা জায়েয নেই। জীবিতদেরও গুণ চর্চা করা উচিত, তাদের দোষ চর্চা করলে গীবত হবে। আর গীবত হারাম। তাহলে এসব হাদীসে বিশেষভাবে মৃতদের কথা কেন বলা হয়েছে যে, মৃতদের দোষ আলোচনা করো না। এর উত্তর এই যে, যদিও জীবিত মানুষের গীবত হারাম কিন্তু মৃত মানুষের গীবত দ্বিগুন হারাম। এর হারাম হওয়ার মাত্রা অনেক বেশি। এই বেশির হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে।

মৃত ব্যক্তির নিকট মাফ চাওয়া যায় না

একটি কারণ এই যে, কোনো ব্যক্তি জীবিত মানুষের গীবত করলে আশা রয়েছে যে, তার সঙ্গে কখনো সাক্ষাত হলে এ ব্যক্তি মাফ চাইবে এবং সে মাফ করে দিবে। এভাবে গীবত করার গোনাহ শেষ হয়ে যাবে। কারণ, গীবত হলো বান্দার হকের অন্তর্গত। আর বান্দার হকের নিয়ম হলো, হকদার মাফ করে দিলে মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে গিয়েছে তার নিকট মাফ চাওয়ার কোনো পথ নেই। সে তো আল্লাহর নিকট চলে গিয়েছে। এ কারণে ঐ গোনাহ আর মাফ হওয়ার কোনো পথ নেই। ফলে এটি দ্বিগুন গোনাহ হলো।

আল্লাহর ফয়সালার উপর আপত্তি

মৃত ব্যক্তির গীবত নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখন তো সে আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছে। তুমি তার যেই দোষ চর্চা করছো, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তার ঐ দোষ মাফ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তো মাফ করে দিয়েছেন, আর তুমি তার দোষ চর্চায় লিপ্ত। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার উপর তোমার আপত্তি যে, হে আল্লাহ! আপনি তো এই বান্দাকে মাফ করে দিয়েছেন, কিন্তু আমি মাফ করছি না। সে তো অনেক খারাপ ছিলো। আসতাগফিরুল্লাহ। এটা তো আরো অনেক বড়ো গোনাহ হলো।

জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য

তৃতীয় কারণ এই যে, জীবিত মানুষের গীবত কোনো কোনো সময় জায়েয হয়। যেমন, একজন মানুষের অভ্যাস খারাপ। ফলে অন্য মানুষ তার ধোঁকায় পড়ার বা তার দ্বারা কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এখন যদি তার সম্পর্কে কাউকে বলা হয় যে, দেখো এর ব্যাপারে সাবধান থাকবে। এর কিন্তু এই অভ্যাস রয়েছে। এ গীবত জায়েয। কারণ, এর উদ্দেশ্য অন্যকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। কিন্তু যে মানুষের মৃত্যু হয়েছে সে এখন অন্য কাউকে কষ্ট দিতে পারবে না এবং ধোঁকাও দিতে পারবে না। একারণে তার গীবত কখনোই বৈধ হতে পারে না। এজন্যে বিশেষভাবে বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তির দোষ চর্চা করো না। তার নিন্দা আলোচনা করো না।

মৃত ব্যক্তির গীবতের করার দ্বারা জীবিতরা কষ্ট পাবে

চতুর্থ কারণ হাদীস শরীফের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইরশাদ করেছেন যে, তুমি এ কথা চিন্তা করে মৃত্ ব্যক্তি গীবত করলে যে, এ ব্যক্তি তো আল্লাহর কাছে চলে গেছে। আমার দোষ চর্চার দ্বারা সে কষ্টও পাবে না এবং সে জানতেও পারবে না। কিন্তু তুমি একথা চিন্তা করলে না যে, ঐ মৃত ব্যক্তির কিছু প্রিয়জনও দুনিয়াতে রয়েছে। যখন তারা জানতে পারবে যে, আমাদের অমুক মৃত আত্মীয়ের দোষ চর্চা করা হয়েছে, তখন এর ফলে তাদের কষ্ট হবে। মনে করুন, আপনি কোনো জীবিত মানুষের গীবত করলেন, তাহলে আপনার জন্যে তার কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নেওয়া সহজ। সে মাফ করে দিলে ব্যাপার চুকে গেলো। কিন্তু আপনি যদি কোনো মৃত ব্যক্তির গীবত করেন, তাহলে তার যতো আত্মীয় ও বন্ধু আছে, তাদের সকলের কষ্ট হবে। এখন আপনি কোথায় কোথায় গিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনকে তালাশ করবেন এবং যাচাই করবেন যে, কার কার কষ্ট হয়েছে এবং কার কার কাছে গিয়ে মাফ চাইবেন? এজন্যে মৃত ব্যক্তির দোষ চর্চা করা খুবই মারাত্মক। যে কারণে জীবিত মানুষের গীবত তো হারাম বটেই, কিন্তু মৃত মানুষের গীবত সে তুলনায় অধিক হারাম এবং তা মাফ নেওয়াও খুব কঠিন। একারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, মৃত ব্যক্তিদের দোষ চর্চা করো না, শুধু তাদের গুণ আলোচনা করো।

মৃত ব্যক্তির গীবত জায়েয হওয়ার পদ্ধতি

শুধু এক অবস্থায় মৃত ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা জায়েয, তা এই যে, কোনো ব্যক্তি গোমরাহীর কথা-বার্তা কিতাবে লিখে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে। এখন তার বই-পুস্তক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। সব মানুষ তার বই পুস্তক পড়ছে। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষকে এ কথা বলা যে, সে আকীদা সম্পর্কে যে সব কথা লিখেছে তা ভুল এবং গোমরাহী। যাতে মানুষ তার বই পড়ে বিপথগামী না হয়। তার এতোটুকু দোষ বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে। এক্ষেত্রেও কেবল প্রয়োজন পরিমাণ বলবে। কিন্তু এমতাবস্থায়ও ঐ ব্যক্তিকে গাল-মন্দ করা, বা তার জন্যে এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা গালির অন্তর্ভুক্ত- জায়েয নয়। একারণে যে, যদিও সে তার বই-পুস্তকে গোমরাহীর কথা লিখেছে, কিন্তু হতে পারে মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবার তাওফীক দান করেছেন এবং ঐ তওবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিয়েছেন। এজন্যে তার ব্যাপারে খারাপ শব্দ ব্যবহার করা- যেমন একথা বলা যে, (নাউযুবিল্লাহ) সে তো জাহান্নামী ছিলো ইত্যাদি, এটা কোনোভাবেই জায়েয নেই। কারণ, কারো জান্নাতী হওয়া বা না হওয়ার ফয়সালা শুধুমাত্র এক সত্তার হাতে। তিনিই ফয়সালা করেন কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী। তুমি তার উপর জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা দেওয়ার কে? তুমি তার ব্যাপারে এ ফয়সালা কীভাবে দেও যে, সে মরদূদ ছিলো। এধরনের শব্দ তার ব্যাপারে ব্যবহার করা কোনোভাবেই জায়েয নেই। তবে সে যেসব গোমরাহী ছড়িয়েছে, তার খণ্ডন করো যে, তার এসব আকীদা গোমরাহসুলভ। এসব আকীদার কারণে কেউ ধোঁকা খাবেন না।

ভালো আলোচনার দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হয়

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদটি অত্যন্ত স্মরণীয় যে, মৃত ব্যক্তিদের গুণ আলোচনা করো এবং তাদের দোষ চর্চা থেকে বিরত থাকো। এ হাদীসে শুধু দোষ চর্চা থেকে বিরত থাকতে বলেননি, বরং সাথে তার গুণ আলোচনাও করতে বলেছেন। তার ভালো দিকসমূহ আলোচনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমি কতক বুযুর্গ থেকে এর হিকমত এই শুনেছি যে, যখন কোনো মুসলমান কোনো মৃত ব্যক্তির গুণ আলোচনা করে তখন তা ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষে একটি সাক্ষী হয় এবং সেই সাক্ষীর ভিত্তিতে কতক সময় আল্লাহ তা'আলা তার উপর অনুগ্রহ করেন যে, আমার নেক

বান্দাগণ তোমার ব্যাপারে ভালো হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাই আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। ভালো গুণ আলোচনা করা মৃত ব্যক্তির জন্যে উপকারী। তোমার সাক্ষ্যের ফলে যেহেতু তার উপকার হলো তাই এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও মাফ করে দেওয়া অসম্ভব নয়। হয়তো তিনি বলবেন যে, তুমি আমার এক বান্দার উপকার করেছো এজন্যে আমিও তোমার উপকার করলাম, তোমাকেও মাফ করে দিলাম। এজন্যে বলেছেন যে, শুধু এতোটুকু নয় যে, মৃত ব্যক্তির দোষ চর্চা করবে না, বরং তার গুণ আলোচনা করবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তারও উপকার হবে এবং তোমাদেরও উপকার হবে।

মৃত ব্যক্তিদের জন্যে দু'আ করো

এ বিষয়েই আরেকটি হাদীস রয়েছে তবে তার শব্দ ভিন্ন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত-

لَا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ

অর্থাৎ, নিজেদের মৃতদের ভালো ছাড়া আলোচনা করো না।[৩] ভালো আলোচনার মধ্যে তাদের জন্যে দু'আ করাও অন্তর্ভুক্ত। তাদের জন্যে দু'আ করো- হে আল্লাহ! তাদেরকে মাফ করে দিন। তাদের প্রতি দয়া করুন। তাদেরকে আযাব থেকে হেফাজত করুন। এসব দু'আ দ্বিগুণ উপকার দিবে। একে তো দু'আ করা একটি স্বতন্ত্র ইবাদত ও সওয়াবের কাজ, তা যে কোনো কাজের জন্যেই হোক। দ্বিতীয়ত, এতে একজন মুসলমানকে উপকার করার সওয়াবও লাভ হবে। এজন্যে তার পক্ষে দু'আ করায় আপনারও লাভ রয়েছে এবং তারও লাভ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

৩. সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ১৯০৯

ইসলামী সামাজিকতার রূপরেখা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

وَاِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، اَمَّا بَعْدُ!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীয়ে করীম সরোয়ারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'মুসলমান সেই, যার জিব ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।'[1]

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ

'এবং প্রকৃত মুহাজির সেই, যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিত্যাগ করে।'

অর্থাৎ, সাধারণভাবে মুহাজির তো তাকে বলে, যে স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু নবীয়ে করীম সরোয়ারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, প্রকৃত অর্থে মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধকৃত জিনিসমূহ পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ, গুনাহের কাজসমূহ ছেড়ে দেয়। আর প্রথম বাক্যে বলেছেন যে, মুসলমান সেই, যার জিব ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদে থাকে। এটা এ জন্যে বলেছেন যে, 'মুসলিম' শব্দের ধাতুর মধ্যে নিরাপত্তার অর্থ রয়েছে। তাই সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, তুমি যখন নিজেকে মুসলমান বলো, তখন তার দাবি হলো, তুমি অন্যের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার বাহক হও, কষ্টের বাহক হয়ো না। এ জন্যেই প্রত্যেক মুসলমানকে অন্যের সাথে সাক্ষাৎকালে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৫১, সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৯১০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১২২

যার অর্থ হলো, তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলা শান্তি, রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষণ করুন।

হাদীসটি পরিসরে ছোট হলেও ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ের সারাংশ এ হাদীসে সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই অধ্যায়টি হলো 'মুআশারাত' তথা ইসলামী সামাজিকতা। ইসলামের শিক্ষাসমূহ পাঁচ শাখায় বিভক্ত। এক. আকীদা-বিশ্বাস। দুই. ইবাদত-বন্দেগী। তিন. মুআমালাত তথা লেনদেন। চার. মুআশারাত তথা সামাজিকতা পাঁচ. আখলাক তথা আত্মিক চরিত্র। পুরো দ্বীন এবং দ্বীনের সমস্ত শিক্ষা এই পাঁচ শাখায় বিভক্ত। তাই এর প্রত্যেক শাখার উপরই আমল করা জরুরী। যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষ দ্বীনের এই পাঁচ শাখার উপরেই আমল না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না। উপরোক্ত হাদীসটিতে দ্বীনের চতুর্থ শাখা অর্থাৎ ইসলামী সামাজিতা সংক্রান্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শিক্ষার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ হাদীস ইসলামী সামাজিকতা সংক্রান্ত দ্বীনের সমস্ত বিধান ও শিক্ষার ভিত্তি। এই হাদীসের মাধ্যমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পয়গাম দিয়েছেন যে, তোমার দ্বারা যেন কোনো মানুষ কোনো প্রকারের সামান্যতম কষ্টও না পায়। কেউ যদি তোমার দ্বারা শারীরিক বা মানসিক কোনো কষ্ট পায়, তাহলে তোমার কামেল মুমিন হওয়ার পথে এটা অনেক বড়ো প্রতিবন্ধক হবে। এমতাবস্থায় তুমি প্রকৃত মুসলিম ও সত্যিকারের মুমিন হতে পারবে না।

ইমাম গাযালী রহ. এক জায়গায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যতো পশু সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়াতে যতো পশু রয়েছে তা তিন প্রকারের। এক প্রকারের ঐগুলো, যেগুলো অন্যের উপকার করে। নিজে ত্যাগ স্বীকার করে অন্যের উপকার করে। গৃহপালিত যতো পশু আছে- যেমন গরু, মহিষ, বকরী, উট, গাধা- এগুলো এমন পশু, যারা অন্যের উপকার করে। এরা কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না, শুধু উপকার করে। মানুষ মহিষের দুধ পান করে, গরুর দুধ পান করে, বকরীর দুধ পান করে এবং উটের দুধও পান করে। উটের উপর সোয়ার হয়ে মানুষ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে।

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ[২]. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَ

زِينَةً

২. সূরা নাহল ঃ ৫

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে এগুলোর মধ্যে তাপ গ্রহণের উপাদানও রেখেছেন। অন্যান্য উপকারও এর মধ্যে রেখেছেন। প্রয়োজন পড়লে তোমরা এগুলোকে জবাই করে এবং এগুলোর গলায় ছুরি চালিয়ে গোশত খাও।[৩]

যাই হোক, এই নিরীহ পশুগুলো এমন যে, কোনো প্রকার কষ্ট তো দেয়ই না, উল্টা বরং উপকার করে। নিজে কুরবানী স্বীকার করে অন্যের উপকার করে। এক প্রকারের পশু হলো এগুলো।

দ্বিতীয় প্রকারের পশু ঐগুলো, যেগুলো কেবল কষ্টই দেয়, কোনো প্রকার উপকার করে না। এটাই এগুলোর সাধারণ চরিত্র। অর্থাৎ, এগুলোর মধ্যে উপকার করার স্বভাব নেই। এগুলোর দ্বারা যদি অন্য কোনোভাবে উপকার নেওয়া হয় সে ভিন্ন কথা। কিন্তু এগুলোর মধ্যে উপকার করার স্বভাব নেই, আছে কেবল কষ্ট দেওয়ার স্বভাব। যেমন সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, ভাল্লুক ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী। এগুলোর মধ্যে উপকার করার স্বভাব নেই। এগুলো অবশ্যই দংশন করবে। অবশ্যই কষ্ট দিবে। অবশ্যই মানুষকে রোগাক্রান্ত করবে। ব্যথা-বেদনায় আক্রান্ত করবে। এরা হলো দ্বিতীয় প্রকারের পশু।

তৃতীয় প্রকারের পশু ঐগুলো, যেগুলো না উপকার করে, না কষ্ট দেয়। অর্থাৎ, এগুলোর শক্তি-সামর্থ এবং এগুলোর জীবনের লক্ষ্য উপকার করাও নয় এবং কষ্ট দেয়াও নয়। যেমন, অনেক ধরনের পশু বনে-জঙ্গলে বিচরণ করে থাকে, যেগুলো না কাউকে কষ্ট দেয়, না উপকার করে। পৃথিবীতে এই তিন প্রকারের পশু রয়েছে।

হযরত ইমাম গাযালী রহ. বলেন, মানুষ! তুমি নিজেকে নিজে আশরাফুল মাখলুকাত দাবি করো। তাই তোমার উচিৎ কমপক্ষে গরু-মহিষের স্বভাবই গ্রহণ করা, বকরী-গাধার স্বভাবই গ্রহণ করা। যারা নিজেদেরকে কুরবানী দিয়ে অন্যের উপকার করে। তুমি যদি আশরাফুল মাখলুকাতই হয়ে থাকো তাহলে তোমাকে কমপক্ষে এসব পশুর মতো তো হতে হবে, যেগুলো অন্যের উপকার করে থাকে। আর তা যদি না হও তাহলে কমপক্ষে তুমি ঐগুলোর মতো হও, যেগুলো উপকারও করে না, ক্ষতিও করে না। কিন্তু তুমি যদি ঐগুলোর মতো হও, যেগুলো অন্যকে কষ্ট দেয়, তাহলে এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, তুমি সাপ-বিচ্ছুর সমান। সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী

---

৩. সূরা নাহল ঃ ৮

অন্যকে কষ্ট দেয়, তুমি মানুষ হয়েও যদি অন্যকে কষ্ট দেও তাহলে তুমি সাপ-বিচ্ছুর পর্যায়ে নেমে গেলে। তাহলে তো তোমাকে আশরাফুল মাখলুকাত বলার কোনো স্বার্থকতা থাকে না। এ বিষয়টিই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, ভাই! সাপ-বিচ্ছু হয়ো না, ইনসান হও। আর ইনসানও হবে কামেল ইনসান, যা কেবল একজন মুসলমানই হতে পারে। তাই পরিপূর্ণ মুসলমান হও।

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ হাদীসের উপর আমল করার জন্যে শরীয়ত এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিধান দিয়েছে যে, কোনো মানুষ যদি সেগুলো চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে বুঝতে সক্ষম হবে যে, অন্যকে কষ্ট না দেওয়া ইসলামে কতো গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

আপনারা জানেন যে, মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করা কতো বড়ো ফযীলতের কাজ। আর শুধু ফযীলতের কাজই নয়, অনেক ইমাম তো জামাতের সাথে নামায পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন। আর আমাদের হানাফী মাযহাবে জামাতের সাথে নামায আদায় করাকে ওয়াজিবের কাছাকাছি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হলেও উঁচুস্তরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, যা ওয়াজিবের কাছাকাছি গুরুত্ব রাখে। আর নবী করীম সরোয়ারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ হাদীসও আপনারা পড়েছেন যে, তিনি বলেছেন, যে সমস্ত মানুষ জামাতে নামায পড়তে আসে না, আমার মন চায় তাদের বাড়িতে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেই। তিনি জামাতে না আসার কারণে এমন ধমকিও দিয়েছেন। জামাতের সাথে নামায পড়া এতো বড়ো ফযীলতের কাজ, এতো বড়ো গুরুত্বপূর্ণ আমল। কিন্তু নবী করীম সরোয়ারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلًا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

'যে কাঁচা পিঁয়াজ বা কাঁচা রসুন খেয়েছে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে।'

এই হাদীসের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, মসজিদে যাওয়ার পূর্বে গন্ধযুক্ত কোনো জিনিস খাওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু কেউ যদি ভুলে খেয়ে ফেলে তাহলে তার জিম্মায় জামাত আবশ্যক থাকবে না। এমতাবস্থায় তার জন্যে

জামাতে নামায পড়া জায়েয নেই। এমন নয় যে, কেবল জামাত ছাড়ার অনুমতি রয়েছে, বরং যে ব্যক্তি কাঁচা পিঁয়াজ বা রসুন খেয়েছে, আর তার মুখ থেকে গন্ধ আসছে তার জন্যে জামাতে যাওয়াই জায়েয নেই। এতো বড়ো ফযীলতপূর্ণ ইবাদত এবং এতো বড়ো তাকিদপূর্ণ কাজ এ জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে, সে জামাতে গিয়ে দাঁড়ালে আর তার মুখ থেকে গন্ধ আসলে পাশের লোকের কষ্ট হবে। এ জন্যে এমন করা জায়েয নেই। সে ব্যক্তি ঘরে নামায পড়বে।

এর উপর কিয়াস করেই আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন- ফাতাওয়া শামীতে এ মাসআলা লেখা আছে যে, কারো মুখ থেকে যদি এমনিতেই গন্ধ আসে- সে পিঁয়াজও খায়নি, রসুনও খায়নি, কিন্তু তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে- আরবীতে যাকে 'বুখার' বলে। অর্থাৎ, মুখ থেকে উদগত দুর্গন্ধ। কারো মুখ থেকে যদি এমন দুর্গন্ধ আসে তাহলে তার জন্যেও মসজিদে যাওয়া জায়েয নেই। সে বাড়িতে নামায পড়বে। এতো বড়ো তাকিদপূর্ণ কাজ এবং এতো বড়ো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছেড়ে দেয়া জায়েয হয়েছে কেবল তাই নয়, বরং ওয়াজিব হয়ে গেছে। কারণ, যখন সে নামাযের কাতারে দাঁড়াবে, তখন পার্শ্ববর্তী লোকের কষ্ট হবে। তাই বলা হয়েছে, জামাত ছেড়ে দাও, ঘরে নামায পড়ো।

এমনিভাবে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, কারো শরীরে কোনো ক্ষত থাকে। ক্ষতের মধ্যে পুঁজ থাকে, দুর্গন্ধ থাকে। এমতাবস্থায় তার জন্যে মসজিদে গিয়ে নামায পড়া জায়েয নেই। সে ঘরে নামায পড়বে। কেন? কারণ, তার এ ক্ষত দেখে অন্যদের খারাপ লাগবে। মানুষের কষ্ট হবে। এ কারণে তার জন্যে মসজিদে যাওয়াকে নাজায়েয করা হয়েছে। ভেবে দেখুন! কতো সূক্ষ্মতার সাথে শরীয়ত এ ব্যাপারে বিধান দিয়েছে। জামাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিয়েছে।

হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়া কতো বড়ো ফযীলতের কাজ। হাদীস শরীফে এসেছে- যে ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদ চুমু খাবে তার গুনাহ ঝরে যাবে। কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদ এমনভাবে আসবে যে, তার জিব থাকবে এবং সে কথা বলবে। যে ব্যক্তি তাকে চুমু খেয়েছে তার পক্ষে সে ঈমানের সাক্ষ্য দেবে। এতো বড়ো ফযীলত! কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেওয়ার জন্যে যদি মানুষকে ধাক্কা দিতে হয় তাহলে এমতাবস্থায় চুমু খাওয়া জায়েয নেই, হারাম। অথচ কতো বড়ো

ফযীলতের কাজ। কিন্তু তার পর্যন্ত পৌছতে যদি মানুষকে ধাক্কা দিতে হয়, মানুষের কষ্ট হয় তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। আপনারা চিন্তা করে দেখুন! এখন হাজরে আসওয়াদে এই দৃশ্য চোখে পড়ে যে, মানুষ একে অপরের উপর লাফিয়ে পড়ে, একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একে অপরকে কষ্ট দিয়ে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করে। কিন্তু শরীয়তে এটা হারাম। সামাজিকতার এ সমস্ত আদব ও আহকাম শরীয়ত প্রদান করেছে।

তাই বলছিলাম, আজ আমরা নিজেদের দ্বীনকে শুধু আকীদা ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি। আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র আকীদা আছে। আলহামদুলিল্লাহ, এর গুরুত্ব তো সবচে' বেশি এবং এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কিছু হলেও গুরুত্ব আছে। আলহামদুলিল্লাহ, ইবাদতের ব্যাপারেও আমাদের অন্তরে কমবেশি গুরুত্ব আছে। আল্লাহ তা'আলা এতে আরো উন্নতি দান করুন। আর বাহ্যিক বেশভূষা, জামা-কাপড়, টুপি ইত্যাদি বিষয়েও কিছু গুরুত্ব আছে। কিন্তু মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাক এই তিন শাখাকে আমরা যেন দ্বীন থেকে একেবারে বের করে দিয়েছি। কোনো অনুভূতি নেই, কোনো চিন্তা নেই। মুআশারাতের আদব এবং তার আহকামসমূহ পালন করার অনুভূতিই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ দিকে লক্ষই করা হয় না যে, আমি যে কাজ করছি তাতে অন্যের কষ্ট হচ্ছে।

লক্ষ করুন! 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে সালাম দেওয়া কতো বড়ো ফযীলতের কাজ। নবীয়ে করীম সরোয়ারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস আপনারা এই বুখারী শরীফেই পড়েছেন যে,

إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الْإِيْمَانِ

'সালামের প্রসার ঘটানো ঈমানের একটি অংশ।'

'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর বরকতসমূহ বর্ষিত হোক।' এতো বড়ো ফযীলতের কাজ এটি! এতো বড়ো দু'আ এই সালাম! এটি এমন একটি দু'আ যে, যদি একবারও এটি কবুল হয়ে যায় তাহলে মানুষের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সালাম দেওয়া সুন্নত এবং উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। এর অনেক গুরুত্বও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে, কোনো মানুষ যখন কোনো কাজে মশগুল

থাকে, আর সালাম দিলে তার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হবে এবং তার কষ্ট হবে বলে আশংকা হয় তাহলে এ অবস্থায় সালাম দেওয়া জায়েয নেই।

আল্লামা শামী রহ. 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে অনেকগুলো শে'র (আরবী কবিতা) উদ্ধৃত করেছেন। এর মধ্যে এমন অনেকগুলো ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন, যেখানে সালাম দেওয়া জায়েয নেই। অবশেষে বলেছেন, আহাররত ব্যক্তিকেও সালাম দিবে না। কারণ, হতে পারে খানা খাওয়া অবস্থায় উত্তর দিতে গিয়ে তার কষ্ট হবে। তবে সঙ্গে আমি একথাও বলে দিচ্ছি যে, এখানে খানা খাওয়ার সাধারণ অবস্থা উদ্দেশ্য নয়, বরং এর ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, যখন মুখের মধ্যে খাবারের গ্রাস আছে, বা খাবারের গ্রাস মুখে গ্রহণ করছে, তখন সালাম দেওয়া নিষেধ। তবে মুখে যদি গ্রাস না থাকে বা গ্রাস গ্রহণ করছে না, তাই গ্রাস আটকে যাওয়ার আশংকাও নেই, তাহলে সালাম দিতে পারবে। আমি এ বিষয়টি বলতে চাচ্ছি যে, ফুকাহায়ে কেরাম কতো সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাথে এ সমস্ত আহকাম সংকলন করেছেন। আহারকারীকে সালাম দিও না। যিকিরকারীকে সালাম দিও না। কেউ দরস দান করছে, মানুষ তার আলোচনা শুনছে, তখন সেখানে এসে চুপিসারে বসে পড়ো, সালাম দিও না। কেউ দ্রুত তার কোনো কাজে যাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের জন্যে সে দ্রুত যাচ্ছে। তাহলে এমন সময় সালাম দিও না। এমন সময় সালাম দেওয়া নিষেধ। এতো বড়ো ফযীলতের কাজ কিন্তু অন্যের কষ্ট হবে বলে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শরীয়তে এতো তাকিদ করা হয়েছে এ বিষয়ে। হাদীস ও ফিকহের অনেক জায়গাতেই আপনারা দেখতে পাবেন, পদে পদে এর প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। আপনারা হাদীস শরীফে পড়েছেন যে, নামাযরত ব্যক্তির সামনে সুতরা না থাকলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয নেই। হাদীস শরীফে আরো এসেছে যে, সে যদি চল্লিশ- বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে নেই, চল্লিশ দিন বলেছেন, চল্লিশ মাস বলেছেন, না কি চল্লিশ বছর বলেছেন, নামাযরত কোনো মানুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা ভালো। কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি নামায পড়ার জন্যে মানুষের যাতায়াতের পথে নিয়ত করে দাঁড়িয়ে যায় এবং এভাবে সে মানুষের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় যদি কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে অতিক্রমকারীর গোনাহ হবে না, গোনাহ হবে যে নামায পড়ছে তার। তাহলে

লক্ষ করে দেখুন! এতো বড়ো গোনাহের কাজ ছিলো, কিন্তু যেহেতু সে মানুষকে কষ্টে ফেলেছে, মানুষকে যাতায়াতে বাধা দিচ্ছে এজন্যে গোনাহ্ তার হবে, অতিক্রমকারীর হবে না। কয়েকটিমাত্র উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। অন্যথায় ফিকহের কিতাবসমূহ এ ধরনের মাসআলা দিয়ে পরিপূর্ণ যে, নিজের কোনো কাজ দ্বারা অন্যকে সামান্যতম কষ্ট দেয়াও জায়েয নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলেছেন,

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ

'যার অনিষ্ট থেকে মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে।'

এ ব্যাপারেও ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, এখানে 'মুসলমানগণ' এ জন্যে বলেছেন যে, সে সময় সমাজের বেশির ভাগ লোকই ছিলেন মুসলমান। কোনো দারুল ইসলামের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই এরূপ ধারণা হয় যে, সেখানের বেশিরভাগ লোকই হবে মুসলমান। তবে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন যে, কোনো যিম্মী কাফেরকেও অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া তেমনই নিন্দনীয় ও হারাম, যেমন কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হারাম। এমনকি যিম্মীদের ব্যাপারে আপনারা এ কথাও পড়ে থাকবেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, যিম্মীকে হত্যা করার কারণেও কিসাস আসবে। অর্থাৎ, কোনো মুসলমান যদি কোনো যিম্মীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তবে বিনিময়ে তাকেও হত্যা করা হবে। কোনো যিম্মীকেও শারীরিক বা মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়া জায়েয নেই। ফাতাওয়া আলমগীরিয়াতে মাসআলা লেখা আছে যে, কোনো যিম্মীকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করা মাকরূহ। যদি তাকে কাফের বলার দ্বারা তার কষ্ট হয় তবে 'হে কাফের' বলাও মাকরূহ হবে। কেন? কারণ, এতে সে কষ্ট পায়। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, তোমরা এমন প্রাণী হও, যে অন্যের উপকার করে। এমন হয়ো না, যে অন্যকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আমাদের বাস্তব জীবনে যদি আমরা এটা মেনে চলি তাহলে আমাদের জীবনের কতো ঝগড়া, কতো ফেৎনা এবং কতো জটিলতা যে মিটে যাবে তা বলে শেষ করা যাবে না।

লক্ষ করুন! আমরা এখন একান্ত নিজেদের বৈঠকে বসে কথা বলছি, যেখানে লৌকিকতার কোনো প্রশ্ন নেই। তাই এখানে এমন কথা বলা

প্রয়োজন, যা লৌকিকতামুক্ত হবে এবং আমাদের ইসলাহের বিষয়ও তাতে থাকবে। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন! এই যে মুসাফাহা, এটি অবশ্যই সুন্নাত। নিঃসন্দেহে একটি ভালো কাজ। মুসাফাহা সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে, দুইজন মুসলমান যখন পরস্পরে মহব্বতের সাথে মুসাফাহা করে, তখন উভয়ের গোনাহ ঝরে যায়। নিঃসন্দেহে এটি বড়ো একটি ফযীলত। কিন্তু সালামের ব্যাপারে আমি যেমন আরয করেছি যে, সালাম অনেক বড়ো ফযীলতের কাজ, কিন্তু সালাম দেওয়ার দ্বারা যদি কেউ কষ্ট পায় তাহলে তখন সালাম দেওয়া মাকরূহ। একই বিধান মুসাফাহার ক্ষেত্রেও। মুসাফাহা করার কারণে যদি কোনো একজন মানুষেরও কষ্ট হয় তবে মুসাফাহা করা মুস্তাহাব নয় শুধু তাই নয়, বরং এমতাবস্থায় মুসাফাহা করা নাজায়েয। কিন্তু যেহেতু মুআশারাতের আহকামের ব্যাপারে কোনো অনুভূতি নেই, এ কারণে আমাদের সমাজে বিষয়টি এমন হয়ে গিয়েছে যে, মুসাফাহা করা জরুরী, ওয়াজিব ও ফরয হয়ে গিয়েছে। সর্বাবস্থায় তা করতেই হবে। কাউকে ধাক্কা দিতে হোক, কেউ পড়ে যাক, কারো উপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে হোক, কাউকে আহত করতে হোক, কিন্তু মুসাফাহা অবশ্যই করতে হবে।

আমি শুধু এখানকার কথাই বলছি না। আমাদের পাকিস্তানেও এই একই অবস্থা। পাকিস্তানের এক জায়গায় আমার বয়ান ছিলো। অনেক দিন পরে সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়। সে এলাকার সমস্ত মাদরাসার আলেম-তালিবে ইলম সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মসজিদের মধ্যে বয়ান হচ্ছিলো। বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত কেবল মানুষের মাথা আর মাথা দেখা যাচ্ছিলো। বয়ান শেষে সব মানুষ মুসাফাহা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মসজিদের মধ্যে যারা ছিলো তারা তো কোনোভাবে মুসাফাহা করলো। মসজিদের বাইরের লোকেরা যখন দেখলো যে, মসজিদের ভিতরের লোকেরা মুসাফাহা করছে, আমরা তো বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তখন তারা করলো কি? মসজিদের জানালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলো। বলা বাহুল্য যে, যখন জানালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করবে, তখন কারো উপর গিয়ে পড়বে। তাই হলো, কেউ কারো উপর লাফিয়ে পড়লো, কেউ বা পড়ে গেলো। কিন্তু মুসাফাহা করা জরুরী, মুসাফাহা করা ফরয। এটা এমন একটা মেজাজে পরিণত হয়েছে, যা শরীয়তের বিলকুল খেলাফ, হারাম কাজ। কারণ, আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. বলতেন যে, মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া কবীরা গোনাহ। আর একটা মুস্তাহাব কাজ করার জন্যে কবীরা গোনাহে লিপ্ত

হওয়া কতো বড়ো নাদানী, কতো বড়ো নির্বুদ্ধিতা, কতো বড়ো বে-দ্বীনী ও গোমরাহী! কিন্তু এদিকে কোনো খিয়াল নেই, কোনো অনুভূতি নেই।

ছাত্ররা ছাত্রাবাসের টয়লেট ব্যবহার করতে খুব বেশি অসতর্কতা করে থাকে। ময়লা রেখে চলে আসে। পরবর্তীতে কেউ টয়লেটে গেলে তার যে কষ্ট হবে সেদিকে কোনো খিয়াল করে না। একবার একজন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নাপাকী পরিষ্কার না করেই বাইরে চলে আসে। তাই হযরত ওয়ালেদ ছাহেব (কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহুল আযীয- আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন) বললেন, এভাবে তুমি কবীরা গোনাহ করেছো। কারণ, পরবর্তীতে যে যাবে তার কষ্ট হবে। আমরা একটু চিন্তা করে দেখি, আমাদের মধ্যে কতো জন এমন আছে, যে এ বিষয়ে লক্ষ রাখে।

এখন আমি আপনাদেরকে এর বিপরীত একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. বলতেন, বাতেলের মধ্যে উন্নতি করার কোনো শক্তিই নেই।

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'বাতেল তো বিলুপ্ত হবেই।'[৪]

বাতেল এসেছেই বিলুপ্ত হওয়ার জন্যে। কিন্তু কোনো বাতেল কওমকে যদি দুনিয়াতে উন্নতি করতে দেখো তাহলে বুঝবে যে, কোনো হক জিনিস তার সাথে যুক্ত হয়েছে, যা তাকে উপরে উঠিয়েছে। বাতেলের মধ্যে উন্নতি করার শক্তি নেই। কোনো হক জিনিস যুক্ত হয়ে তাকে উন্নত করছে। এ দুনিয়া দারুল আমল। তাই এখানে কাফেরও যদি সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করে তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলা তার কাজ অনুপাতে উন্নতি দান করেন। আখেরাতে তো তার কোনো অংশ নেই। তবে দুনিয়াতে সে তার প্রতিদান পেয়ে যায়।

এবার আমি আপনাদেরকে সেই ঘটনা শুনাচ্ছি। আমার কখনো কখনো ইউরোপ-আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ হয়। তো সেখানে সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত কিছু টয়লেট আছে, যেখানে সবারই যাওয়ার অনুমতি আছে। সেখানে গিয়ে আপনি দেখুন, কেউ তা পরিষ্কার না করে চলে আসবে না। আপনি যখনই সেখানে যাবেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাবেন। কেউ সেখানে পানি ছিটিয়ে রাখবে না। তাতে ময়লা থাকবে না। একবার আমি ইংল্যান্ডে এ

---

৪. সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৮১

ধরনের একটি ট্রেনে সফর করছিলাম। আমার টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। আমি গিয়ে দেখি টয়লেটের উপর 'ব্যস্ত' লেখা আছে। তাই আমি এ কথা চিন্তা করে ফিরে এসে সীটে বসলাম যে, টয়লেট খালি হলে যাবো। একটু পরে দেখি যে, এক মহিলা ঐ টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে বললাম যে, আপনার টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন থাকলে আপনি যান। সে বললো, না, আমি টয়লেট থেকে অবসর হয়েছি। আমি পেশাব করতে গিয়েছিলাম, যখন অবসর হই, তখন ট্রেন স্টেশনে এসে প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে যায়। প্লাটফরমে দাঁড়ানো অবস্থায় পানি দিয়ে নাপাকী ভাসিয়ে দেওয়া আদবের খেলাফ, তাই আমি পানি প্রবাহিত করতে পারি নাই। এ জন্যে অপেক্ষা করছি, গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে পানি প্রবাহিত করে তবে সীটে ফিরে যাবো। সেখানে এটা একটা সাধারণ মেজাজে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি অনেক মানুষ হয়ে যায় তবে নিজে নিজেই তারা সারিবদ্ধ হয়ে যায়। ধাক্কাধাক্কি করার চিন্তাই তাদের মাথায় নেই। এ জিনিস নবী করীম সরোয়ারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজ তা অমুসলিমরা গ্রহণ করেছে আর আমরা ছেড়ে দিয়েছি। তাই হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলতেন যে, এই হক তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে, যা তাদেরকে দুনিয়াতে উন্নত করছে। আর আমরা ছেড়ে দিয়েছি, ফলে আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি। তাই আমি বলতে চাচ্ছি যে, এ হাদীসটি আমরা পড়ে থাকি এবং প্রতিদিন পড়ে থাকি। এমন কোনো তালিবে ইলম পাওয়া হয়তো কঠিন হবে, যার اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ হাদীসটি অজানা আছে। কিন্তু এর উপর আমল আছে কতোটুকু? আমরা প্রত্যেকে চিন্তা করে দেখি যে, আমরা এ হাদীসের উপর কতোটুকু আমল করছি। যদি না করে থাকি তাহলে সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিসাব অনুযায়ী আমরা মুসলমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নই। তারপর তিনি বলেন, জিব দ্বারাও কষ্ট দিও না এবং হাত দ্বারাও কষ্ট দিও না। জিব দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অর্থ কী? এমন কোনো কথা বলা, যা অন্যের কাছে অপছন্দ হয়। এমন কথা বলাও মুসলমানের চরিত্র নয়। আজ-কাল আমরা অন্য ধর্মের লোক, অন্য দলের মুসলমান, বা ইলমী কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বলায় ও লেখায় এমন

সব শব্দ ব্যবহার করি, যার ফলে তার মনে কষ্ট হয়। প্রশ্ন হলো, এটা কি 'আলামুসলিমু' হাদীসের পরিপন্থী কাজ নয়? আমাদের মতো আলেমদের পক্ষ থেকে যদি এমন কথা ও লেখা পাওয়া যায়, যা অন্যের উপর কাদা ছোড়ে, যা অন্যের মনোকষ্টের কারণ হয়- হোক সে আমার বিরোধী- কিন্তু এমনটি করলে সেটা মুসলমানের কাজ হবে না। 'আলমসলিমু' হাদীসের দাবি এটা নয়।

আমি আমার নিজেরই একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। আপনারা জানেন, আমাদের পাকিস্তানে আইয়ুব খানের আমলে 'পারিবারিক আইন' জারী করা হয়েছিলো। যা ছিলো শরীয়তবিরোধী আইন। একব্যক্তি তার পক্ষে একটি কিতাব লেখে। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. আমাকে বলেন, এর উত্তর লেখো। আমি সবেমাত্র দাওরায়ে হাদীস ফারেগ হয়েছি। আবেগ-উদ্দীপনাও ছিলো। মগজে খান্নাসও ছিলো। সাহিত্যপূর্ণ এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মতো তীর্যক বাক্য লেখার প্রতি বিশেষ আগ্রহও ছিলো। যাই হোক, আমি আমার আঙ্গিকে পারিবারিক আইনের পক্ষে যে ব্যক্তি কিতাব লিখে ছিলো তার বিরুদ্ধে একটি কিতাব লেখি। তাতে বিভিন্ন পয়েন্টে আমি তাকে হারিয়ে দেই। তীর্যক বাক্য লেখি। সাহিত্যপূর্ণ বাক্যে তাকে ঘায়েল করি। অপমান করি। সে সময় আমি যে কোনো লেখা তৈরী করার পর প্রথমে হযরত ওয়ালেদ মাজেদ রহ.-কে পুরোটা শুনাতাম। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. সত্যায়ন করলে তবে সেটা ছাপা হতো। যাই হোক, আমি দুই শ' পৃষ্ঠার একটি কিতাব লিখি। তারপর তা পড়ে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-কে শুনাই। দুই শ' পৃষ্ঠার এই কিতাব শুনে শেষ করার পর হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, তুমি সাহিত্যের দিক থেকে তো খুব উন্নত মানের কিতাব লিখেছো এবং তথ্য-উপাত্তের দিক থেকেও তা উন্নত মানের হয়েছে। কিন্তু তুমি বলো- এই কিতাব লেখার পেছনে তোমার উদ্দেশ্য কী ছিলো? যে সব লোক ভ্রান্ত পথে চলছে তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো তোমার উদ্দেশ্য, নাকি যে সব লোক আগে থেকেই তোমার পক্ষের তাদের থেকে বাহবা কুড়ানো তোমার উদ্দেশ্য? তোমার পক্ষের লোকদের থেকে প্রশংসা কুড়ানো যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমার কিতাব খুব সফল। আর এর ফলে তোমার পক্ষের লোকদের কাছে যখন এ কিতাব পৌছবে, তখন তারা খুব প্রশংসা করবে। তারা বলবে- কেমন মুখভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছে! কেমন দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছে! বড়ো সাহিত্যপূর্ণ লেখা লিখেছে! মানুষ

খুব প্রশংসা করবে। আর যদি বিপথগামী লোকদেরকে সঠিক পথে আনা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তোমার কিতাবের এক কড়িও মূল্য নেই। এক পয়সাও মূল্য নেই। কারণ, তুমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এমন বাক্য লিখেছো, যেগুলো দেখে তাদের মনে তোমার বিরুদ্ধে জিদ তৈরী হবে। ফলে তারা হক তলবের উদ্দেশ্যে তোমার কিতাব পড়বে না। পরিণতিতে শত্রুতা সৃষ্টি হবে।

এটা নবীগণের তরীকা নয়। নবীসুলভ দাওয়াতের তরীকা এটা নয়। এরপর ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, নবীগণের তরীকা তো এই ছিলো যে, কাফেররা নবীকে বলেছে,

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

'আমরা তো তোমাদেরকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখছি এবং তোমাদেরকে আমরা মিথ্যুক মনে করি।'[৫]

আজ কেউ হলে জওয়াব দিতো- তুই মিথ্যাবাদী, তোর বাপ মিথ্যাবাদী, তোর দাদা মিথ্যাবাদী। কিন্তু নবী কী জওয়াব দিয়েছেন?

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

এটা হলো নবীর জওয়াব। গালির জওয়াব গালি দ্বারা দেননি। তিনি বলেছেন, ভাই! আমি বেউকুফ নই। তবে আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন।[৬] এটা হলো নবীর জওয়াব।

ফেরাউনের মতো জালেম ও জাবের বাদশার কাছে হযরত মূসা ও হারূন আলাইহিমাস সালামের মতো নবীদ্বয়কে পাঠানো হচ্ছে- যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার 'ইলমে আযলী'তে রয়েছে যে, তার হেদায়াত লাভ হবে না। ফেরাউনের ভাগ্যে হেদায়াত জুটবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

'তোমরা দু'জন তার সাথে নরমভাবে কথা বলবে।'[৭]

আরো বলেছেন,

لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

---

৫. সূরা আ'রাফ ঃ ৬৬

৬. সূরা আ'রাফ ঃ ৬৭

৭. সূরা তহা ঃ ৪৪

'অসম্ভব কি যে, সে নসীহত কবুল করবে বা আল্লাহর ভয় তার অন্তরে পয়দা হবে।'[৮]

এ কথা কে বলছেন? আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা। অথচ আল্লাহ জানেন, সে নসীহত কবুল করবে না। ঈমান নসীব হবে না। গোমরাহ অবস্থায় সে মারা যাবে। কিন্তু তিনি বলছেন যে, হকের দা'য়ী যে হবে তার নিরাশ হওয়া যাবে না। হকের দা'য়ীর এই অনুভূতি থাকবে যে, আমি এমন পন্থা অবলম্বন করবো, যার দ্বারা সে নসিহত লাভ করবে। যার কারণে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় জন্মাবে। আমার ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বলেন, তুমি মূসা এবং হারুন আলাইহিমাস সালামের চেয়ে বড়ো মুসলিহ হতে পারো না, আর তোমার বিরুদ্ধবাদীও ফেরাউনের চেয়ে বড়ো গোমরাহ হতে পারে না। তাদেরকেই যখন নরম কথা বলার হুকুম দেওয়া হচ্ছে, তাহলে তুমি বকাঝকা দেওয়ার এবং কঠোর কথা বলার অনুমতি কোথায় পেলে?

এরপর ওয়ালেদ ছাহেব রহ. এ ঘটনাও শুনালেন যে, হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. ওয়ায করছেন। ওয়ায চলাকালে এক বিরুদ্ধবাদী ভর মজমার মধ্যে দাঁড়িয়ে বলে- মাওলানা! আমরা শুনেছি যে, আপনি হারামযাদা? এখন বলুন! এতো বড়ো একজন আলেমকে ভর মজলিসে বলা হচ্ছে যে, আপনি হারামযাদা। হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. তার প্রতি ক্রোধ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করে বললেন, ভাই! আপনি ভুল সংবাদ পেয়েছেন। আমার মায়ের বিয়ের সাক্ষী তো এখনো দিল্লীতে রয়েছে। তিনি তার গালিকে মাসআলা বানিয়ে এভাবে উত্তর দিলেন। যাই হোক, আমার ওয়ালেদ ছাহেব রহ. বললেন, তুমি এ কিতাবে যে তরীকা অবলম্বন করেছো তা ইসলাহের তরীকা নয়। এটা ফাসাদ বিস্তারের তরীকা। এর কারণে যে মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া হবে তা গোনাহ। এর কারণে যদি কেউ হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার গোনাহ তোমার উপর বর্তাবে। তাই এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমার উপর ফযল ও করম করেছিলেন ফলে হযরত ওয়ালেদ ছাহেব রহ.-এর কথা আমার অন্তরে বসে গিয়েছিলো। আলহামদুলিল্লাহ, তখন আমি বললাম, হযরত! আমি আপত্তিজনক সব কথা ঠিক করে পুনরায় লিখবো। সুতরাং আমি ঐ দুই শ' পৃষ্ঠা কিতাবের আপত্তিজনক সব কথা ঠিক করে এবং তীর্যকপূর্ণ সমস্ত বাক্য ও উপস্থাপন

---

৮. সূরা তহা ঃ ৪৪

বাদ দিয়ে নতুন করে কিতাব লিখি। যা এখন 'হামারে আয়েলী মাসায়েল' (ہمارے عائلی مسائل) নামে ছেপে বের হয়েছে।

সে সময় হযরত ওয়ালেদ মাজেদ রহ. আরেকটি কথা বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। তিনি বলেছিলেন- যখনই কোনো কথা বলবে বা লিখবে, তখন চিন্তা করবে যে, আমাকে এ কথা কোনো আদালতে প্রমাণ করতে হবে। তোমার কাছে যদি এমন পোক্ত প্রমাণ থাকে যে, তুমি আদালতে প্রমাণ করতে পারবে তাহলে সে কথা বলবে বা লিখবে। কিন্তু তোমার কাছে যদি এমন প্রমাণ না থাকে তাহলে এমন কথা না মুখে বলবে, না কলমে লিখবে। কেন? কারণ, হতে পারে কেউ তোমার বিরুদ্ধে মামলা করে দিলো আর তোমাকে আদালতে তা প্রমাণ করতে হলো। আর দুনিয়ার কোনো আদালতে যদি তোমাকে প্রমাণ করতে নাও হয়, আখেরাতে তো একটা আদালত নিশ্চয়ই আসছে, যেখানে অবশ্যই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। এ কারণে এমন কোনো কথা মুখ দিয়ে বের করবে না, যা প্রমাণ করতে পারবে না।

এটা হলো একজন মুসলমানের সঠিক কর্মপদ্ধতি, একজন তালিবে ইলমের সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং একজন হকের দা'য়ীর সঠিক কর্মপদ্ধতি যে, তার দ্বারা কেউ সামান্যতম কষ্টও পাবে না। সে অন্যের জন্যে শান্তির পয়গাম বয়ে আনবে। মুসলমানের সঠিক চিত্র তুলে ধরবে। সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীস শরীফে আমাদেরকে এ হুকুমই দিয়েছেন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যদি আমাদের অন্তরে এই হাদীসের উপর আমল করার অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন এবং এ সম্পর্কে শরীয়তের যে আহকাম রয়েছে সেগুলোর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দেন তাহলে এ মজলিস সার্থক, ইন্‌শাআল্লাহ। আর যদি তা না হয় তাহলে ভাই! লম্বা-চওড়া তাকরীরও বেকার, লম্বা-চওড়া দরসও বেকার এবং জ্ঞান-গবেষণাও বেকার। এখন আমি দু'আ করছি- আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে এবং তাঁর রহমতে আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী সঠিকভাবে বোঝার এবং তার উপর সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন।

'আদাবুল মুআশারাত' নামে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর একটি পুস্তিকা আছে। পুস্তিকাটি কলেবরে ছোট হলেও তাতে মুআশারাতের অনেক তা'লীম সন্নিবেশিত হয়েছে। তালিবে ইলমদের সেটি মুতালাআ করা

উচিত। আমাদের দারুল উলূম করাচীতে প্রতিদিন আসরের নামাযের পর আমরা তার এক-দুই সতর করে পড়ে শুনিয়ে থাকি। এখানেও যদি এ নিয়ম চালু করা হয় তাহলে খুব ভালো হবে। আর তা না হলে প্রত্যেক তালিবে ইলম ব্যক্তিগতভাবে তা মুতালাআ করবে এবং সে অনুপাতে নিজের আমলকে শুধরানোর চেষ্টা করবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আপনার সংগ্রহে রাখার মত আরও কয়েকটি কিতাব